মঙ্গল-মঠ

"সেখ আন্দু", "জন্ম-অপরাধী", "নমিতা" প্রভৃতি প্রণেত্রী

শ্রীমতী শৈলবালা ঘোষজায়া

কলিকাতা

কর, মজুমদার এণ্ড কোং

মূল্য

প্রকাশক—
শ্রীনীরদরঞ্জন মজুমদার, বি-এ,
কর, মজুমদার এণ্ড কোং,
১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

বি, পি, এমস্ প্রেস
২২/৫ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা
শ্রীআশুতোষ মজুমদার কর্ত্তৃক মুদ্রিত

নমো নারায়ণায়

উৎসর্গ

"শুভ-বিবাহে—শুভাশীর্ব্বাদ"

কল্যাণীয় পুত্র

শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনাথ বসু, এম-এ,

দীর্ঘজীবেষু

স্নেহাস্পদ,

জ্ঞান সাধনা-উজ্জ্বল, তরুণ-জীবনে
আজ তোমার সংসার-পথ যাত্রার শুভ-মুহূর্ত্তে
সকল পূজনীয় গুরুজনদের, পুণ্যময়-আশীর্ব্বাদ-শেষে—
আমার
একান্ত আগ্রহময় সাধনার দান

"মঙ্গল-মঠ"

মঙ্গল-আশীর্ব্বাদরূপে, গভীর স্নেহভরে
তোমায় উপহার দিতেছি।
প্রার্থনা করি—মঙ্গলময়ের কৃপায়
সংসার-জীবনের, মহান্ সাধন-ক্ষেত্রে—
সকল দুঃখ, ক্ষতি, শোক, ব্যথা সুখ সম্পদের ভিতর দিয়া
সহস্র শিক্ষা, লক্ষ সাধনার ধারা বহিয়া
সত্য চেতনার মাঝে
আত্ম-উদ্বোধনে
সিদ্ধকাম হও বৎস। ইতি

আষাঢ়, ১৩২৮

চির মঙ্গল-প্রার্থিনী
তোমার—মাসিমা

উপহার

মঙ্গল-মঠ

প্রথম খণ্ড

মঙ্গল-মঠ

প্রথম পরিচ্ছেদ

দারুণ শীতের বক্ষে অকাল প্রাদুর্ভূত বর্ষা সমাগমে, ঘূর্ণঝঞ্ঝা সংঘাত-সংক্ষুব্ধ প্রকৃতি সতী দুই দিনের পর আজ অরুণ দেবের তরুণ কিরণ-রাগরঞ্জিত হইয়া শান্ত মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। বর্ষাক্রান্ত শীতের তীক্ষ্ণ অসাড়তা—আজ সৌর-কর-স্পর্শে, মৃদুল আবেশ জড়তায় রূপান্তরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে, আরামের নেশার মত ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

বোম্বাইয়ের সমুদ্র উপকূলে * * * পল্লীতে মঙ্গল-মঠ দেবালয়। দেবালয়ের পশ্চিম দিকে অতিথিশালার দ্বিতলে জানালার কাছে—আজ কয়দিনের পর রোগশয্যা ছাড়িয়া নিরঞ্জন প্রথম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রোগ-অবসাদ-ক্লিষ্ট চিত্তশক্তি, গ্লানির কবল হইতে সদ্যমুক্তি লাভ করিয়া,—আজ বহিঃপ্রকৃতির জীবন্ত স্ফূর্ত্তি-চাঞ্চল্যের মধ্যে যেন নব চেতনা লাভে ধন্য হইল। আগ্রহ উন্মুখ চিত্তে নিরঞ্জন বক্ষবদ্ধ-করে, স্মিত বদনে, সম্মুখ পানে চাহিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তরুণ শিল্পীর চোখে মুখে গভীর হর্ষবিস্ময়ের স্বচ্ছ-উজ্জ্বল আনন্দ দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল—মুগ্ধ নেত্রে নিরঞ্জন চাহিয়া দেখিতেছিল—দূর দিগন্ত সন্ধি-লীন সমুদ্র ও আকাশের মহান্ মাধুর্য্যময়ী নিবিড়-নিথর মিলন-চুম্বন! কি অতুলনীয় শোভা, কি মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য!—অলস স্তব্ধতার বক্ষে এ কি তন্ময় বিলাস সৌন্দর্য্য!

মঙ্গল-মঠ

নিরঞ্জন বাইশ বছরের তরুণ যুবা; আকৃতি একহারা দীর্ঘ। দেহ কান্তি উজ্জ্বল-গৌর। বক্ষঃদেশ আয়তনোপযোগী প্রশস্ত—কটিতট সুশ্রী-ক্ষীণ; শ্রম-কুশলী সুদৃঢ় বাহু যুগল আজানুলম্বিত,—অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন পৌরুষ-সৌন্দর্য্য পূর্ণ; মুখশ্রীতে কিশোর বালকের সরল কোমলতা বিদ্যমান; দৃষ্টি নম্র লালিত্যে বিমণ্ডিত, কিন্তু উজ্জ্বল প্রতিভা ব্যঞ্জক। প্রশস্ত-সুন্দর ললাটে উচ্চ চিন্তা ও মমতা প্রবণতার চিহ্ন দেদীপ্যমান, নাসিকা সরল শোভন, ওষ্ঠোপরে কচি গোঁফের ক্ষীণ রেখা, পাংশু বদনমণ্ডলে দৌর্ব্বল্য ক্লান্তির লক্ষণ স্পষ্ট বিদ্যমান থাকিলেও, দৃষ্টি তটে এবং দ্বিধা-ভিন্ন চিবুকাগ্রভাগে মানসিক দৃঢ়তা ও একাগ্রতার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

নিরঞ্জন জাতিতে রাজস্থানী ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ে প্রস্তর-শিল্পী বা ভাস্কর। নিরঞ্জনের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চিত্তরঞ্জন দেব বিকানীরের সুবিখ্যাত ভাস্কর, দিন পনর হইল তিনি নিরঞ্জনকে দুইজন সহযোগী ভাস্করের সহিত এখানে মঙ্গলমঠ দেবালয়ের শিল্প-সংস্কার কার্য্যের জন্য পাঠাইয়াছেন; নিরঞ্জন এখানে আসিয়াই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল, সম্প্রতি সুস্থ হইয়াছে।

সহযোগীদ্বয় প্রত্যূষে উঠিয়া কাজে চলিয়া গিয়াছে, নিরঞ্জন পীড়িত থাকায় কয়দিন তাহাদের কাজ কর্ম্ম ভালরূপ হয় নাই। উৎসাহের ঝোঁকে শরীরটাকে অনিয়মিত পরিশ্রমে খাটাইয়া—শেষে তাল সামলাইবার সময় দ্বিগুণ ক্ষতি এবং চতুর্গুণ ক্ষোভ গ্লানি ভোগ করিয়া —নিরঞ্জন এবার রোগ শয্যায় পড়িয়া নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, আর নিজের খুসীর উপর শরীরটাকে জবরদস্ত ভাবে খাটাইবে না,—

শরীরের স্বাচ্ছন্দ্য সুবিধার অধীনেই খুসীটাকে বুঝিয়া সুঝিয়া চালাইবে।

কিন্তু হইলে কি হয়, শয্যার উপর পড়িয়া পড়িয়া অলস শ্রান্তিতে গড়াগড়ি দেওয়া—এবং সঙ্গীহীন গৃহের এই নিষ্করুণ নির্জ্জনতা, এ যে মোটেই সহনীয় নয়! নিরঞ্জন বিছানায় গিয়া জোর করিয়া অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট ভাবে পড়িয়া রহিল, কিন্তু শেষে আর পারিল না—উঠিল; ঔষধ খাইয়া, পাগড়ী ও জুতা পরিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল,—সহযোগীদের কাজ কর্ম্ম কিরূপ হইতেছে, দেখিবার ইচ্ছায় চলিল।

দেবালয়ের অতিথিশালায় উর্দ্ধতলে দুইটি কক্ষ; এই কক্ষ দুইটি বেতনভোগী কর্ম্মচারী বা বিশিষ্ট আগন্তুকগণের প্রয়োজন মত ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল,—বর্ত্তমানে নিরঞ্জন ও তাহার সঙ্গীদ্বয় উহার অধিকারী।—নিম্নতলে চক-মিলান বারন্দাযুক্ত গৃহশ্রেণীতে প্রায় শতাধিক অতিথি ও সাধু উপাধিধারী ব্যক্তি বাস করিতেন। অতিথিশালা ও দেবালয়ের সংযোগস্থলে প্রকাণ্ড ভোগ-রন্ধনাগার; এইখান হইতে ভোগ প্রস্তুত হইয়া গৃহ মধ্যস্থ পথ দিয়া দেব মন্দিরে আনীত হয়। সংক্ষিপ্ত ও সুবিধাজনক হইলেও, সাধারণ কেহ রন্ধনাগারের পথ দিয়া অতিথিশালা বা দেবালয়ে মধ্যে গমনাগমন করিতে পারিত না, কাজেই নিরঞ্জন সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিয়া, অতিথিশালার বাহিরের পথ দিয়া চলিল।

চলিতে চলিতে সহসা কার ডাক শুনিয়া নিরঞ্জন থমকিয়া দাঁড়াইল, —কে তাহাকে ডাকিল?—মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সরু চলন

পথের পাশে মুক্তদ্বার উদ্যানে, সাজি হস্তে পুষ্পচয়নরতা শান্তি দেবী তাহাকে ডাকিতেছেন।

শান্তিদেবী মঠাধ্যক্ষ অধিকারী-মহারাজের পুত্রের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক বৃদ্ধ বাঙালী ব্রাহ্মণ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বিধবা কন্যা; তাঁহার বয়স ত্রিশের উর্দ্ধে,—সুকোমল স্নেহ-সরলতায় 'মাতৃ-কল্যাণমণ্ডিত শান্ত সুন্দর মূর্ত্তিখানি প্রসন্ন পুণ্যোজ্জ্বল, অকুণ্ঠিত নির্ম্মল দৃষ্টি যুগলে—ভক্তিভার-নম্র পূজারিণীর স্নিগ্ধ শুচিতা স্থির জ্যোতিষ্মান, পট্ট বসনাবৃতা বিধবা মূর্ত্তিমতী শ্রদ্ধার মত,—দেবতার পূজোপকরণ আহরণে ব্যাপৃতা ছিলেন,—সহসা উদ্যানের মুক্তদ্বার সম্মুখস্থ পথ দিয়া গমনরত নিরঞ্জনকে দেখিতে পাইয়া সাগ্রহে ডাকিতেছেন, "নিরঞ্জন, নিরঞ্জন—"

"আজ্ঞে"—সসম্ভ্রমে নমস্কার করিয়া নিরঞ্জন ফিরিয়া অগ্রসর হইল, শান্তিদেবী সাজী হাতে করিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সস্নেহে বলিলেন, "আজ কেমন আছ বাবা?"

"ভাল আছি মা,—আপনারা? দাদামশায়ের শরীর ভাল আছে ত?"

"হ্যাঁ বাবা, এখন এত ব্যস্ত সমস্ত হয়ে কোথা যাচ্ছ?"

অপ্রতিভ হইয়া নিরঞ্জন হাসিল,—চিন্তা উত্তেজনার আধিক্যে চরণ অজ্ঞাতে অনাবশ্যক প্রখর গতিশীল হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যমনস্কতার ঝোঁকে নিরঞ্জন সে দিকে লক্ষ্যও রাখে নাই!—সলজ্জ বিনয়ে নিরঞ্জন উত্তর দিল, "এইখানেই সঙ্গীদের কাছে যাচ্ছি, ক' দিন ওরা কি করছে না করছে কিছুই ত' জানি না, আজ পরিষ্কার রোদ উঠেছে, শরীরটাও এক রকম ভাল আছে, তাই একবার কাজগুলো দেখতে চলেছি।"

"বেশ ত' অত তাড়াতাড়ি যাবার দরকার কি? কাহিল মানুষ—" মমতা কোমল দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষুণ্ণ ভাবে শান্তিদেবী বলিলেন, "ক' দিনের অসুখে তুমি যে আধখানা হয়ে গেছ, এখন দিন কতক সামলাও,—বেশী খেটো খুটো না বাবা, শরীরটাকে বাঁচিয়ে তবে কাজ—"

নিরঞ্জনের অন্তরে উদ্যত উৎসাহ সবেগে মাথা নাড়া দিয়া বলিল, 'না না কাজটাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া, তবে শরীরকে বিশ্রামের ছুটি দেওয়াই প্রকৃত আরামের ব্যবস্থা!'—কিন্তু নিরঞ্জন কোন প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিল না, নিজের দেহের পানে চাহিয়া, অপরাধীর মত নত মুখে একটু হাসিয়া সবিনয়ে বলিল, "কি জানেন মা, পরিশ্রমের জন্যে যত না হোক্ নানাস্থান ঘোরার জন্যে জল হাওয়ার দোষে শরীর বেশী অসুস্থ হয়, বিশেষ এবার ক' মাস একাদিক্রমে আপনাদের বাঙলা দেশে আটক থেকে, শরীরটা বড়ই খারাপ হয়েছে—"

সস্নেহে হাসিয়া শান্তিদেবী মিষ্ট ভর্ৎসনার স্বরে বলিলেন, "তার ওপর, উড়িষ্যার ঠাকুর বাড়ীতে গিয়ে তাড়াতাড়ি কাজ সারবার জন্য ক' দিন দিনরাত ধরে যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটেছ, সে অত্যাচারের ফলটাই বা যাবে কোথা?"

আবার লজ্জিত হইয়া নিরঞ্জন নত মুখে ঈষৎ হাসিল, শান্তিদেবী মৃদু মন্দ তিরস্কারছন্দে, সস্নেহে তাহাকে শরীরের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্য গোটাকতক আবশ্যকীয় উপদেশ দিয়া—শেষে বলিলেন, "দেখ নিরঞ্জন, একটি কথা বলে রাখি বাবা, যখন যা কিছু জিনিসের দরকার হবে, আমায় জানাতে যেন কুণ্ঠিত হ'য়ো না—"

"আমার ত কোন জিনিসেরই অভাব নাই মা, ভাণ্ডারীজীর কাছে সবই ত পাই—"

"তবু বলে রাখ্‌ছি, তুমি আমাদের ঘরের ছেলে—যদি কিছু—" স্নেহাশ্রিত অনুরোধের স্বরে শান্তিদেবী অনেকগুলা কথা বলিলেন! বিব্রত নিরঞ্জন কি যে বলিবে খুঁজিয়া পাইল না, এই মমতা মাধুর্য্যে অতুলনীয়া স্নেহময়ী নারীর নিকট—শুধু মুখের কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা মূঢ়তা মাত্র। কয়দিন রোগে পড়িয়া ইহার আন্তরিক যত্ন করুণার মর্য্যাদা নিরঞ্জন হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছে,—এ উদার স্নেহ, নিঃস্বার্থ মমতার চরণে সে চিরদিন নতশির হইয়া থাকিবে, মুখ তুলিয়া—বাক্যাড়ম্বরে আর কি তুচ্ছ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বৃথা অকৃতজ্ঞ হইবে!—চিত্তোচ্ছ্বাস দমন করিয়া নিরঞ্জন নম্রভাবে সংক্ষেপে স্বীকার করিল যে—হাঁ, যদি কিছু প্রয়োজন হয়, সে শান্তিদেবীকে তাহা অবশ্য জানাইবে।

শান্তিদেবী আবার প্রশ্ন করিলেন, "তোমার সঙ্গী ছেলে দুটি ভাল আছে ত?"

নিরঞ্জন উত্তর দিল, "হাঁ—"

আরও দুই চারিটা কথার পর শান্তিদেবী বলিলেন, নিরঞ্জনের দাদা চিত্তরঞ্জন দেব,—বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে সম্প্রতি পত্রযোগে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন যে নিরঞ্জনের শরীর সম্পূর্ণরূপে সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে যেন পরিশ্রম করিতে না দেওয়া হয়, এবং শরীর সম্বন্ধে অমনোযোগী নিরঞ্জন যাহাতে কিছুদিন, শ্রমকঠিন অত্যাচারের সুযোগ না পায়, সে বিষয়ে বেদান্তবাগীশ মহাশয় যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক দৃষ্টি রাখেন।

নিরঞ্জন হাসিল, স্নেহশীল অগ্রজের দৃষ্টিতে আজিও সে এত অবোধ এত শিশু রহিয়াছে! তিনি অল্পবয়স্ক নিরঞ্জনের উপর কর্ম্মদায়িত্বের গুরুভার দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, কিন্তু শরীর সম্বন্ধে তাহাকে পাঁচ বছরের শিশুর অপেক্ষাও নির্ব্বোধ বলিয়া বিশ্বাস করেন!—ঈষৎ কুণ্ঠিত ভাবে নিরঞ্জন বলিল, "আমি নিজে ত সাবধান হয়েই চল্‌তে চেষ্টা করি তবে—"

বাধা দিয়া স্মিত-হাস্যে শান্তিদেবী বলিলেন, "হ্যাঁ তিনিও তাই লিখেছেন, যে নিরঞ্জন সকল বিষয়েই সাবধান, শুধু যন্ত্র হাতে করে পাথরের সাম্‌নে বস্‌লে তার দিন রাত্রি জ্ঞান থাকে না, খিদে তেষ্টারও আন্দাজ রাখে না এই বড় দোষ!—"

নিরঞ্জন আবার লজ্জায় পড়িয়া হাসিল!

ঠিক সেই সময় পিছনে, পথের বাঁকের আড়াল হইতে কিশোর-কণ্ঠে, স্নিগ্ধ-কোমল স্বরে কে ডাকিল, "দিদি—"

উভয়ের দৃষ্টি যুগপৎ সেই দিকে ফিরিল, দেখা গেল পিতলের কলসী কাঁখে, বছর চোদ্দ বয়সের দোহারা গঠনের ললিত-লাবণ্য-উজ্জ্বলা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যশ্রী মণ্ডিতা এক বালিকা আসিতেছে!—মুহূর্ত্তে নিরঞ্জনের দৃষ্টি আনন্দে মুগ্ধ হইয়া গেল! এ কি অপরূপ!—প্রভাত শিশির সিক্ত সদ্যঃপ্রস্ফুটিত চম্পকের সৌরভ-গৌরব সযত্নে নিঙড়াইয়া বাস্তবের বুকে একি জীবন্ত শিল্প মাধুর্য্য উৎকীর্ণ হইয়াছে!

নিরঞ্জন বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল!—এ বালিকার বসন ভূষণ ত পার্শী বা স্থানীয় অপর কোন জাতির প্রথানুগত নহে,—এ যে অনূঢ়া বঙ্গ

বালিকার অবগুণ্ঠনহীনা মূর্ত্তি!—কি মনোহারিণী কান্তি, কি অনুপম লাবণ্য! কি চমৎকার সুন্দরী বালিকা!

নিরঞ্জন পথের পাশে দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া বালিকা তাহাকে দেখিতে পায় নাই, বক্র প্রাচীরের পাশ ঘেসিয়া সে যেমন অকুণ্ঠিত ভাবে অগ্রসর হইতেছিল, তেমনই সোজা আসিতে লাগিল,—শান্তিদেবী তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদিমা কেমন আছেন—মায়া?"

"ভাল আছেন, কিন্তু—" সদ্যঃস্নাতা শান্তিদেবীর পানে চাহিয়া ক্ষুণ্ণ ভাবে বালিকা বলিল, "তুমি নেয়ে এসেছ দিদি, আমি তোমার সঙ্গে দীঘীতে জল আনতে যাব বলে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আসছি, তবুও বেলা হয়ে গেল,—আজ যে দিদিমার খাবার জল একটুকুও নাই—"

"তাই ত, তা হলে কি হয়, আমি ত ভাই জানিনা, আগে স্নান করে এলুম,—আচ্ছা, আজকের মত একলাটি যেতে পারবি না মায়া?" শেষের কথাটি জিজ্ঞাসা করিবার সময়—বালিকার মুখের প্রতি কৌতুক-স্মিত কটাক্ষপাত করিয়া শান্তিদেবী মৃদু হাসিলেন।

সে হাসিতে লজ্জা-সঙ্কুচিত হইয়া মায়া দৃষ্টি নামাইয়া ঈষৎ হাসিল, মৃদু কণ্ঠে বলিল, "তা পারব, তবে রাস্তায় বড় লোক থাকে কি না, একলাটি তাই ভারি লজ্জা করে, আজ আবার মনুকে শুদ্ধ সঙ্গে আনি নি—"

সহসা অপরিচিত নিরঞ্জনের উপর চক্ষু পড়িল,—বিস্ময়-বিমূঢ় নিরঞ্জনের কৌতূহল-বিস্ফারিত দৃষ্টি দেখিয়া,—অকস্মাৎ কুণ্ঠাহত

বালিকা স্তব্ধ ভাবে থমকিয়া দাঁড়াইল,—চকিতে নিরঞ্জনও নিজের মধ্যে একটা অসহনীয় সঙ্কোচ ও ধিক্কার ব্যঞ্জক নির্ব্বুদ্ধিতা অনুভব করিয়া—অত্যন্ত থতমত খাইয়া গেল! নিরঞ্জন ত্রস্তে ফিরিয়া শান্তিদেবীর উদ্দেশ্যে নিঃশব্দে একটি নমস্কার করিয়া, ঈষৎ দ্রুতপদে গন্তব্য স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইল,—লজ্জায় তাহার ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ফুটিয়া উঠিল, দুর্ব্বল চরণদ্বয় অস্বাভাবিক দ্রুতগমনে বারম্বার স্খলিত হইতে লাগিল,—কোনরূপে রাস্তার মোড়ে পৌছিয়া, নিরঞ্জন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল,—কি নিগ্রহ! অপরিচিত—বিশেষতঃ এমন বৈশিষ্ট্য-গুণ-বিশিষ্ট অপরিচিতের দৃষ্টি সমক্ষে—এক মুহূর্ত্তের জন্য এতটুকু আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলে,—তাহার মত ব্যক্তির পক্ষে কি অমার্জ্জনীয় মূর্খতা-ই প্রকাশ পায়!

রাস্তার মোড় ফিরিয়া, স্বভাব শান্ত পাদক্ষেপে চলিতে চলিতে,—লজ্জা-কুণ্ঠিত চিত্তে নিরঞ্জন ভাবিতে লাগিল।—ঐ নিরুপম সৌন্দর্য্য বিদ্যুদ্দীপ্তিময়ী বঙ্গবালিকার কোমল-সম্ভ্রম-নম্র দৃষ্টিতে, নিরঞ্জনের আপাদ মস্তক ব্যাপী মূঢ়বর্ব্বরতা—নিশ্চয়ই নিষ্ঠুর ঔজ্জ্বল্যে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে! নিরঞ্জনের নির্লজ্জ মূর্খতায়—ঐ বালিকা মনে যে কি ধারণা পোষণ করিবে, তাহা নিরঞ্জন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না; তীক্ষ্ণ অঙ্কুশের মত একটা গোপন সঙ্কোচ বার বার তাহার চিত্ত মধ্যে ভৎসনার ভ্রূকুটি হানিতে লাগিল,—ছিঃ, লোকাচার সম্মত ব্যবহার-বিধিপালনে, সে আজিও বালকের অধম অসতর্ক! বিধি নিষেধের নির্দ্দিষ্ট সীমাটুকু, সে সকল ব্যাপারেই অসাবধানে লঙ্ঘন করিয়া—তবে পা ফেলে! কি দুর্ব্বুদ্ধি তাহার।

অন্য দিকের পথ হইতে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের দূরসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র কেবলরাম আসিয়া নিরঞ্জনের সঙ্গ ধরিল,—নিরঞ্জনের চিন্তা স্থগিত হইল। শারীরিক কুশল ও অন্যান্য প্রসঙ্গের নানা কথা কহিতে কহিতে কেবল নিরঞ্জনের সঙ্গে চলিল।

কেবল নিরঞ্জনের সমবয়স্ক, খুব চটপটে কাজের লোক, কথাবার্ত্তায় বেশ প্রাণখোলা সরল প্রকৃতি, অপরিচিতের সহিত বন্ধুত্ব পাতাইতে এবং পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে তাহার চিত্ত সদা উন্মুখ; বিদেশে বিদেশী সমাজে বাস করিয়া—নিজের নিজস্ব বিশেষত্বটুকু অক্ষত রাখিয়াও, সে তাহাদের সকলের আপন জন হইয়া পড়িয়াছিল। রোগীর সেবা, অসহায় বিপন্নের সাহায্য অথবা কোন দিকে কাহারও কোন কাজে খাটিবার প্রয়োজন হইলে,—কেবলরাম সকলের আগে গিয়া দাঁড়াইত; পরিচিত প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারগুলি তাহাকে 'ঘরের লোক' বলিয়া জানিত। অপর সাধারণের দায়-দৈবে, কেবল বুক দিয়া পড়িয়া উপকার করিত,—সেই জন্য সংসারে 'কাজের লোক' নামধারী অনেকে তাহাকে নিষ্কর্ম্মা আড্ডাবাজ বলিয়া ডাকিত, কিন্তু বাস্তব পক্ষে কেবলের স্বভাবে নিষ্কর্ম্মণ্যতার চিহ্ন মাত্র ছিল না।

পূর্ব্বে সে বাঙ্গালাদেশে বছর পাঁচেক ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করিয়াছিল, তারপর পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সহিত তেমন ঘনিষ্ঠতা না থাকায়, দেশের মায়া কাটাইয়া বোম্বাইয়ে দূর সম্পর্কীয় জ্যেষ্ঠতাত বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত প্রভৃতি শিখিবার জন্য আসে, শান্তিদেবী ছাড়া বৃদ্ধ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অন্য সন্তানাদি আর ছিল না, সুতরাং পুত্র-প্রতিম কেবল

চরিত্রগুণে তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহপরায়ণ চিত্তের অনেকখানি স্নেহ অল্প সময়েই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল, অনেকে সন্দেহ করিত যে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মৃত্যুর পরে, কেবলরামই তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি ও অতিথিশালাধ্যক্ষতা পদের অধিকারী হইবে।

উভয়ে কথা কহিতে কহিতে আসিয়া দেবালয়ের সাম্‌নের দেউড়ী দিয়া ভিতরে ঢুকিল, দ্বারে প্রকাণ্ড-পাগড়ী মাথায়, সসজ্জ বেশে এক জন ভীমকান্তি মহারাষ্ট্র প্রহরী, সশস্ত্র অবস্থায় গম্ভীর ভাবে গোঁফে মোচড় দিয়া নিরীহ পথিকদের প্রাণে ঐশ্বর্য্য আড়ম্বরের গরিমাভীতি জাগাইয়া, সদম্ভে প্রহরা দিতেছিল—ইহাদের দেখিয়া ঈষৎ মাথা নোয়াইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

মঙ্গল-মঠ দেবালয়টি দুই মহলা ; বহির্মহলে প্রাঙ্গনের দুই পার্শ্বে গৃহশ্রেণীতে দেবালয়ের—বনাম দেবালয়অধিকারীর ভৃত্যগণ বাস করে। ভিতর মহলে বিস্তৃত প্রাঙ্গন, তার পর নাটমন্দির—এবং বিগ্রহ গোপালজীর মন্দির প্রভৃতি।

দেবালয়ের সাম্‌নে পথের অন্য পাশে প্রকাণ্ড সিংহদ্বারযুক্ত জমীদারী কাছারী ; মঙ্গলমঠের দেবোত্তর সম্পত্তি ও মঠাধিকারী মহারাজের ধনী ভাটিয়া বণিক জাতীয় শিষ্য সম্প্রদায় হইতে প্রচুর আয় হইয়া থাকে, সুতরাং কাছারীতে দেওয়ান, সহকারী দেওয়ান, কাঁরকুণ গোমস্তা প্রভৃতি অনেকগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে এবং প্রত্যহ যথাবিধি কাছারীর অধিবেশন হইয়া থাকে।

এ অঞ্চলে মঠাধ্যক্ষগণ 'অধিকারী মহারাজ' আখ্যায় অভিহিত হন, ইঁহারা বল্লভাচারি সম্প্রদায়ভুক্ত। বিবাহ করিয়া 'সংসার-ধর্ম্ম

পালন ও পুরুষানুক্রমে গদীর অধিকারীত্ব গ্রহণে ইঁহাদের কোন বাধা নাই। বিপুল আড়ম্বরে রাজকীয় প্রথায়, প্রচুর ভোগ-বিলাস আয়োজনে—ইঁহারা মহাসমারোহে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। মঠ-সংক্রান্ত সমুদয় আয় ব্যয়ে ইঁহারা যথেচ্ছ অধিকারী। জাতিতে ইঁহারা দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ!

মঠের বর্ত্তমান অধিকারী মহারাজ শিবনন্দন আচার্য্য এখন মঠে নাই, ভোগ-জীর্ণ ভগ্ন স্বাস্থ্যের পুনরুন্নতি কল্পে তিনি নানা স্থান ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার প্রাপ্ত-বয়স পুত্র দেবকীনন্দন, পিতার প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য মাঝে মাঝে মঠে আসিয়া বাস করেন,—বাকী সময় ইচ্ছামত আমোদ প্রমোদ লইয়া দেশ দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান; পিতা-পুত্রের অবর্ত্তমানে মঠের ব্যবস্থা-ভার বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও দেওয়ান গুরুপ্রসাদের হাতে থাকে।

দেবালয়ের বহির্মহলে ভগ্ন প্রাচীরের পুনঃসংস্কার কার্য্য যেখানে চলিতেছিল, কেবল ও নিরঞ্জন সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কয়দিনের পর সহকর্ম্মী সুহৃদকে রোগ শয্যা ছাড়িয়া—কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, কার্য্যরত ভাস্করদ্বয়ের প্রফুল্ল মুখমণ্ডল, দ্বিগুণ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্ফূর্ত্তির উৎসাহে পরিহাস-রসিক আদিত্য শর্ম্মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া,—যন্ত্র হাতেই সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করিল,—"স্বাগতম্, এতক্ষণ আসর জুড়িয়ে ছিল, আহা কন্দর্প দেব ব্যতিরেকে কি—"

ক্ষিপ্র কৌশলে তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া দ্বিতীয় ভাস্কর সনাতন বলিয়া উঠিল—"কন্দর্প ব্যতিরেকে কি, 'পর্য্যঙ্কবন্ধস্থির-

পূর্ব্বকায়মৃজ্জায়তং' মহাদেবের সদ্গতি হয়! এই বার অবশ্য আসর জম্‌বে বৈ কি!"

ভাস্করদ্বয় বয়সে নিরঞ্জনের অপেক্ষা দুই চারি বৎসরের বড় হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা নিরঞ্জনের সহকারী মাত্র। নিজের দক্ষতা ও অধ্যবসায় বলে, নিরঞ্জন তাহাদের উর্দ্ধতন স্থানীয়, কিন্তু নিরঞ্জন সেই শ্রেষ্ঠত্বের দাবীটুকু স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়াছিল। অমায়িক ব্যবহার গুণে সহৃদয় ভাবে তাহাদের সন্নিকর্ষণ করিয়া সাদরে সমতুল্যতার অধিকার দিয়াছিল। নিজে বয়সে ছোট বলিয়াও বটে, এবং সম্মান-স্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা সমপ্রাণতার প্রত্যাশা বেশী থাকার জন্যও বটে, নিরঞ্জন তাহাদের নিকট ন্যায্য-খাতির চাহিত না,—অনেক সময় অন্যায্য অত্যাচার সহ্য করিয়াও সহিষ্ণু নিরঞ্জন তাহাদের কাছে চাহিত শুধু—অন্তরঙ্গ স্নেহ-সৌহার্দ্য। রহস্য-কৌতুক প্রিয় সহকর্ম্মীদ্বয় সেইজন্য দ্বিধাহীন চিত্তে কারণে অকারণে তাহাকে উপহাসে পরিহাসে অস্থির বিব্রত করিয়া তুলিত।—কিন্তু নিরঞ্জন সর্ব্বদাই নির্ব্বিকার ক্ষমাশীল।

তাহাদের কথা শুনিয়া স্মিতবদনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া নিরঞ্জন মৃদু স্বরে বলিল, "কিন্তু জননী পার্ব্বতী যে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত নাই—আদিত্য—"

আদিত্য কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় ভাস্কর সনাতন, সকৌতুকে চোখ টিপিয়া গূঢ় ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "না হোক, নেপথ্য অভিনয়ের স্মৃতি-কল্পনাতেও সংজ্ঞাহারা হওয়া চল্‌বে, কি বল আদিত্য?"

আদিত্য এক লাফে নিকটস্থ হইয়া ধুলি-মলিন হাতেই তাহার মাথায় প্রবল চপেটাঘাত বসাইয়া সকোপে বলিল, "পাষণ্ড!—"

সনাতন মাথার ধুলা ঝাড়িয়া নিতান্ত নিরীহ ভাবে নিরঞ্জনের মুখ পানে তাকাইয়া, কপট বিস্ময়ে, সকরুণ ভাবে বলিল, "সখা কন্দর্প, কাব্য এবং পুরাণে কেবলমাত্র মদনভস্মই ত দেখা গিয়াছে, কিন্তু নিরপরাধ বসন্তের মাথায় এই কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য ধরণের নির্ম্মম চপেটাঘাতটা বোধ হয় আধুনিক সংস্করণে আমদানি হয়েছে, নয় ?"

তাহার কথা কহিবার ভঙ্গী দেখিয়া নিরঞ্জন হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না,—কেবলরাম সশব্দে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল,—বাক্য-বাণে আহত আদিত্য—কৃত্রিম রোষে সনাতনকে পুনশ্চ আক্রমণের চেষ্টা করিল, কিন্তু এবার সতর্ক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পারিয়া উঠিল না। অগত্যা মর্ম্মান্তিক ক্ষোভে তাহাকে নিপাত যাইবার আদেশ দিয়া,—নিরুপায় ভালমানুষী অবলম্বন করিয়া মনোযোগ সহকারে পাথর কাটিতে বসিল, নিরঞ্জন পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তে দাঁড়াইয়া নীরবে হাসিতে লাগিল।

হাসি থামাইয়া কেবল কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা নিরঞ্জন ঠাকুর, তোমাদের কেউ কন্দর্প, কেউ বসন্ত, কেউ মহাদেব—অভিনয়ের রগড়ও ঠারে ঠারে বড় মন্দ চল্‌ল না, ব্যাপারটা কি বল দেখি ?"

লজ্জিত হাস্যে নিরঞ্জন বলিল, "ঐ পাজী দুটোকে জিজ্ঞাসা করুন।"

সনাতন তৎক্ষণাৎ যন্ত্র ফেলিয়া, মহা উৎসাহে হস্তপদ আস্ফালন করিয়া বলিল, "বেশ, আমাদের বল্‌তে হবে ? উত্তম, আসুন কেবল বাবু—আমিই কথকতা কর্‌ব শুনুন।"

আদিত্যের যত্ন-সৃষ্ট গাম্ভীর্য্য সমাধি এইবার টলিল, পাথর কাটা

স্থগিত রাখিয়া ত্রস্তভাবে ফিরিয়া বসিয়া সবিনয়ে বলিল, "লক্ষ্মী দাদা আমার, যে দিকে যত খুসী রং ঢাল, কোন দুঃখ নাই, কিন্তু কৃপা করে অনুগত অভাগাকে একটু সাঙ্কেতিকতার আড়ালে রেখ, অবশ্য—" নিরঞ্জনের প্রতি গূঢ়-ইঙ্গিত নির্দ্দেশে পরম ঔদার্য্যের সহিত বলিল, "ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে, তোমার যা-খুসী তাই করতে পার, তাতে আমি সরলান্তঃকরণে অনুমোদন করছি, কিন্তু—"

"না, এখানে আমায় দাঁড়াতে দিলে না"—নিরঞ্জন ধীরে ধীরে গমনোন্মুখ হইল. আদিত্য এক লম্ফে সম্মুখীন হইয়া বলিষ্ঠ-কঠিন হস্তে নিরঞ্জনের স্কন্ধদেশ চাপিয়া ধরিল, উৎসাহিত কণ্ঠে সনাতনকে অনুজ্ঞা দিল, "চালাও দাদা—"

"যা ভাই, সকাল বেলা কাজ কামাই করিস্ নি, ছেড়ে দে—" আদিত্যকে তাহার কাজের দিকে ঠেলিয়া দিয়া, নিরঞ্জন প্রাচীরের ভগ্ন স্থান অতিক্রম করিয়া বাহিরের রাস্তায় চলিয়া গেল।

নিরঞ্জন অদৃশ্য হইলেও সনাতন দমিল না, সদম্ভে গুম্ফ জোড়ায় সজোরে পাক দিয়া, সে সাড়ম্বরে কথকতা আরম্ভ করিল—"একদা বেহার অঞ্চলবাসী জনৈক ধনী ভূম্যধিকারীর উৎসাহ প্রচেষ্টায় সংস্কৃত কুমারসম্ভব কাব্যখানি যথাযথ ভাবে হিন্দী ভাষায় নাটকাকারে রূপান্তরিত হয়, এবং অভিনয়ার্থে একদল অভিনেতা সম্প্রদায় গঠিত হয়। কার্য্য গতিকে আমরাও সে সময় সেখানে ছিলুম, সুতরাং যোগ্যতার অজুহাতে,—বিচক্ষণ কর্ত্তৃপক্ষের আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হয়ে আমরাও অস্থায়ী ভাবে সেই সম্প্রদায় ভুক্ত হই, আমাদের মধ্যে জনৈক কাটখোট্টা চেহারার গোয়ার-গোবিন্দ বন্ধু—" স্বর নামাইয়া

বলিল—"বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ সে ভদ্র লোকের নাম প্রকাশ করতে পারলুম না, অপরাধ ক্ষমা করবেন—" বলিয়াই আদিত্যের শক্তি-বিক্রম-স্ফীত পেশী-পুষ্ট নধর নিটোল দেহটির পানে একবার গোপন কটাক্ষপাত করিয়া হাসি চাপিবার ছলে. একটু কাশিল—বলা বাহুল্য মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই অপ্রকাশ্য নামধারী গোয়ার-গোবিন্দ বন্ধুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধিমান কেবলরামের আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। আদিত্য ক্ষোভপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিযা রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিতে লাগিল, সনাতন তাহার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আপন মনেই বলিয়া চলিল, "তারপর আমাদের মধ্যে আর একটি কিশোর-কোমল কন্দর্প-কান্তি তুকে ধরে কামদেব সাজান হ'ল, এবং অহং শ্রীসনাতন শর্ম্মা—প্রচণ্ড ক্রোধী আদিত্যের—দূর হউক, রুদ্র-রোষ-কটাক্ষে ভস্মীভূত কন্দর্পের বিয়োগ-বিধুরা রতি দেবীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য—কন্দর্প-সখা বসন্তদেবরূপে মনোনীত হলেম।"

তারপর, অভিনয়াংশ কিরূপ দক্ষতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল, সনাতন মহা উৎসাহে, হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গীসহ তাহা বর্ণনা করিতে লাগিল, আদিত্য প্রাণপণে ধৈর্য্য ধরিয়া নিবিষ্ট চিত্তে পাথর কাটিতে লাগিল। ভাস্করগণের সাহায্যকারী শ্রমজীবিগণ ব্যাপার ভাল না বুঝিলেও, সনাতনের বর্ণন কৌশলের বিচিত্র কৌতুক-ভঙ্গী দেখিয়া বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া গেল,—কেবলরাম হাসিয়া আকুল!—আমোদ জমিয়া উঠিল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিরঞ্জন বাহিরে আসিয়া দেখিল, রাস্তার পাশে সদ্য-আনা প্রস্তরস্তূপের অন্তরালে বসিয়া, প্রস্তর-বাহক শ্রমজীবি বালক "মঞ্জু" একাগ্র মনোযোগে একটা কিছু করিতেছে, কৌতূহলী নিরঞ্জন নিঃশব্দে তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, দেখিল মঞ্জু নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া স্থলপদ্ম জাতীয় একটি প্রস্ফুটিত ফুল লইয়া সাগ্রহে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নিরীক্ষণ করিতেছে, ক্ষণে ক্ষণে ফুলটা তুলিয়া ঘনিষ্ঠ ভাবে নাকে লাগাইয়া প্রাণপণে নিশ্বাসও টানিতেছে।

এ অঞ্চলে ফুল ভালরূপ ফোটে না, নিরঞ্জন অনুমানে বুঝিল বালক দৈবক্রমে কোন উপায়ে ফুলটি হস্তগত করিয়াছে বলিয়া—আনন্দে কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া খেলায় মাতিয়াছে!—সহকর্ম্মীদের অমনোযোগিতার উপর রাগ হইল—ছিঃ, লক্ষীছাড়াদের দায়িত্ব জ্ঞান উদ্বুদ্ধ হইবে কবে! তাহারা এইরূপে অধীনস্থ—বিবেচনা বোধহীন শ্রমজীবিগণকে, যথেচ্ছ আমোদে অকারণ সময় নষ্ট করিবার সুযোগ দিয়া—সময়ের পরিমাপে পারিশ্রমিক লইয়া এইরকমে পরের কাজ সমাপ্ত করে!—ঈষৎ গম্ভীর স্বরে নিরঞ্জন ডাকিল, "মঞ্জু—"

চমকিয়া মঞ্জু ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, অপ্রস্তুতে পড়িয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইল না, তাড়াতাড়ি হাতের ফুলটা নিরঞ্জনের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া সহাস্যে ইঙ্গিত করিল 'লউন'।

ফুলটা উৎকোচ দিয়া নির্ব্বোধ বালক আত্মরক্ষা করিতে চায় দেখিয়া নিরঞ্জনের হাস্যোদ্রেক হইল,—সামলাইয়া সস্নেহ-ভৎর্সনায়

তাহাকে মিষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল,—কাজ ফেলিয়া সকাল বেলা-টা খেলা করিবার সময় নহে!

ফুলটা নিরঞ্জনের হাতে গুঁজিয়া দিয়া, মধু একটি কথা না কহিয়া তাড়াতাড়ি নিজের কাজে চলিয়া গেল, আহার এ দণ্ডটুকু গ্রহণে নিরঞ্জনের ইচ্ছা ছিল না,—কিন্তু আপত্তি করিতেও দ্বিধা হইল, বালকের শঙ্কা-কুণ্ঠিত মুখপানে চাহিয়া ফুলটা লইল,—কিছু বলিল না।

রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া প্রাচীরের সদ্যঃ সংস্কৃত স্থানগুলির উপর চোখ বুলাইয়া নিরঞ্জন দেখিল কাজ বড় মন্দ হয় নাই,—সন্তুষ্ট হইয়া নিরঞ্জন ফিরিল। ফুলটা হাতে ঘুরাইতে ঘুরাইতে,—অতঃপর কি করা যায় তাহাই ভাবিতে লাগিল।

সহসা মস্তিষ্কে এক নূতন সঙ্কল্প উদিত হইল, এই ফুলের নক্সা তুলিয়া লইলে হয় না?—ফুলটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পরীক্ষা করিল, হাঁ ইহার গঠন শোভা নূতনও বটে, মনোরমও বটে!—অতএব আজিকার এ প্রভাতটা, নবাবিষ্কৃত শিল্প-সৌন্দর্য্য পরিস্ফুটনের সার্থকতায় বরণ করিয়া লওয়া যাউক।

তৎক্ষণাৎ মনে মনে শিল্পদেবতা ও দীক্ষাগুরুর চরণ বন্দনা করিয়া উৎসাহিত পাদক্ষেপে নিরঞ্জন সঙ্গীদের নিকট যন্ত্র লইতে ভিতরে আসিল, অতিথিশালায় জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের সহকারিতা করিবার জন্য কেবলরাম তখন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আদিত্য ও সনাতনের মধ্যে তখনও সেই হাস্য পরিহাস ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জের থামে নাই—নিরঞ্জন চাহিয়া দেখিল, তাহাদের হাতের কাজটা কিন্তু সমানে চলিতেছে; সুতরাং অনাবশ্যক বাক্যব্যয় না করিয়া, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

যন্ত্রগুলার মধ্য হইতে বাছিয়া খুঁজিয়া গোটাকতক প্রয়োজনীয় যন্ত্র তুলিয়া লইয়া নিশব্দে ফিরিল। সদা চঞ্চলস্বভাব সহকর্ম্মী দুইটির নিকট বসিয়া চিত্তস্থৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব, সুতরাং সমাহিত চিত্তে সূক্ষ্ম কাজ সুসম্পন্ন করাও সুকঠিন,—প্রাচীরের ভগ্নস্থান অতিক্রম করিয়া বাহিরে—কোলাহল বিরল পথের পাশে জুতা খুলিয়া বসিয়া নিরঞ্জন কাজে লাগিল।

পায়ের আঙ্গুলে চাপিয়া ধরিয়া নানা ভঙ্গীতে ফুলটি সোজা বাঁকা করিয়া, দূরত্বের ব্যবধানে রাখিয়া—নিকটে ঝুঁকিয়া, বহুরূপ অভিনিবেশ সহকারে সেটাকে পর্য্যবেক্ষণ করিল, খানিক ভাবিল—তারপর একটুকরা পাথরের গায়ে রেখা টানিয়া তাহার প্রতিকৃতি খোদাই আরম্ভ করিল।

নিরঞ্জনের গভীর অন্যমনস্কতার জন্য হাতের কাজ খুব ধীরে ধীরে চলিতেছিল; পথের পারে তাহাকে নিষ্পন্দ নিশ্চল ভাবে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, গমনশীল পথিকগণ নীরবে তাহার পানে কৌতূহলী কটাক্ষ হানিয়া যাইতেছিল, চলিতে চলিতে কেহ বা থামিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়াও লইতেছিল, কিন্তু ধ্যানমগ্ন নিরঞ্জনের কিছুতে ভ্রূক্ষেপ ছিল না, সে সমানে নতশিরে বসিয়াছিল।

একাগ্র স্থির দৃষ্টিযুগল, অবসাদে বার বার সজল হইয়া আসিতে লাগিল, মেরুদণ্ড বেদনা-ক্লান্ত হইয়া উঠিল, প্রভাত সূর্য্যের ক্রমোত্তপ্ত রশ্মিচ্ছটা ক্রমশঃ অসহ্য বোধ হইতে লাগিল, নিরঞ্জন ঝোঁক ছাড়িয়া গা ঝাড়া দিবার সঙ্কল্প করিল,—কিন্তু এ অবস্থায় গা ঝাড়া দেওয়া

বড় শক্ত কথা! ফুলের সেই স্তর-বিন্যস্ত পাপড়ীর প্রতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খাঁজের শোভাটুকু—অবিকৃত সুন্দর থাকিতে থাকিতে পাথরের গায়ে তাহার যথাযথ আকৃতিটা সমপরিমাণে রেখা টানিয়া ফুটাইয়া লওয়া চাই ত!—গভীর আগ্রহ আবিষ্টতার মোহ কাটাইয়া উঠিতে নিরঞ্জনের মোটে ইচ্ছা হইতেছিল না, মাত্র দায়ে পড়িয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল! শ্রান্তি-ক্লিন্নতাকে সান্ত্বনা দিয়া, কেবলই ভাবিতেছিল—'আর একটু!'

অকস্মাৎ একটা তীব্র আর্ত্তনাদ সহ যুগপৎ বহু কণ্ঠের উৎকণ্ঠিত কোলাহল শব্দে,—নিরঞ্জন ত্রস্তে চমকিয়া দৃষ্টি তুলিল,—দেখিল বালক মঙ্কু প্রাচীরের উপর উঠিতে উঠিতে পদস্খলিত হইয়া বাহিরে রাস্তার উপর পড়িয়া একটা বড় পাথরে মাথা ঠুকিয়া বেচারী সংজ্ঞা হারাইয়াছে!

চক্ষের নিমেষে নিরঞ্জনের মত্ততা-ঘোর নিঃশেষে অন্তর্হিত হইল, সমস্ত ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া সে বালকের কাছে উপস্থিত হইল, সাবধানে তাহাকে ধরিয়া সরাইয়া দেখিল, বালকের মাথার পিছন দিকটা কাটিয়া গিয়াছে। ক্ষত হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া শোণিত স্রোত নির্গত হইতেছে;—বালক নিস্পন্দ!

বালকের সঙ্গী শ্রমজীবিরা কাজ ফেলিয়া মহা কলরবে ছুটাছুটি গোলমাল বাধাইয়া ফেলিল, রাস্তার পথিকবর্গ উৎসুক ভাবে জড় হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল—চারিদিক হইতে বিচিত্র কণ্ঠের বিবিধ বিস্ময় প্রশ্ন ও সহানুভূতির 'আহা' বর্ষিত হইয়া, স্থানটা মুখরিত করিয়া তুলিল, কিন্তু উপস্থিত প্রয়োজনের উপযুক্ত সাহায্য-চেষ্টার লক্ষণ কাহারও আচরণে দেখা গেল না। অসহায় বিব্রত নিরঞ্জন সেইখানে

বসিয়া পড়িয়া উরুর উপর বালকের মাথা তুলিয়া লইয়া পরিধেয় বস্ত্রে তাহার ক্ষত স্থান চাপিয়া ধরিয়া, ব্যগ্র কণ্ঠে বলিল, "জল জল—"

সনাতন ও আদিত্য যন্ত্র হাতে করিয়াই ছুটিয়া আসিল, কোলাহল-কারী শ্রমজীবিগণ "কই জল—কোথায় জল" ইত্যাকার প্রশ্নে শৃঙ্খলা ছন্দহীন বিরাট হুলস্থূল বাধাইয়া তুলিল, দারুণ বিস্ময় উদ্বেগে সকলেই যেন যুগপৎ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। জলের প্রয়োজনীয়তা বোধ আতঙ্কের ভিড়ে চাপা পড়িয়া গেল, বিভীষিকা অভিভূতের মত সকলেই শুধু হায় হায় করিতে লাগিল!—দেবালয়ের এলেকায় এমন কাণ্ড, বালক দেবতার কাছে কি অপরাধ করিয়াছিল!'

ফাঁপরে পড়িয়া উৎকণ্ঠিত নিরঞ্জন বলিল, "ওরে আদিত্য তুই ভাই দৌড়ে যা, ঠাকুরবাড়ী থেকেই একটু জল নিয়ে আয়—"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গমনোন্মুখ আদিত্যের পাশ কাটাইয়া, দীপ্তিময়ী বিদ্যুল্লতার মত উজ্জ্বল জ্যোতিঃস্নাতা এক সুন্দরী কিশোরী অকস্মাৎ সম্মুখে আবির্ভূতা হইল। তাহার কক্ষে জলপূর্ণ কলস,—আগ্রহ-ব্যাকুল কণ্ঠে বালিকা বলিল, "নিন, এই নিন্, জল কোথায় দেব?"

মুহূর্ত্তে মুখ তুলিয়া চাহিয়া নিরঞ্জন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল! এ কি—এ যে সেই অনতিকালপূর্ব্ব দৃষ্টা লজ্জাশীলা বঙ্গসুন্দরী! কোথা হইতে তিনি এখানে এমন করিয়া—এক নিমিষে মুক্ত সঙ্কোচে এত কাছে আসিলেন! এমন দেবী মূর্ত্তিতে!

বালকের দিকে করুণা-ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিতে গিয়া—নিরঞ্জনের স্তব্ধ বিস্মিত দৃষ্টির উপর মায়ারও দৃষ্টি পড়িল। এ কি ছিঃ!—অপরিচিত যুবার বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টি সংঘাতে, তাহার অন্তরের আত্ম-বিস্মৃত নারীত্ব

এক নিমিষে তীব্র চেতনায় সশঙ্কিত হইয়া উঠিল, বালিকার মনে পড়িল —সে শুধু বালিকা নহে, আরও কিছু!

লজ্জার রুদ্ধ গ্লানিতে তাহার সুন্দর মুখমণ্ডল লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সঙ্কোচ-সন্ত্রস্ত বালিকা দৃষ্টি নামাইয়া পিছু হটিল— ছি ছি সে করিয়াছে কি? আহত বালকের জন্য জলের প্রয়োজনে, বিপন্ন-ব্যাকুল আহ্বান শুনিয়া, আত্মহারার মত সে কোথায় ছুটিয়া আসিয়াছে! এযে তাহার অধিকার সীমার বাহিরে।

হঠাৎ আতঙ্ক-উৎকণ্ঠার উত্তেজনায় এতগুলা লোকের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া, এতক্ষণে সচেতন হইয়া বালিকা নিজের পানে চাহিল, ক্ষুব্ধ-ব্রীড়া নিষ্পীড়নে তাহার সমস্ত চিত্ত দারুণ ধিক্কারে নিষ্পীড়িত হইয়া উঠিল! ছিঃ সকলেই তাহার দিকে নিষ্ঠুরের মত নির্লজ্জ কৌতূহলে চাহিয়া আছে! বালিকার আর চোখ তুলিতে সাহস হইল না। মুহূর্ত্ত পরেই পশ্চাৎ হইতে পরিচিত কণ্ঠে কে বলিল, "আরে এ কি? মায়া তুই এখানে!"

বিপন্ন নিরুপায় মায়া আত্ম সম্বরণের অবলম্বন পাইয়া, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া দেখিল, কেবলরাম কয়েকজন লোকের সহিত দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, দৃষ্টি নামাইয়া জড়িতস্বরে মায়া বলিল, "দাদা জলটা দিয়ে যাও—"

সমাগত লোকগুলির উদ্বেগ-ব্যাকুল কণ্ঠের উপর্য্যুপরি প্রশ্নোত্তর কোলাহলের মধ্যে মায়ার ক্ষীণ কণ্ঠ স্বর ডুবিয়া গেল, কেবল কিছুই শুনিতে পাইল না, অনুমানে শুধু তাহার মন্তব্যটা বুঝিল—ঘড়াটা লইয়া ঈষৎ ভর্ৎসনাসূচক কণ্ঠে বলিল, "হু, তুই ছেলে মানুষ, কি কর্ত্তে এখানে

এলি!" কেবল ও তাহার সঙ্গীরা ঘড়া হইতে জল লইয়া, মূর্চ্ছিত বালকের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল, চতুর্দ্দিকের উদ্বেগ কোলাহল সংযত হইয়া অবান্তর বক্তব্য গুঞ্জনে পর্য্যবসিত হইল। লজ্জা-সঙ্কুচিত মায়া ধীরে ধীরে সরিয়া আসিয়া এক পাশে দাঁড়াইল। আপনার পানে চাহিয়া ক্ষোভ-সন্তপ্ত মায়া ম্লান মুখে ভাবিল—তাইত! সে কেন এখানে আসিল! কি করিতে আসিল? কাজ?—কি স্পর্দ্ধা তাহার! এখানকার কাজে হাত বাড়াইবার অধিকার তাহার কোথা? এখানে যত অভাবই থাক্ এবং তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু সাহায্য করিবার ক্ষমতাই থাক্,—তাহা যে উভয় পক্ষেই একান্ত নিষ্ফল! বিধি নিষেধের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান—অভ্রভেদী পাহাড়ের মত অটল ভাবে তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিষ্ঠুর হাসি হাসিবে, সে ত কোন বেদনার বিলাপ শুনিবে না, কোন আগ্রহ ব্যাকুলতার আবেদন গ্রাহ্য করিবে না,—নিষ্করুণ পাষাণের মত স্থির নিশ্চল ভাবে সে খাড়া হইয়া থাকিবে, হউক ক্ষতি, হউক অসুবিধা: তাহাতে তাহার কি আসে যায়! সে সাহায্য করিতেও দিবে না, সাহায্য লইতেও দিবে না! তাহার বিধান এমনই কঠোর—এতই নৃশংস! তথাপি আজ প্রয়োজনের উৎকণ্ঠিত আর্ত্তনাদে, ব্যাকুল বিহ্বল হইয়া দুঃসাহসী মায়া এ কি অমার্জ্জনীয় চপলতা প্রকাশ করিয়াছে!—এ কি ভয়ঙ্কর মতিভ্রম তাহার!

গূঢ়-অভিমান বেদনাহত দৃষ্টি তুলিয়া, মায়া করুণ ভাবে মূর্চ্ছিত বালকের পানে চাহিল, হায় অভাগা! অতর্কিতে নিরঞ্জনের উপরও তাহার দৃষ্টি পড়িল,—দেখিল নিরঞ্জন নত বদনে বালকের ক্ষতস্থানে

জল সিঞ্চন করিতেছে, তাহার তরুণ-সুন্দর কান্তি-উজ্জ্বল মুখখানি বিষণ্ণ-বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে! চকিতে মায়ার সারাচিত্ত সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল,—না না, এই যুবকটি তখন আশ্চর্য্য দৃষ্টিতে মায়ার পানে চাহিয়াছিল বলিয়া ইহার উপর রাগ করা চলে না, ইনি নিশ্চয়ই মায়ার সেই আকস্মিক-উত্তেজনা সংঘটিত মূঢ় নির্লজ্জতায় স্তম্ভিত হইয়া অমন বিস্মিত ভাবে তাহার পানে চাহিয়াছিলেন,—ইহার দোষ কিছু নাই! দোষ যাহা কিছু তাহা—' কথাটা ভাবিতেই আবার দুঃসহ লজ্জায় মায়া এতটুকু হইয়া গেল,—একবার ভাবিল সকলের অগোচরে নিঃশব্দে এখান হইতে সরিয়া পড়ে, কিন্তু ঘড়াটা রহিয়াছে যে' দিদিমার জলের কি হইবে? তিনি যে দূরের ঐ দীঘীর জল ভিন্ন আর কোন জল খাইতে পারেন না;—অসহায় দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া ক্ষুণ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া মায়া নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উপায় নাই!

অল্পে অল্পে বালকের চৈতন্য সঞ্চার হইল, রৌদ্র তেজ ক্রমশঃ বাড়িতেছে বলিয়া কেবলরামের সঙ্গীদের মধ্যে একজন প্রস্তাব করিল. বালককে অতঃপর কোথাও উঠাইয়া লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করা হউক, পরামর্শ স্থির হইল কেবলের বন্ধু রস্তমজীর বৈঠকখানার বারেন্দায় ইহাকে আপাততঃ লইয়া গিয়া রাখা হউক,—এবং নিকটস্থ দরিদ্র পল্লীতে ইহার পিতাকে কেহ সংবাদ দিবার জন্য গমন করুক, তারপর যাহা কর্ত্তব্য হয় করা যাইবে।

মায়ার কাছে ঘড়াটা পৌঁছাইয়া দিয়া কেবল বলিল, "মায়া তোর ঘড়াটা নিয়ে যা—"

ঘড়ায় অনেকটা জল আছে দেখিয়া, মায়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "দাদা আর জল চাই কি?"

কেবল ততক্ষণে জামার আস্তিন গুটাইয়া বালককে তুলিবার উদ্যোগ করিতেছিল, মায়ার কথায় কান দিল না, আদিত্য একটু রসিকতার বুক্‌নী ছড়াইবার জন্য—সনাতনের পানে চাহিয়া ব্যঙ্গ-হাস্যে বলিল, "মা লক্ষ্মীর দয়া অপর্য্যাপ্ত! ঘড়া পেয়েছেন তবু জলের খোঁজ ছাড়েন নি!" আদিত্যের চাপা গলার আওয়াজ অপর কাহারও কানে না পৌঁছিলেও নিকটে উপবিষ্ট নিরঞ্জনের কানে পৌঁছিয়াছিল, সনাতন বক্র কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল, নিরঞ্জনের গম্ভীর বদনে রুষ্ট অপ্রসন্নতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে!—সনাতন জানিত, নিরঞ্জন সঙ্গীদের এরূপ যত্র-তত্র প্রযুক্ত অশিষ্ট অশোভন অনাবশ্যক পরিহাস মোটেই পছন্দ করে না!—সনাতন সঙ্কুচিত ভাবে চুপ করিয়া রহিল। কৌতুক-হাস্যে আদিত্যের রসিকতার প্রীতি-সম্বর্দ্ধনা করিতে তাহার সাহস হইল না।

একেই ত চারিদিকের বিস্ময় চকিত দৃষ্টির তীব্র আঘাতে মায়ার অন্তরাত্মা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর আদিত্যের এই অপূর্ব্ব অদ্ভুত সম্ভাষণ,—মায়াব কানে অত্যন্তই হৃদয়হীনতার স্বরে বাজিল, হায় সে কি কেবল ঘড়াটার জন্যই এত দুশ্চিন্তায় কাতর!

নিশ্বাস ফেলিয়া, শুভ্র সুন্দর ললাটের উপর হইতে কোঁকড়ান-কুচা-চুলগুলি টানিয়া পিছনে পিঠে এলায়িত কেশরাশির উপর সরাইয়া দিয়া,—মনোরম ললিত-বঙ্কিম-ভঙ্গীতে হেঁট হইয়া ঘড়াটা তুলিয়া লইতে গিয়া, ব্যথিত দৃষ্টিতে আবার একবার সেই সদ্যঃ চৈতন্যপ্রাপ্ত বালকের আর্ত্ত বেদনাতুর বদনের পানে চাহিল—একবার চকিত-গোপন দৃষ্টিতে

বালকের সেবারত তরুণ ভাস্করের একাগ্র মনোযোগ সযত্ন সেবার দৃশ্যটুকু দেখিল, মুগ্ধ প্রশংসায় তাহার দৃষ্টি ভরিয়া উঠিল,—আহা, কি শান্ত-সুন্দর স্বভাবের কর্ম্ম-কুশল বুদ্ধিমান লোক! সমানে হেঁট হইয়া নিঃশব্দে কাজ করিতেছেন, কাহারও পানে চাহেন নাই! আর এই বাকী লোকগুলা,—কি অসহনীয় ধৃষ্টতা ইহাদের, ধিক! ইহাদের চক্ষে সম্ভ্রম শিষ্টাচারের লেশমাত্র চিহ্ন বিদ্যমান নাই।

ঠিক সেই মুহূর্তে, কে জানে কিসের জন্য, নিরঞ্জন সহসা মুখ তুলিয়া চকিত দৃষ্টিতে মায়ার পানে চাহিল, মায়া দেখিল তাহার দৃষ্টি বড় করুণ বড় কৃতজ্ঞ—আর বড় বিনীত ক্ষমাপ্রার্থী।

যুগপৎ তীক্ষ্ণ-সঙ্কোচ কণ্টকাবৃত ভাবে উভয়েই দৃষ্টি নত করিল! একটা উত্তেজিত তড়িৎ-প্রবাহ উভয়ের চিত্তে অজ্ঞাত আঘাতে ঝঞ্ঝনা হানিয়া—চকিত বেগে বহিয়া গেল, শঙ্কাস্পন্দিত-হৃদয় মায়ার আর কোন দিকে ফিরিয়া চাহিতে সাহস হইল না,—ত্রস্ত হস্তে ঘড়াটা তুলিয়া লইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া কম্পিত চরণে মায়া ফিরিয়া চলিল।

কেবলরাম বালককে তুলিয়া লইয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে অনাবশ্যক জনতাকারী নিষ্কর্ম্মা লোকগুলিও নানাবিধ মন্তব্যে—এইরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনায় কোথায় কবে কাহার কি হইয়াছিল—তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিতে করিতে মহা উৎসাহে ঘটনার দ্বিতীয় প্রস্থ অভিনয় দেখিতে চলিল। ভিড় সরিয়া গেলে—ভাস্করদ্বয় ও শ্রমজীবিগণ পুনশ্চ আসিয়া নিজ নিজ কাজে লাগিল।

নিরঞ্জনের কাপড় খানা রক্তে ও জলে অত্যন্ত ভিজিয়া গিয়াছিল—সুতরাং সে আর তাহাদের সহিত যাইতে পারিল না, বস্ত্র পরিবর্ত্তনের

জন্য গৃহাভিমুখে ফিরিবার উদ্যোগ করিল, ফুলটি ও পাথরের টুকরাটি হাতে তুলিয়া লইল যন্ত্র কয়টা সহকর্মীদের ফিরাইয়া দিল—তাহার যন্ত্রপাতি ঘরে আছে!

নিজের অশিষ্ট রসিকতার জন্য আদিত্য নিরঞ্জনের নিকট কিছু তিরস্কার লাভের আশা করিতেছিল, কিন্তু নিরঞ্জন যখন কোন কথা না বলিয়া সটান গৃহাভিমুখে ফিরিতে উদ্যত হইল—তখন শঙ্কামুক্ত আদিত্যের পক্ষে চুপ করিয়া থাকা একবারেই অসম্ভব হইল! আদিত্য মন খুলিয়া ফুর্ত্তি জমাইতে বসিল, সনাতনের প্রতি বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়া ইঙ্গিত ব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "মানুষকে কাজে বাজিয়ে তবে চিন্‌তে হয়, কি বল সনাতন?"

নিরঞ্জন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "কি বলি, কেন?"

নিরঞ্জনের অকারণ-সংশয়াকুল দৃষ্টি দেখিয়া আদিত্য ভারি কৌতুক অনুভব করিল, কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুরুব্বি ধরণে কাশিয়া বলিল, "এই কোন লোকের কথায় বল্‌ছি।"

সনাতন বুঝিল এটা কেবল ভূয়া ধাপ্পাবাজী। বাস্তবিক নিরঞ্জনের সম্বন্ধে কোন কথা বলা আদিত্যের অভিপ্রায় নহে, কিন্তু নিরঞ্জনের দুর্ভাগ্য তাই সে আদিত্যের কথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, কৌশল চাতুর্য্যে সুপণ্ডিত আদিত্য খামকা উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া, মিছামিছি নিরঞ্জনকে ধোঁকা দিতে চায়!—সনাতন রগড়ের লোভ ছাড়িতে পারিল না, সোৎসাহে বলিল, "ওঃ সেই কথা বলছিস্ ত? হ্যাঁ ভাই যা বলেছিস্ কিন্তু!"

নিরঞ্জনের সন্দেহ হইল, তাহাকে অনর্থক ধাঁধায় ফেলিয়া ইহার

মজা দেখিতে চাহিতেছে বুঝি!—জোর করিয়া মনের উদ্বেগ ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে নিশ্চিন্ত ভাবে গন্তব্য পথে ফিরিবার উদ্যোগ করিল,—কিন্তু তবুও খটুকা গেল না, চলিতে চলিতে মুখ ফিরাইয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাদের প্রচ্ছন্ন-কৌতুক হাস্য রঞ্জিত চোখ টেপাটেপীর ধূমধাম দেখিয়া নিরঞ্জন আবার থমকিয়া দাঁড়াইল, বাস্তবিক ইহারা ত কিছু মনে করে নাই! আত্মদমন করিয়া মুখে একটু হাসি আনিয়া বলিল, "সত্যি কথা বল্‌বি না?"

পরম ঔদাস্যের সহিত আদিত্য উত্তর দিল, "তা তোমায় বলাটা আমরা যদি এখন আপত্তিজনক মনে করি!—" পর মুহূর্ত্তে-ই সনাতনের দিকে ফিরিয়া সাগ্রহে বলিল, "আর দ্যাখো ভাই, বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ভাইপো, কেবলরামটি—"

নিরঞ্জনের বক্ষের মধ্যে অলক্ষিতে একটা গোপন আশঙ্কা ভীরু অসহিষ্ণুতায় দুরু দুরু করিয়া উঠিল,—এই বুঝি ইহারা মায়ার নাম শুদ্ধ টানিয়া আনে!—স্তব্ধ-উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে নিরঞ্জন স্থির ভাবে আদিত্যের পানে চাহিয়া রহিল, আদিত্য তাচ্ছিল্য ভরে মুখ ফিরাইয়া যেন তাহাকে লক্ষ্য মাত্রও না করিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিল, "ঐ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ভাইপোটিকে হেন লোক নাই যে নিন্দে করে না, কালকেও সহকারী দেওয়ানজীমশাই কত কথা বল্‌লেন শুনলুম, কিন্তু আজ ঐ দবকারী-ব্যাপার ঘটবার সময়, ভাগ্যে ঐ নিষ্কর্ম্মা লক্ষ্মীছাড়াগুলো এসে মাথা দিলে, তাই রক্ষে—না হলে কি হোত বল দেখি! এ সময়ে কোন লক্ষ্মীমন্ত 'কেজো' লোকের চুলের টিকি দেখবার যো নেই, হুঁ কি মজা!"

সনাতন নিঃসংশয়ে বুঝিল যে আদিত্য এই কথাটাই তখন বলিতে উদ্যত হইয়াছিল,—মাঝখান হইতে কৌতূহল-উৎসুক নিরঞ্জনকে শুধু ধোঁকা দিয়া বোকা বানাইয়াছে মাত্র! কিন্তু তথাপি—সনাতনের বুদ্ধিটা আদিত্যের চেয়ে কিছু বেশী তীক্ষ্ণ ছিল,—আদিত্যের সেই পরিহাস রসিকতার যোগ্য পুরস্কার দানে নিরঞ্জন যে কেন আজ কার্পণ্য করিল, কেন অন্যমনস্ক ভাবে ফিরিয়া যাইতে যাইতে, আদিত্যের সামান্য কথায় এমন বিচলিত ভাবে পুনশ্চ ফিরিয়া দাঁড়াইল,—তাহার কারণ খুঁজিতে গিয়া সনাতন মনে মনে একটু সন্দেহে পড়িল,—অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের মুখ পানে চাহিয়া সনাতন বলিল, "কিন্তু যাই বল বাপু আদিত্য, তুমি একটি আস্ত শুভক্ষণে ছেলে, যে মেয়েটি জল দিতে এসেছিল, অনর্থক সে বেচারীকে কথার প্যাঁচে লজ্জায় আড়ষ্ট করে তুলেছিলে।"—সনাতন হা হা শব্দে হাসিয়া উঠিল।

আদিত্য শঙ্কিত চিত্তে ভাবিল,—নিরঞ্জন এইবার বুঝি বিস্মৃত ব্যাপারটাকে কড়া শাসনে ঝালাইয়া তুলে! কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নিরঞ্জন কিছুই বলিল না,—শুধু অন্যমনস্ক-নত দৃষ্টিতে চাহিয়া, জুতার ঠোক্করে পথের ইটপাটকেলগুলা আশে পাশে ছুড়িতে লাগিল, সনাতনের ব্যবহারে আদৌ মনোযোগ ছিল না।

আরাম পাইয়া আদিত্য বিদ্রূপের স্বরে বলিল—"বৃথা পরিশ্রম করছ ভাই, এ পথে এখন আর কোন সুকোমল রক্ত-কোকনদ আবির্ভূত হচ্ছে না, নিশ্চিন্ত থাক!"

অসহনীয় উষ্ণতায় রক্ত রাগ রঞ্জিত হইয়া নিরঞ্জনের চোখ মুখ

ঝাঁ ঝাঁ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! ভ্রূভঙ্গী করিয়া তীব্র স্বরে নিরঞ্জন বলিল—"উচ্ছন্ন গেছিস্!"

নিরঞ্জন আর দাঁড়াইল না, তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া হন্ হন্ করিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"দারিদ্র্য কি মহাপাপ, কেবল-দা?"—গৃহের দাওয়ায় বসিয়া, কবলরামের জামার ছিন্ন পকেট সেলাই করিতে করিতে বিষণ্ণ-করুণ কণ্ঠে মায়া বলিল, "দারিদ্র্যের কষ্ট বরং নিজে সহ্য করা যায়, কিন্তু পরকে সহ্য করতে দেখলে বড় অসহ্য বোধ হয়, না?"

দাওয়ার নীচে পৈঠার উপর উপবিষ্ট কেবলরাম ক্রোড়স্থ পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা 'মমতার' ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো দুই হাতে ধরিয়া ঝাঁকাচ্ছলে নাড়া দিতে দিতে বলিল, "বিষম—আর, গরীব অসহায় লোকগুলোর জন্যে নিজেদের কিছু করবার ক্ষমতা না থাকলে আরও বেশী কষ্ট হয়, না?"

ব্যথিত স্বরে মায়া বলিল, "তবু তোমরা কিছু না কিছু করছ কেবল-দা,—আমাদের আবার কিছুই যে করবার ক্ষমতা নেই—"

বাধা দিয়া কেবল বলিল, "কিছু আর করলি না কি-করে? এইত কাল সকাল থেকে গিয়ে এক প্রহর বেলা পর্য্যন্ত—"

সভয়ে কহিয়া মায়া বলিল, "চুপ কর কেবল-দা, চুপ কর, এখনি দিদিমা শুনলে রাগ করবেন, বৌদি ঠাট্টা করবে, আবার দাদার কানে যদি উঠে তিনি হয়ত বিরক্ত হবেন।"

"না, দাদার কানে উঠতে দেব না—" এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে কেবল বলিল—"বাস্তবিক মায়া, একে ছোট বাড়ী তাতে স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার ঘর, না আছে হাওয়া না আছে আলো—তার

উপর অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা !—ছি ছি, কি কষ্টে যে আমাদের ওখানে সময় কাটাতে হয়, তা কি বল্‌ব ! কাল ভাগ্যে গিয়ে ঘরখানা পরিষ্কার করে এসেছিলি মায়া, আমরা হাঁপ ছেড়ে বেঁচেচি ! নিরঞ্জন বল্লে, 'এর নষ্ট-কোষ্ঠি উদ্ধার করেছে কেবলবাবু !' কাল রাত্রে আমরা স্বস্থ হয়ে রোগীর সেবা করেছি ।"

সূচের গতির উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া মৃদু স্বরে মায়া বলিল, "কাল তোমরা কে কে ছিলে কেবল-দা ?"

"আমি আর নিরঞ্জন ভাস্কর ।"

আরক্তমুখে কাশিয়া, মায়া নতমুখে বলিল, "আর তাঁর সেই সঙ্গী দুটি ?"

"আরে ছুঃ, তারা আবার মানুষ !—নিরঞ্জনের দেখাদেখি দু'এক ঘণ্টার জন্যে আড্ডা দিতে যায় বটে, কিন্তু বিরক্ত করে মারে ।"

সোৎসুকে চাহিয়া মায়া বলিল, "কেন বল দেখি ?"

"কোন কাজের নয় ! খালি দোক্তা আর তামাকের শ্রাদ্ধ করবে, আর বক্ বক্ করে মাথামুণ্ড বক্‌বে—ভারি জ্বালায় !—কাজের লোক হচ্ছে বটে নিরঞ্জন ভাস্কর—বেশ ছেলে, নিজের ঐ রোগা শরীর, কিন্তু তা শোনে কে ? গোটা গোটা রাত জেগেই কাটিয়ে দিচ্ছে, কাল রাত্রে বল্লুম, 'আমি শেষ রাত্রে জাগি তুমি ঘুমোও নিরঞ্জন'—তা বল্লে, 'না কেবলবাবু, আপনাকে সকালে উঠে খাটতে হবে, আপনি শোন্, আমার বরং বিশ্রামের সুযোগ আছে, আমি এখন জেগে থাকি ।"

মায়া ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, সহসা মুখ তুলিয়া বলিল, "মঞ্জুর

সেবা শুশ্রূষা তোমরা কর্‌ছ, কিন্তু চিকিৎসার খরচ চল্‌ছে কেমন করে কেবল-দা ?"

"জ্যাঠামশাইয়ের কাছ থেকে কতক আদায় করেছি, বাকী সকলের কাছ থেকে চাঁদা করে চালাচ্ছি।"

"অধিকারী মহারাজের ছেলের কাছে কিছু পেলে ?"

"ইচ্ছে ছিল, মোটা খরচ আদায় কর্‌ব—কদিন চেষ্টায় ঘোরাঘুরিও করলুম, কিন্তু আমাদের মত লোকের সেখানে আমল পাওয়াই দুষ্কর, জ্যাঠামশাই তাঁর পণ্ডিত ছিলেন, ওঁর কথা এখনও কিছু কিছু মানে, ভাব্‌ছিলুম ওঁকে দিয়েই চেষ্টা করাব, কিন্তু নিরঞ্জন তা কর্‌তে দিলে না।"

"কেন ?"

নিরঞ্জন বল্‌লে, "ধনীর অবজ্ঞার প্রসাদ ভিক্ষায় আর হাত পেতে ঘুর্‌তে হবে না কেবলবাবু, তার চেয়ে আমাদের নিজস্ব ক্ষমতায়, দরিদ্রের জীবনসঙ্কটে যেটুকু সাহায্য কুলোয়, তাই করি আসুন।" নিরঞ্জন নিজে ঢের সাহায্য করেছে, শুধু অর্থে, সামর্থে, মৌখিক যত্নে নয়—আন্তরিক চেষ্টায় খাট্‌ছে, ওর সঙ্গী হতভাগা দুটো বোঝে না সোঝে না, খালি ঠাট্টা করে; মঞ্জুর জন্যে নিরঞ্জন যা' কর্‌ছে, বাস্তবিক কারুর নিজের বাপ ভাই তত কর্‌তে পারে না, ধর একে পর, তাতে অন্ত্যজ—"

কেবলের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া, বিষাদ-হাস্য-রঞ্জিত বদনে মায়া বলিল—"তাতে দরিদ্র !"

হাসিয়া কেবল বলিল, "নয় কেন ?—ঐটেই প্রধান কারণ ! স্বার্থ-সংশ্রবের ওজন যাচাই বুঝ্‌তে হয় ঐ নিরীখেই ত !"

"তোমরা খুব—"

"আমরা খুব নিঃস্বার্থ ভাবিস্ যদি মায়া, ভুল কর্‌বি তা' হ'লে. আমরা খাঁটি স্বার্থপর, নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে বসে আছি, তাই সময় কাটাবার হুজুগ খুঁজে বেড়াই, বুঝ্‌লি। এর মধ্যে পুণ্য ধর্ম্মের কিছু লোভ নাই আমি দিব্যি করে বল্‌ছি।"

সলজ্জ ভাবে হাসিয়া মায়া বলিল, "সেটা আমি খুব বিশ্বাস করি কেবল-দা. তোমায় দিব্যি কর্‌তে হবে না। আচ্ছা, জামার বোতামটা কোথায় হারালে বল দেখি?"

"ওদিকের পকেটে আছে, আহা মা-বোন না হ'লে যত্ন কর্‌তে কেউ জানে না রে দিদি! বোতামের কথা আমি বল্‌তে ভুলেই গেছলুম, ভাগ্যে তুই খুঁজে দেখ্‌লি।"

"এই পকেটে বল্‌ছ? এ কি, ভারি ঠেক্‌ছে, একখানা বই রয়েছে যে, দেখি—সংস্কৃত বই! কি—দাঁড়াও "অগস্ত্য-স্মৃতি।"

"অগস্ত্য-স্মৃতি! হাঁ হাঁ—আচ্ছা দিদি, দু'বছর ত সংস্কৃত পড়ালুম একটু অগস্ত্য-স্মৃতি পড়ে শোনাও দেখি।"

"কোনখানটা পড়্‌ব?" মায়া পুস্তকের পাতা উল্টাইতে লাগিল, ক্রোড় হইতে বালিকাকে নামাইয়া, অগ্রসর হইয়া কেবলরাম সাগ্রহে বলিল, "আচ্ছা তাই তাই, ঐ পেন্সিলের দাগ দেওয়া, ঐখানটাই পড়—"সত্যং তীর্থং—"

মায়া পড়িল :—

"সত্যং তীর্থং ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূত দয়াতীর্থং সর্ব্বত্রার্জ্জব মেবচ॥

দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষস্তীর্থ মুচ্যতে।
ব্রহ্মচর্য্যং পরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা॥
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং পুণ্যংতীর্থ মুদাহৃতং।
তীর্থানামপি তত্তীর্থং বিশুদ্ধির্মনসঃ পরা॥"

উচ্ছ্বসিত আনন্দে কেবলরাম বলিয়া উঠিল, "হয়েছে হয়েছে, বাঃ!"

প্রশংসা গৌরবে লজ্জারক্ত বদনে মায়া নতমুখে ঈষৎ হাসিল, বইখানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে অস্ফুট স্বরে বলিল, "এই রকম বই পড়্‌তে আমার ভারি ইচ্ছে করে।"

"পড়্‌লেই হোল—" উৎসাহের সহিত কেবলরাম বলিল, "আর একটু ভাল করে সংস্কৃত শেখ, তা হ'লে নিজেই সব বুঝতে পার্‌বি।"

"আচ্ছা এ বইখানা কার কেবল-দা?"

"নিরঞ্জন ভাস্করের।"

বিস্ময়োজ্জ্বল দৃষ্টি তুলিয়া মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "নিরঞ্জন ভাস্কর! আচ্ছা উনি বুঝি খুব সংস্কৃত জানেন?"

"পাথর কেটে যাকে অন্ন যোগাড় কর্‌তে হয়, খুব জান্‌বার সাবকাশ তার হবে কোত্থেকে দিদি—খুব জানে না বটে, তবে হাঁ, জান্‌বার ইচ্ছেটা খুব আছে। নিরঞ্জনের দাদা খুব পণ্ডিত লোক, এখন শুনেছি শাস্ত্র চর্চ্চাই বেশী করেন।"

"তিনিও ত ভাস্কর?"

"ওস্তাদ!—নিরঞ্জন টিরঞ্জনকে ত তিনিই হাতে ধরে শিখিয়েছেন। চিত্তরঞ্জন ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের জ্যাঠামশায়ের—শুধু জ্যাঠামশায় কেন—বিশু কাকারও খুব আলাপ ছিল।"

হাতের কাজ স্থগিত রাখিয়া, ব্যগ্র-বিস্ময়-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মায়. বলিল, "বাবার ?"

"হ্যাঁ রে, শান্তিদিদি বিধবা হওয়ার পর-ই জ্যাঠামশায় দেশ ত্যাগ করে কাশীবাসী হন ত, সেই সময় বিশুকাকাও জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্যে, মাঝে মাঝে কাশীতে আসতেন না ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি, দিদিমা সেদিন বলছিলেন বটে, আমি তখন খুব ছেলেমানুষ।"

"তা হবে, সে আজ তের চোদ্দ বছরের কথা হ'ল ত, আমি তখন সবে লেখাপড়া শিখছি। তারপর জ্যাঠামশাই কাশীতে বছর দুই তিন বাস কর্‌বার পরই—সুরাটের সুন্দর মঠের অধিকারী মহারাজ কাশী গিয়ে জ্যাঠামশাইকে ধরলেন, যে বোম্বাইয়ের মঙ্গল-মঠের অধিকারী মহারাজ আমার শিষ্য, তার ছেলেকে শেখাবার জন্যে আপনি চলুন জ্যাঠামশাই এলেন, দেবকীনন্দন ঠাকুর কিছুদিন পড়লেন, তারপরই সব চুকে গেল। হায়রে ; কাকস্য চঞ্চৌ যদি স্বর্ণযুক্তৌ—"

"এই নাও কেবল-দা, তোমার কোট সেলাই হয়ে গেছে।"

জামাটা লইয়া গায়ে পরিয়া, হাতের বইখানার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আপন মনেই বলিল, "নিরঞ্জন বেশ চমৎকার সংস্কৃত পড়ে, একে অল্প বয়স, তাতে কণ্ঠস্বরটি যেমন মিষ্টি, তেমনই করুণ কোমল—তেমনই মর্ম্মস্পর্শী, সতেজ সুন্দর ! সেদিন ভোর বেলায় ঘুমের ঘোরে শুয়ে শুয়ে শুনছি, শিবাষ্টক আবৃত্তি কর্‌ছে, আহা-হা, যেন স্বর্গ-সঙ্গীত ! ছোকরার দুই চোক জলে ভরে উঠেছে, গলার আওয়াজ ভাব-গদগদ হয়ে কাঁপছে—আঃ, আমি যে এমন পাষণ্ড, আমারও চোকে জল এসে পড়ল।"

মায়ার বিষাদ-ম্লান মুখমণ্ডলে, ধীরে ধীরে একটা বিস্ময় মুগ্ধতার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল, মায়া স্তব্ধ দৃষ্টিতে কেবলের মুখপানে চাহিয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল। কেবল উচ্ছ্বসিত আবেগে নিরঞ্জনের সুখ্যাতি করিতে করিতে, প্রসঙ্গক্রমে তাহার পরিচিত জনৈক প্রবীণ বিজ্ঞ সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যায়ী দেশবিখ্যাত পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করিয়া সপরিহাসে বলিল, "বাপ! তাঁর মুখে একবার সংস্কৃত শুনেছিলাম, মোহমুদ্গরের শ্লোক পড়ে বোঝাচ্ছিলেন, ওরে বাব্বা, সে মোহমুদ্গর কি 'গালে চড়' বোঝবারই যো নাই। আমি ত কিছুই উত্তর কর্‌তে পারলুম না, দেখ্‌লুম শুধু হাত নাড়া, মুখ নাড়া, আর বিজ্ঞতাভিমানের দম্ভগর্ব্বিত হাসি আর অবজ্ঞার কটাক্ষ! ফাঁপা রবারের 'বল' বাতাসেও ওড়ায়, লোকটার শিক্ষা সাধনা ছিল, তাই মুখস্থ শব্দগুলা গড় গড়্‌ করে আউড়ে গেল, কিন্তু কোথায় তার প্রাণ! সেদিন ভারি অস্বস্তি বোধ হ'য়েছিল, নমস্কার ঠুকে নিঃশব্দে চম্পট দিলুম, আর কখনো তাঁর দিক মাড়াইনি।"

ঈষৎ হাসিয়া মায়া বলিল, "তুমি খুব লোকের খুঁৎ ধর্‌তে পার।"

"সেই জন্যে কেউ আমায় বলে স্পষ্টবক্তা, কেউ বলে অপ্রিয়বাদী—"

"আর আমি তোমায় বলি, ঠোঁট কাটা—" হাসিতে হাসিতে প্রসন্ন বদনা শ্যাম-সুন্দরী বছর চব্বিশ বয়সের যুবতী—তারাদেবী আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেন। তারাদেবী হৃষীকেশের স্ত্রী, তাহার মুখখানি সর্ব্বদাই হাসিভরা, মনটি সরল আনন্দময়। বয়সে ছোট বলিয়া, এবং অন্যান্য নানা কারণে দেবর সম্পর্কীয় কেবলরামকে তিনি বড় স্নেহ করিতেন। হৃষীকেশও কেবলকে অনুজের মত দেখিতেন। প্রবাসে, দেশের

একটি অতি ক্ষুদ্র মানুষকেও মহত্তর—আপনার বলিয়া মনে হয়, সুতরাং প্রবাসে—এক গ্রামবাসী এই দূর-জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় উভয় পরিবারের মধ্যে যে প্রচুর অন্তরঙ্গতার যোগ স্থাপিত হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি ? সম্পর্ক-সৌহার্দ্দে কেবলের সহিত বৌদিদির কৌতুক পরিহাস প্রায়ই চলে।

কেবলরাম হৃষীকেশের স্ত্রীর কথা শুনিয়া, হাসিয়া বলিল—"আমার অপরিসীম সৌভাগ্য যে, মাত্র ঐটুকু সম্মানে আপ্যায়িত করে নিষ্কৃতি দিয়েছ।"

হৃষীকেশের স্ত্রী বলিলেন, "তুমি কি আরও বেশী খেলাতের আশা কর নাকি ?"

"বিলক্ষণ, এমন সব বৌদি যাদের ভাগ্যে জুটেছে, তাদের পক্ষে ওরকম সব খেলাৎ ও আনন্দ ত অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার !"

"শোন একবার কথা ! কিছু বলি না বলে বুঝি ?"

যোড়হাতে কেবল বলিল, "ক্ষমা কর বৌদি, আর কিছু বলতে হবে না, আমি সব বুঝে নিয়েছি, এমন কি তুমি যা বল্‌বার সঙ্কল্প মাত্রও কর নি, তা পর্য্যন্ত কল্পনায় এঁকে নিয়েছি।"

মায়া হাসিয়া ফেলিল, বৌদিদি কৃত্রিম কোপে বলিলেন, "উঃ কি ভয়ানক মনস্তত্ত্ববিদ্ গো।"

সবিনয়ে কেবল বলিল, "সত্যি বল্‌ছি বৌদি, তোমার মত এমন সৌজন্যশীল ভদ্রলোক আমি দুনিয়ায় আর দেখিনি, তোমার শিষ্টাচারের জন্য আমি চিরবাধিত—"

বাধা দিয়া বৌদিদি বলিলেন, "আহা কি চমৎকার স্তোত্র পাঠ চল্‌ছে—শুনে পরিতৃপ্ত হলুম, তারপর ?"

"আগামী নিমন্ত্রণ ভোজের তারিখটা পূর্ব্বাহ্নে জ্ঞাত থাকলে বিশেষ অনুগৃহীত হ'তাম।"

মায়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "শুনলে, এতক্ষণে কেবল-দার ভাভজায়া স্তোত্রের বীজমন্ত্র বেরুল।"

বৌদিদি সোৎসাহে বলিলেন, "বেরুক, ওতে আমি ভয় করিনে, কিন্তু এবার তোমাদের পালা আগে—হাতে পাঞ্জী মঙ্গলবার যে মশাই খবর রাখ ?"

শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া কেবল বলিল, "কি রকম ?"

"হঁ, এইবার বিদ্যের দৌড় বুঝব—নিজেদের পালা শুনে অমনি চক্ষু স্থির ! বল দেখি ব্যাপারটা কি ?"

"বিষম সন্দেহজনক ঠেকছে।"

মায়া সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িবার উপক্রম করিল, বৌদিদি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "পালাও কেন ? তোমার গুরুমশাইয়ের বুদ্ধির বহরটা দেখে যাও !"

মায়ার লজ্জাত্রস্ত পলায়নোদ্যোগে কেবলের দৃষ্টি পরিষ্কার হইয়া গেল, হর্ষোৎফুল্ল মুখে কেবল বলিল, "ওঃ, বুঝেছি বুঝেছি, মায়ার বে'র ঠিক হয়ে গেছে, নিশ্চয় !"

"এতক্ষণে নিশ্চয় ! হাতে হাতে ধরিয়ে দিলুম কি না। আগে ত নিজের ওপর দিয়ে খোঁজ স্বরু করেছিলে।"

ক্ষমা কর বৌদি, দেশ কাল পাত্র ভেদে ওরকম ভুল প্রায়ই হ'য়ে থাকে। তোমার মুখে কথাটা শুনেই বড় সাংঘাতিক বোধ হয়েছিল, সেই জন্যে সম্ভবকে ছেড়ে অসম্ভবের দিকে—"

বাধা দিয়া বৌদিদি বলিলেন, "অসম্ভবটা কিসে ?—আজকালকার ছেলেদের এক সখের ফ্যাশান হয়েছে—বিয়ে করব না ! আমার মামাত ভাইরা সব, আমরি মরি কি বাহার ! পায়ে খড়ম, পরণে থান, মাথার পেছনে টিকি, সাম্‌নে টেড়ি, চোখে চশমা, মুখে পান, ঠোঁটে সিগারেট্ বিলাস ভোগটুকু ষোলআনা আছে কিন্তু—"

"দাদার শালাদের কথা ছেড়ে দাও, বৌদি !"

"আহা, দাদার ভাইটি-ই বা কোন কম যান্ !"

"তা হোক্ অমন বাঁদরামির বথা ব্রহ্মচারী আমি নই।"

গমনরতা মায়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, বৌদিদির মুখ পানে চাহিয়া সলজ্জ-স্মিত হাস্যে বলিল, "বেশ অন্তরঙ্গ সুহৃদের কাছে ভাইদের কীর্তি সমালোচনা আরম্ভ করেছ বৌদি !"

বৌদিদি অপ্রস্তুত হইয়া কি-একটা কথা বলিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া কেবল ত্রস্তভাবে বাধা দিয়া বলিল, "না না বৌদি, বল, তুমি খুব বল, তুমি যে মুখ চিনে কারুর খাতির রেখে কথা কও না, ঐ জন্যে তোমায় আমি ভারি ভক্তি করি ! দাড়াও আমার পরীক্ষা-টা শেষ হোক্, নিজে আগে ব্যাকরণতীর্থ উপাধিটা পাই, তারপর, তোমায় আমি ঐ ন্যায়পরায়ণতার জন্যে ন্যায়রত্ন উপাধি দেব !"

এমন লোভনীয় সান্ত্বনায় বৌদিদি সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না, অপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা থাম, এখন বিয়েটা কবে করবে বল দেখি ?"

বিজ্ঞতার সহিত মাথা নাড়িয়া গম্ভীরভাবে কেবল বলিল "বিয়ে ? সেটা একদিন অবশ্যই করব, তার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই, তবে

আপাততঃ বোন্‌টিকে নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়া গেছে, এবং মহাশয়ার কাছে সেই সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য জান্‌বার জন্যই অত্যন্ত উৎসুক হয়েছি অতএব—"

রাগ করিয়া বৌদিদি বলিলেন, "তোমার 'অতএব' রাখ,—যা জিজ্ঞেসা করছি তার উত্তর যদি না দাও ত কিছু বলব না।"

মায়ার বিবাহ সম্বন্ধীয় সংবাদটা জানিবার জন্য কেবলের মনে বিলক্ষণ ব্যগ্রতা সঞ্চয় হইয়াছিল, সুতরাং অনাবশ্যক রহস্য পরিহাসে বৃথা কালক্ষেপ করিবার ইচ্ছা, তাহার ধৈর্য্যে কুলাইল না। গাম্ভীর্য্যের কপটতা ছাড়িয়া, সিঁড়ির উপর পুনশ্চ বসিল, সোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "বাস্তবিক বল না বৌদি, মন্মথ চাটুজ্যেদের কোন চিঠি পত্র এসেছে ?"

"এসেছে, তোমার দাদা তখন তাড়াতাড়ি আফিস বেরুচ্ছেন, তাই জ্যাঠামহাশয়ের কাছে যেতে পারলেন না, চিঠিখানি আমার কাছে রেখে গেছেন, দিদিমা পর্য্যন্ত এখনো জানেন না কিছু, কিন্তু মস্ত সু-সংবাদ !"

কেবল সাগ্রহে বলিল, "দেখি চিঠি।"

বৌদিদি বলিলেন, "দেখাচ্ছি, আগে কথার জবাব দাও।"

অধীর আগ্রহ এবং কঠিন প্রশ্নের মাঝখানে পড়িয়া বিপন্ন কেবল নিরুপায় বিনয়ে বলিল, "কেন ভোগাচ্ছ বৌদি।"

প্রফুল্ল হাস্যে সুন্দর-বদনে বৌদিদি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কিছু ভোগান' নয় দাদা, আমার একটি ছোট্ট যা' চাই।"

"তথাস্তু, কিন্তু দিন কতক সবুর কর, আগে ছাত্রজীবনের পালাটা

শেষ হোক, নিজে স্বাবলম্বী হই,—সংসারে দু' দশ জন অনাথ আতুরের উপকার করে, নিজের শক্তিসামর্থ টাকে, সংসারীর যোগ্যতায় সংগ্রহ অর্জন করে নিই,—তার পর যথা আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত হব।"

বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বৌদিদি বলিলেন, "ও বাবা এত কাণ্ডের পর!—তবেই তুমি বিয়ে করেছ!

"হতাশ হচ্ছ কেন?"

"আশাই বা কই? অত কাণ্ডকারখানার পর কি আর তুমি তোমাতে থাকবে?"

হো হো শব্দে উচ্চ হাস্য করিয়া কেবলরাম বলিল, "কোথায় যাব মনে কর? হা ভগবান! নিরঞ্জন ভাস্করকে লক্ষ ধন্যবাদ! ছোকরা ঠিকই বলে রে! অবিবাহিতদের শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ সুখের জীবন-টা বিবাহিতদের চক্ষুশূল! ওটাকে অভিশপ্ত করার জন্য তারা সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত!"

মায়ার সমস্ত শরীরের স্নায়ুতন্ত্রীতে একটা প্রশংসাবহ শ্রদ্ধার পুলকঝঙ্কার বাজিয়া উঠিল!—আগ্রহ দমন করিতে না পারিয়া, মৃদু কুণ্ঠিত বদনে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ নিরঞ্জন ভাস্কর কেবল-দা? তিনি?—তাঁর কি বিয়ে হয় নি?"

সজোরে মাথা নাড়িয়া কেবল বলিল, "না রে!"

মায়ার অন্তরের মধ্যে কৌতূহলের আলোড়ন ন্যায্য সীমার ঊর্দ্ধে উঠিল, পলায়নের চেষ্টা ভুলিয়া, বিস্মিত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মায়া মূঢ়ের মত প্রশ্ন করিল, "কেন?"

প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করিয়াই, মায়া নিজের মধ্যেই কেমন একটু কুণ্ঠিত

হইয়া পড়িল।—ঐ 'কেন'টুকু সুধাইবার কারণ কি?—শুধু কৌতুহল!—কিন্তু কৌতূহলের হেতু কি?—এইখানে সমস্ত তর্ক পর্যাস্ত হইয়া হয়ত মৃত্যুনির্ভীক ঔদ্ধত্যে, জোরের সহিত উত্তর দিবে 'খুশী!' কিন্তু বাস্তবিক সেই খুশীটাকে যথাযথ ভাবে বিশ্লেষণ করিলে, কি দেখিতে পাওয়া যাইবে?—শুধু যথেচ্ছাচারিতা নহে কি? মায়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কেবল মায়ার সেই গূঢ়-সংকোচ ক্ষুব্ধতা অনুধাবন করিতে পারিল না,—আপন মনেই সরল হাস্যমণ্ডিত বদনে সকৌতুকে উত্তর দিল, "ওর বরাতের জোরটা আমার মত নয়, বিয়ে না কল্লেই বয়ে যাব বলে, এমন জবরদস্ত শাসনের তাড়াহুড়ো দেবার মত মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বৌদিদি ও-বেচারীর ভাগ্যে জোটে নাই,—বুড়ী মা নিরীহ ভালমানুষ, দাদাটি সদাশিব, কাজেই নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের শিল্পতত্ত্বের সাধনায় পড়ে আছে, আর মনের আনন্দে পরের উপকার করছে।"

বৌদিদি বলিলেন, "ঐ রকম সব লক্ষ্মীছাড়া-বন্ধুদের সংসর্গে মিশেই তুমি আরো—"

তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কেবল বলিল, "উচ্ছন্ন তা' বলে যাব না বৌদি, যদি যাই কোথাও ত স্বর্গেই যাব!—এখন পাত্রপক্ষের চিঠিখানা দাও দেখি।"

মায়া আর সেখানে দাঁড়াইল না, গৃহাভ্যন্তরে গিয়া বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, নিজের একখানি জীর্ণ মলিন পাঠ্য পুস্তকের উপর দৃষ্টি বুলাইতে লাগিল। অতীতের একটা স্নিগ্ধ-মধুর দৃশ্য-স্মৃতি—অলক্ষিতে ধীরে ধীরে তাহার মনশ্চক্ষুর উপর আরামে আসন পাতিল, মায়া

স্তব্ধ-চিত্তে ভাবিতে লাগিল, সেই—সেদিনের কথা? যে দিন আকস্মিক-আহত, অসহায় দরিদ্র-বালক মঞ্জুর মাথা ক্রোড়ে লইয়া করুণ-বেদনা-কোমল মুখে নিরঞ্জনকে বালকের সযত্ন শুশ্রূষায় ব্যাপৃত দেখিয়াছিল!—সে কি চমৎকার কি স্বর্গীয় করুণা বিগলিত, শ্রদ্ধা-মহীয়ান্ শোভন দৃশ্য!—মায়ার সমস্ত চিত্ত-শক্তি সেদিনের সেই স্মৃতি-সৌন্দর্য্যের গৌরবালোকে মুগ্ধ-স্তম্ভিত হইয়া গেল! মায়া স্থির দৃষ্টিতে, হস্তস্থ পুস্তকখানার অক্ষর মালার দিকে চাহিয়া—নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কেবলরাম বাহিরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া বৌদিদির নিকট প্রাপ্ত পত্রখানি পড়িতে লাগিল, মাসখানেক হইল এলাহাবাদে একটি পাত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, পাত্রটি দরিদ্রের ছেলে, চাল-চুলা কিছুই নাই, কিন্তু আত্ম-শক্তি নির্ভরতায়, চেষ্টার জোরে বি-এল, পাশ করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতে ঢুকিয়াছেন, বৎসরখানেকের মধ্যেই নিজের বাসা খরচ জুটাইবার শক্তি লাভ করিয়াছেন, সুতরাং কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার আত্মীয় বন্ধুদল চারিদিক হইতে তাহার দিকে ঝুঁকিয়াছে,— সংবাদ পাইয়া হৃষীকেশও খোজ লইতেছিলেন। হৃষীকেশই বর্ত্তমানে মায়ার দিদিমার প্রধান অভিভাবক, এবং আশ্রয়দাতা। তিনি উচ্চ শিক্ষিত সহৃদয় ভদ্রলোক, স্থানীয় কোন একটা মার্চ্চেণ্ট অফিসে কিছু বেশী মাহিনায় কি একটা চাকুরী করেন। মায়ার পিতা যখন নিজেদের গ্রামের ইংরেজি স্কুলের মাষ্টার ছিলেন, তখন হৃষীকেশ, তাঁহার ছাত্র ছিল। মায়ার পিতার মৃত্যুর পর অনাথা বিধবা দিদিমা, বালিকা মায়ার খাওয়া পরা ও 'আইবুড়ো নাম খণ্ডনের ভাবনায় একান্ত উদ্বেগ-বিব্রত হইয়া গ্রামেই 'পাড়া ঘরে' যখন রাঁধুনী বৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন খবর পাইয়া হৃষীকেশ নিজে উপযাচক হইয়া নিঃস্ব বিধবার বিপদের ঝুঁকি ঘাড় পাতিয়া লইয়াছেন, স্বর্গগত শিক্ষকের স্নেহের স্মৃতি তিনি এতদূর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিয়াছিলেন, যে এত বড় দুঃসাহসের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। নিজের কর্ম্মস্থল হইতে পাত্র দেখা-

শোনার সুবিধা হইবে বলিয়া, কিছুদিন হইল মায়া ও দিদিমাকে তিনি এখানে আনাইয়াছেন। গ্রাম সম্পর্কে হৃষীকেশ মায়ার দাদা হন।

যে পাত্রটির কথা হইতেছিল, তিনি ইতিমধ্যে কার্য্যোপলক্ষে বোম্বাই আসেন—পরিচিত দুই একজন ভদ্রলোকের অনুরোধে পড়িয়া, বোম্বাই প্রবাসী কয়েকজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পরিবারস্থ অনূঢ়া কন্যা দেখ উপলক্ষে মায়াকে দেখিয়া যান, এবং তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধেও সবিশেষ তথ্য শুনিয়া,—মহানুভব যুবকটি একবাক্যে এইখানেই বিবাহে স্বীকৃত হন। তিনি দরিদ্র সন্তান, দরিদ্র কন্যাই তাঁহার যোগ্যা পাত্রী! আজ তাঁহার জনৈক বন্ধু লিখিয়াছেন যে, আর একমাস পরে ফাল্গুনের প্রথমে-ই তিনি বিবাহ করিতে সম্মত আছেন।

পাত্রটীর নাম মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়, আত্মীয় অভিভাবক বলিতে তাঁহার নিজের রক্ত-সম্পর্কীয় কেহ না থাকিলেও,—স্বভাব গুণে অনেক নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিও তাঁহার আপনার লোক হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারাই এ ব্যাপারে প্রধানতঃ উদ্যোগী হইয়া অভিভাবকের আসন গ্রহণ করিয়াছেন।

অসহায়া দরিদ্রা বিধবার অরক্ষণীয়া দৌহিত্রী বলিয়া—পাত্র মন্মথনাথ বিনা পণে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার বন্ধু বিবাহ সম্পর্কীয় অন্যান্য সমস্ত আবশ্যকীয় কথাবার্ত্তার পর লিখিতেছেন, "বিবাহের পর ফুলশয্যা বা তত্ত্ব প্রভৃতি লৌকিক আড়ম্বর বাবত আমরা কোন কিছু উপহার গ্রহণ করিতে পারিব না। মন্মথনাথ ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া পত্নী গ্রহণ করিতেছেন, সুতরাং নিরীখ-কসিয়া দাবী-দাওয়ার উপর পত্নীর অভিভাবকবৃন্দকে উৎপীড়ন দ্বারা অধর্ম্মাচরণে তিনি

একান্ত অসম্মত—এমন কি তিনি স্পষ্টাক্ষরে পূর্ব্বাহ্নে জানাইয়া রাখিতেছেন, সেরূপ দান স্বেচ্ছায় প্রদত্ত হইলেও, তাঁহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইবেন !”

পত্র পাঠ করিয়া কেবল প্রীতি-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দেখ্‌লে বৌদি, বাপ পিতামহের পয়সায় ধনী, মূর্খ অপদার্থের চেয়ে, পদার্থবান, সচ্চরিত্র, শিক্ষিত, উদ্যমশীল মানুষের মহত্ত্বের মূল্য কত বেশী !—তবু তোমরা খুঁত খুঁত করছ যে ছেলেটির আপনার জন কেউ নাই, আরে আপনার জন কেউ থাক্‌লে কি তোমরা এর নাগাল ধর্‌তে পেতে !—চালচুলো নেই বা থাকুল, স্বাবলম্বীর ভবিষ্যত আশা উজ্জ্বল ! আমি এক কলম লিখে দিচ্ছি, মায়া মন্মথর হাতে পড়ে নিশ্চয়ই সুখী হবে !”

শেষের কথাটায়, কেবল মাত্রাতিরিক্ত কণ্ঠের জোর চড়াইয়া দিয়াছিল, গৃহাভ্যন্তরে স্তব্ধ চিন্তারতা মায়া সে শব্দে অকস্মাৎ ত্রস্ত-চমকিত হইয়া উঠিল, উৎকর্ণ হইয়া মায়া বাহিরের দিকে কান পাতিল,—ওঃ ! কিছু নয়, তাহারই ভবিষ্যত সুখ-সৌভাগ্যের কল্পনা-কাহিনী গুঞ্জন মাত্র !—অন্য কাহারও কথা নহে !

অলক্ষিতে মায়ার ওষ্ঠপ্রান্তে একটু বিষাদের হাসি ফুটিয়া উঠিল ! পরক্ষণেই একটা নিষ্ঠুর গাম্ভীর্য্যে, তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিল ! হতভাগ্য, দীন, অধম সে,—সমস্ত পৃথিবীর নিকটে সে শুধু কৃতজ্ঞতা প্রণত শীর্ষে অপমানের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া, লাঞ্ছনার জীবন বহন করিবার জন্য জন্মিয়াছে ! মানুষের সহৃদয়তা, সমবেদনা, স্নেহ, অনুগ্রহ—তাহার অধম দীন জীবনকে—কি নির্ম্মম

কলঙ্কে গ্লানিময় করিয়া তুলিতেছে! ছিঃ বড় অসহ্য, বড় অপমান! কোন সুদূরের একজন সহৃদয় ভদ্রলোক, তিনিও দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে অনুগ্রহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন!—কিন্তু এমনই অসহায়, এত নিরুপায় সে, যে এই অনুগ্রহটুকুকে প্রত্যাখ্যান করিবার সাধ্যও তাহার নাই,—ইহা গ্রহণ করাই শুধু তাহার জীবনের একমাত্র সার্থকতা!

মায়ার দীর্ঘশ্বাস পড়িল, ছিঃ!

মনে পড়িয়া গেল, সেই দুই বৎসর পূর্ব্বের পল্লীবাসের কাহিনী, একটা তীব্র বিক্ষিপ্ত বেদনা, মায়ার মস্তিষ্কের মধ্যে রন্ রন্ ঝন্ ঝন্ করিয়া বাড়িয়া উঠিল! গ্রামে তাহার সমবয়স্কা সমস্ত বালিকার বিবাহ হইয়া যাইবার পর—তাহার অবস্থাটা কি ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল!

শত্রু-পক্ষের উপহাস, মিত্র-পক্ষের হা-হুতাশ, এবং নিরপেক্ষ নিষ্কর্ম্মা, মজলিশি আমোদপ্রিয় মহাত্মাগণের কৌতুক-রহস্য কি তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেই তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা নিষ্ঠুর আঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিল! নিজের সাকার মূর্ত্তিটা লইয়া কাহারও সম্মুখে দাঁড়াইতে ভয় হইত। গল্প, কুৎসা, পরচর্চ্চা সুপণ্ডিতা পল্লী-মহিলাগণ প্রত্যহ পুকুরের ঘাটে পরমোৎসবে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার জন্য কত শত চিন্তনীয় মন্তব্য উদগীরণ করিতেন! পাছে সে সব কানে যায় বলিয়া, মায়া পুকুরের ঘাটে যাইতে পারিত না। দুর্ভাবনা উৎক্ষিপ্তা দুর্ভাগিনী দিদিমার অপমান-লাঞ্ছনার সীমা ছিল না কিন্তু তথাপি মানুষের নিষ্ঠুরতা তাঁহাকে এতটুকুও ক্ষমা করিত না!—হায় সামাজিক বিধানের শৃঙ্খলাবদ্ধ বিধি

নিষেধ! তোমার মধ্যে এত নির্দ্দয় বিশৃঙ্খলতা! তুমি না মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, সজীবতা উৎকর্ষের হেতু!—কিন্তু তোমার দোষ বুঝি নাই। মানুষের বুদ্ধিমত্তা, হৃদয়বত্তাই বুঝি একমাত্র ধন্যবাদার্হ বস্তু! না হইলে কি মানুষ, বিধিনিষেধের অনুশাসনের দোহাই দিয়া, মানুষকেই জব্দ করিতে চায়? অন্ধ জেদের আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার ঠুলী চোখে আঁটিয়া, আত্মপ্রতারণার দ্বারা—ধর্ম্মের নামে নিরুপায় নিরীহকে উৎপীড়ন করে!

মায়ার আবার নিশ্বাস পড়িল। হৃষীকেশের অযাচিত করুণার কথা মনে পড়িল—দিদিমা বোম্বাইয়ে আসিয়া আপাততঃ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন, বাঁচুন,—কিন্তু মায়ার বুকের ভিতর যে রুদ্ধ গ্লানির নিশ্বাস জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে!—নিজের জন্য সব অসহ্য সহ্য করা যায়, কিন্তু দিদিমার এ হীনতা দুর্ভোগ কাহার জন্য!

জোর করিয়া মায়া চোখের জল সাম্‌লাইয়া লইল, না—নিজের জন্য কাঁদিয়া নিজের কাছে, নিজেকে সে লঘু করিতে পারিবে না!

মায়া জানালা দিয়া সম্মুখের সুদূর বিস্তৃত সমুদ্রতটের দিকে চাহিল, সমুদ্র সেখান হইতে দৃষ্টিগোচর হয় না—শুধু উচ্চ তটভূমি। অর্দ্ধ শৈত্য-কুয়াশায়, অর্দ্ধ ম্লান রৌদ্রে, অস্পষ্ট দৃশ্য ধূসর-শ্যাম-প্রাকৃতিক-শোভা,—মায়ার দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিরস, নিরানন্দ ঠেকিল! দূর হউক! প্রকৃতির বিমর্ষ ম্লানিমার এ নিস্পন্দ অসাড়তা সহ্য হয় না!

হে ভগবান, ইহা বিনাশ কর! ভীতি-কাতর জীবনের শঙ্কাহারী দৃপ্ত সুন্দর মৃত্যুর কঠোর অট্টহাস্যের মত—উগ্র উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে একবার চরাচর ভরিয়া দাও! বিশ্বের সমস্ত সুপ্ত-নিভৃত মর্ম্ম-শক্তি দীপ্ত

চেতনায় স্পন্দিত হইয়া উঠুক ; সে জীবনান্তের জ্বলন্ত জ্যোতিঃ হউক, কিন্তু জীবনের দুর্ব্বহ চিন্তাগ্লানি যে তাহার আনন্দালোকে অবলুপ্ত হইবে সেই সান্ত্বনা ! তাহাই প্রার্থনীয় ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাহিরে কেবলরাম বলিল, "এই যে দিদিমা এসে পড়েছ! এস, এস, তারপর—ওঃ শীতে কাঁপছ যে! নেয়ে, ভিজে কাপড়ে আসছ বুঝি?" ব্যস্ত হইয়া কেবল ডাকিল, "ওরে মায়া, দিদিমার কাপড় কোথা?"

"নিয়ে যাচ্ছি"—মায়া ঘরের আল্‌না হইতে আধ-ময়লা থান-ধুতিখানি হাতে লইয়া বাহিরে আসিল। শীর্ণা খর্ব্বাকৃতি বৃদ্ধা দিদিমা, কক্ষের জলকলস দাওয়ার এক প্রান্তে নামাইয়া রাখিয়া, ক্লান্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া সোজা হইয়া দাড়াইলেন। অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা জলে থাকায় তাঁহার হাত পায়ের অঙ্গুলিগুলা চুপসিয়া অসাড় আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, রক্তহীন পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডলে একটা ফ্যাকাশে বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল! মায়া বিষণ্ণ করুণ দৃষ্টিতে নীরবে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল, কিছু বলিল না। বৌদিদি ভৎসনাসূচক স্বরে বলিলেন, "এই সে দিন দিদিমা অসুখ থেকে উঠেছেন, আবার অত্যাচার করে অসুখে পড়বেন দেখছি। দিনকতক না হয়, ঠাকুর বাড়ীর কাজ নেই করতেন!—আপনার নাতি রাগ করছিলেন, যে দিদিমা আমাদের 'পর' মনে করেন, তাই কোন সাহায্য নিতে চান না, নইলে ওর সামান্য খরচটুকু কি—"

"ওকথা বোল না নাত-বৌ!—" শৈত্যাবেশ-কম্পিত ওষ্ঠে জোর করিয়া একটু অবজ্ঞার হাসি ফুটাইয়া—নিজের দেহের পানে চাহিয়া দিদিমা বলিলেন, "আমি ত' এখন ভাল আছি, না হলে কি কাজ করতে পারি! বামুনের বিধবা, শক্ত হাড়, আমাদের ধাতে সব সয়।"

"সইবে না কেন ? তাই সাত দিন বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে হয় নি ! দেখুন দেখি, হাত-পাগুলো শীতে যেন বেঁকে চুরে গেছে, এখনো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্‌ছে।"

অপ্রতিভ হইয়া দিদিমা বলিলেন, "নারে বাছা না, আমি একটু শীত-কাতুরে মানুষ কি না, তাই—না হ'লে এখানে আর কি শীত, দেশে থাকৃতে পাড়াগাঁয়ের সেই শীতে আমি—অঘ্রাণ পৌষের দিনে, ভোরের অন্ধকার থাকৃতে থাকৃতে, পুকুরে গিয়ে ডুব দিয়ে এসে রান্না চড়াতুম। ডুব দিয়ে ঠাণ্ডায় যেন দম আট্‌কে যেত, কিন্তু সেও ত' সহ্য হ'ত—আর এখানে এমন কি যে পোড়া দশা হয়েছে।"

নিজের শক্তি-দৈন্য অগ্রাহ্য করিয়া, তেজস্বিনী বৃদ্ধা আত্মসমর্থনের জন্য প্রচুর কৈফিয়তের অবতারণা করিতেছেন দেখিয়া, বৌদিদি প্রসঙ্গটা রহস্যের দিকে ঘুরাইয়া লইবার জন্য হাসিয়া বলিলেন, "তা বৈ কি দিদিমা, বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে আপনার শক্তি সামর্থ্যও ত' বাড়্‌ছে ! আমরা বোকা এই বুঝ্‌তে পারি না, নিজেদের শীত করে বলে, ভাবি—আপনারও বুঝি শীত করে ! তা যাক্, এখন কাপড়টা ছাড়্‌বেন ?"

পরিহিত বস্ত্রের নিম্নার্দ্ধ বহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিতেছিল দিদিমা পায়ের চতুষ্পার্শ্বের কাপড় গুটাইয়া বেশ করিয়া জলটা নিঙড়াইয়া ফেলিলেন। হাসি-হাসি মুখে বলিলেন, "না দিদি, আর একটু কাজ আছে, একবার ঠাকুর বাড়ী যেতে হবে, ভাণ্ডারী-জীর দেখা পেলুম না, না হলে একেবারে ল্যাটা মিটিয়ে আসতুম।"

কেবল তাড়াতাড়ি বলিল, "কি দরকার বল দেখি,—আমি এখনি ঠাকুরবাড়ী যাব।"

"তুমি গেলে ত হবে না দাদা,—ভাণ্ডার থেকে এক ঘড়া জল এনে ঠাকুর ঘরে পৌছে দিতে হবে, আমি নেয়ে এসেছি, ভিজে কাপড়েই এই বেলা যাই",—দিদিমা গমনোদ্যতা হইলেন।

কেবল বাধা দিয়া বলিল, "আহা না, না,—আমি যাকে হোক্ ধরে কাজটা সারব, তুমি কাপড় ছাড়।"

"সে কি হয়, নিজে পারব, তার জন্যে পরকে খাটাতে নেই! কে বিরক্ত হবে না হবে, দরকার কি? আর তা ছাড়া, যার কাছে পয়সা নিতে হবে, তার কাজে কি—"

"কিচ্ছু ভেবো না দিদিমা, সে ভার আমার।"

"আমি সেটুকু পছন্দ করিনে দাদা, এক মুহূর্ত্তের কাজ,—কেন অনর্থক—পরের খোসামোদ করা।"

"কারুর খোসামোদ নয়! আমি নিজে করব! ব্যস্ হয়েছে ত এবার নিশ্চিন্তি হয়ে কাপড় ছাড়।"

"না না সে কি হয় দাদা?"

"খুব হবে, দে ত মায়া কাপড়,—আচ্ছা দিদিমা একটা কথা কি রাখতে নেই?"

দিদিমার জেদ টলিল, মিনতির স্বরে বলিলেন, "তোমরা ত ঢের করছ দাদা, কেন অনর্থক আর—"

কেবল হাসিয়া বলিল, "তোমার অনর্থকই আমাদের কাছে সার্থক,—আগে কাপড় ছাড়, মস্ত খবর এসেছে, তোমায় শোনাব বলে চিঠি হাতে করে বসে আছি! মায়ার বে'র সব ঠিক হয়ে গেছে!"

অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বিস্ময়ের স্বরে দিদিমা বলিলেন, "কি ?"

"আগে কাপড়-টা ছাড় ছাই,—বল্‌ছি সব।"

দিদিমা সংশয়-পূর্ণ দৃষ্টিতে বৌদিদির পানে চাহিলেন। সৌভাগ্যের সংবাদ বিশ্বাস করিতে হঠাৎ ভয় হয়! বৌদিদি প্রসন্ন মুখে বলিলেন, "সত্যি দিদিমা।"

দিদিমা মায়ার হাত হইতে কাপড় লইয়া, সেইখানেই বস্ত্র পরিবর্তন করিলেন, মায়া ভিজা কাপড়খানা লইয়া শুখাইতে দিবার অছিলায় স্থানান্তরে চলিয়া গেল। বুকে হাঁটু দিয়া জড় সড় হইয়া বসিয়া দিদিমা বলিলেন, "পড়, শুনি।"

কেবল পত্রখানা আদ্যোপান্ত পড়িয়া শুনাইল। আশাতীত সু-সংবাদ!—দিদিমার চোখে জল আসিল, এত সুখ কি তাঁহার ভাগ্যে সহিবে! তাঁহার বড় দুঃখের, বড় কষ্টের মায়া, সত্যই কি এমন সোনার চাঁদ ছেলের হাতে পড়িবে? হায়, এত দিন ত, এমন কত সোনার চাঁদ শিক্ষিত পাত্রের দিকে দুরাশার দৃষ্টিতে চাহিয়া, কত কল্পনা জল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু অর্থহীনা বলিয়া সকলেই অবজ্ঞা করিয়া—উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছে; বিধবা পাচিকা-দৌহিত্রীর রূপগুণ, বংশমর্য্যাদার আবার মূল্য কি? সে যে দরিদ্র! কিন্তু আজ এই দারিদ্র্যের মূল্যেই তাহার বিকাইবার সুযোগ ঘটিল! দিদিমার বুকের ভিতর শত দিনের শত পাথর-চাপা দুঃখের উৎস উথলিয়া উঠিল, অতি কষ্টে আবেগ-দমন করিয়া, নীরবে তিনি চক্ষের জল মুছিলেন। কেবল বলিল, "যাও দিদিমা—আগে আহ্নিক করে, দুটি ফুটিয়ে খেয়ে নাও, দুপুর বেলা ওবাড়ীতে গিয়ে জ্যাঠামশাই আর শান্তি দিদির সঙ্গে

সব পরামর্শ ঠিক্‌ঠাক্ করতে হবে—শুন্‌ছ, ওঠো দিদিমা, এখন আর বসে থাক্‌বার সময় নয়, ওঠো।"

"উঠ্‌ছি দাদা।"

"না দিদিমা, ভাল হবে না বল্‌ছি, চোখের জল ত ঢের ফেলেছ, আর কেন? কায়মনে ভগবানকে যেমন ডেকেছিলে, তিনি তেমনি রত্ন মিলিয়েছেন। না না, ওকি কর্‌ছ দিদিমা, মেয়েটার যে মনে কষ্ট হয়, সে ত সব বুঝ্‌তে পারে! চোখের জল মোছ, আর বসে কাঁদ্‌বার দিন নেই।"

সাশ্রুনয়নে দিদিমা বলিলেন, "এত দিন কোথায় হবে, কি হবে, ভেবে হা-হুতোশ করে মরেছি, এখন একটা ঠিক্ ঠিকানার খবর শুনে বুকের ভেতর শুধু গুর্ গুর্ কচ্ছে, কেবলি মনে হচ্ছে কেবল-দাদা—মায়া সুখী হবে ত?"

শুষ্ক কণ্ঠ ঝাড়িয়া, জোরের সহিত কেবল বলিল, "হবে না ত কি? বিশু-কাকা চিরদিন মানুষের উপকার করে আশীর্ব্বাদ কুড়িয়েছেন, তাঁর পুণ্য ফল যাবে কোথা! এ যা হচ্ছে দিদিমা, জেনো শুধু তাঁরই কাজের ফলাফল! না হলে মন্মথ চাটুজ্যে, ওকে পাকড়াও কর্‌বার জন্যে মুখুজ্যে মশাই ত উঠে পড়ে লেগেছিলেন, সান্যেলমশাই ভাগ্নিটির জন্যে কত চেষ্টা কর্‌লেন, এত লোকের হাত এড়িয়ে, মন্মথ কিনা—এক টেরে এসে, আমাদের মায়াকে দেখে মত ফেরালে! আশ্চর্য্যি নয়! এ শুধু বিধাতার ভবিতব্য নয়ত কি?"

সান্ত্বনা ছন্দে কেবলরাম প্রাক্তনের ফল, ভগবানের করুণা, এবং সহৃদয় সদাশয় মন্মথনাথের বদান্যতা সম্বন্ধে অনেক কথা কহিয়া,

দিদিমাকে ঠাণ্ডা করিয়া—আহ্নিক সারিয়া লইবার জন্য পাঠাইল. বৌদিদি নিরামিষ রান্নার উনানে আগুণ দিবার জন্য ঝি-কে খুঁজিতে গেলেন। দিদিমা প্রত্যহ বেলা দ্বিপ্রহরের পর স্বহস্তে হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া লইতেন, সেই জন্য তাঁহার উনানে অনেক বেলায় আগুন পড়িত।

কেবলরাম উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে, মায়া ত্রস্ত-সতর্ক চরণে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল, "দাদা, শোন !"

কেবল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি রে ?"

"তুমি ঠাকুরবাড়ী যাচ্ছ ত ?"

"হ্যাঁ, কেন বল দেখি ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মায়া বলিল, "যদি তোমার বিশেষ কিছু কাজ না থাকে ত, একটু দাঁড়িয়ে যাবে ? তোমার সঙ্গে যাব।"

কেবল মায়ার কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না, বিস্মিত হইয়া বলিল, "কোথা ?"

"এই ঠাকুর বাড়ীতে ; দিদিমা তোমার তাড়ায় আহ্নিক করতে গেছেন, আহ্নিক করে এসেই হয়ত জলের ঘড়ার জন্যে ফের ছুটবেন ; রান্না চাপাতে বেলা হয়ে যাবে, তুমি যদি সঙ্গে গিয়ে একটু দাঁড়াও, তা হলে আমিই জলের ঘড়াটা ঠাকুরের পূজোর ঘরে রেখে আসি।"

কেবল দুই মুহূর্ত্ত নীরব রহিল, একটু হাসিয়া বলিল, "আমিই কাউকে দিয়ে রাখিয়ে দিলে, ভাল হোত না ?"

মায়া খুব সংক্ষেপে, অথচ খুব পরিষ্কার স্বরে শুধু বলিল, "দরকার কি ?"

দিদিমা ঠাকুরবাড়ীতে পূজার আয়োজন গুছাইয়া দেওয়ার কাজ লইয়াছিলেন। দিদিমার কাজের ভিড় পড়িলে, কি কোন দিন বিলম্ব হইলে, মায়া কেবলের সহিত ঠাকুর ঘরে গিয়া, ফুল সাজাইয়া, তুলসী গুছাইয়া, ধুইয়া, চন্দন মাখাইয়া, যথা বিধানে ধূপ ধুনার আয়োজন করিয়া, অন্যান্য খুচরা কাজে দিদিমার সাহায্য করিত। ঠাকুর ঘরের কাজে বেশ আনন্দ আছে, একটা দোষ শুধু, ঐ—দাড়ি গোঁফ সমাচ্ছন্ন নির্ব্বুদ্ধি-ভরা-বদন-কান্তিশালী দেবালয়-সেবকগণের, দুর্ব্বোধ্য বিস্ময়পূর্ণ লক্ষ্মীছাড়া চাহনি! ছিঃ, তাহাদের সেই নির্লজ্জ নির্ব্বুদ্ধিতায়, মায়ার সমস্ত অন্তর উষ্ণ অপমানে রাঙ্গা হইয়া উঠে যে! তাহাদের—মাত্র সেই মানুষগুলার চর্ম্মচক্ষের কঠোর কটাক্ষপাত ভয়েই, দেবতার মন্দিরে যাইতেও মায়ার আতঙ্ক বোধ না হইলে, সে কি দিদিমার কোন কষ্ট হইতে দেয়? আর তা ছাড়া, ঠাকুর বাড়ীর কাজে মায়ার যাওয়া কাহারও পছন্দসই নহে, এমন কি কেবল দাদাও সময় সময় স্পষ্ট আপত্তি জানাইয়া বলিত, "অনেক লোক আছে মায়া, এখন তুই থাক্।"

মায়ার কথায় একটু চিন্তিত হইয়া কেবল বলিল, "আচ্ছা চল, আমি সঙ্গে যাচ্ছি কিন্তু আজকে এই শেষ মায়া, আর ঠাকুরবাড়ী যাওয়া তোর হবে না।"

অন্য দিকে চাহিয়া, কি যেন ভাবিতে ভাবিতে মায়া প্রশ্ন করিল, "কেন বল দেখি?"

সস্নেহে কেবল উত্তর দিল, "বড় হচ্ছিস্ না? আর এইবার বিয়ে হ'য়ে গেলে কি কারুর সাম্‌নে বেরুনো—" পরক্ষণেই একটা ছোট

নিশ্বাসের সহিত নিজের ভুল সংশোধন করিয়া লইয়া, কেবল অস্ফুট স্বরে বলিল, "বড় মেয়ে, তারা হয়ত আর এখানে পাঠাবেই না।"

মায়া চুপ করিয়া রহিল। কেবল বলিল, "তুই স্নান করেছিস্ ত?"

"হ্যাঁ; তোমার সঙ্গে যাব বলে এইমাত্র কাপড় ছেড়ে এলুম, দেখ্‌ছ না, এটা দিদিমার মটকা কাপড়। আর দাঁড়িও না কেবল-দা, চল শীগ্রী।"

উভয়ে বাড়ী হইতে বাহির হইল। কেবল চলিতে চলিতে বলিল, "মায়া, তোর বিয়ে হয়ে গেলে, দিদিমাকে মঠের কাজ ছেড়ে দিতে হবে, কি বলিস্?"

মায়া চকিত দৃষ্টিতে কেবলের পানে চাহিল। কেবল উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিল, "আর কাজের দরকার? বুড়ো মানুষ ঢের কষ্ট সয়েছেন, শেষের ক'টা দিন যাতে সুস্থ নিশ্চিন্ত হয়ে কাশীবাস করতে পারেন, তার একটা ব্যবস্থা সবাই মিলে করব। জ্যাঠামশাই আছেন, ঋষি-দা আছে—আর দেখি আমিও যদি কিছু করে উঠ্‌তে পারিত ভালই; আহা দিদিমা-বেচারীর জন্যে আমার ভারি দুঃখ হয়, কি কষ্ট বল দেখি বুড়ো বয়সে!"

কেবল উচ্ছ্বসিত সহানুভূতির স্বরে দিদিমার জীবনের সুখ সম্মানের সহিত বর্ত্তমানের দারিদ্র্য-দুঃখ-হীনতার তুলনা করিয়া কতকগুলা কথা বলিল। মায়ার বিস্মৃতি-অবকাশ-মুক্ত চিন্তাশক্তি, আকস্মিক ঝাপ্টা খাইয়া আবার সেই পুরাতনের অবসাদ দিগ্ধ অন্ধকার গহ্বরে ছিট্‌কাইয়া আসিয়া পড়িল, মায়ার বুকের ভিতর শ্বাস-রোধ মত, একটা অতিষ্ঠ

ব্যাকুলতা তীব্রবেগে জাগিয়া উঠিল, ওঃ! কি দুর্ব্বিসহ ক্লেশ! সে নীরব রহিল।

তাহারা অতিথিশালায় প্রবেশ করিল, অতিথিশালায় তখন লোকজন কেহ ছিল না। কার্য্যব্যস্ততার অনুরোধে মাতব্বর সাধুগণ এদিকে ওদিকে রওনা হইয়াছিলেন, অপরাপর সবাই জোট পাকাইয়া, সিদ্ধি, গাঁজা লইয়া মাঠে ঘাটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া, নিশ্চিন্ত আরামে শাস্ত্র-তত্ত্বের রসোদগার করিতেছিলেন। দুই এক জন নিতান্ত অলস ব্যক্তি নিষ্কর্ম্মার মত গৃহে পড়িয়াছিলেন; অতিথিশালার প্রকাণ্ড প্রাঙ্গন ও চতুর্দ্দিকের বারান্দাগুলি এখন সম্পূর্ণ জনশূন্য।

এদিক ওদিক চাহিয়া কেবল বলিল, "একবার দাঁড়া মায়া, ভাণ্ডারী বুড়ো বোধ হয় বাইরের মহলে আছে, বেরিয়ে গিয়ে ওদিক থেকে আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসি। মন্দিরের উঠান থেকে আমি ডাকলে তবে তুই যাস্, ভোগ-বাড়ীর দুয়ার দিয়েই যাস্, দিদিমা এখান দিয়ে আনাগোনা করেন।"

কেবল অতিথিশালার দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া গেল। মায়া উঠানের পশ্চিম দিকে ভোগ-বাড়ীর দ্বারের অদূরে, পূজা-গৃহের পিছনে সরু গলিপথের আড়ালে গিয়া চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পথের দুই দিক বাঁকিয়া, ভোগ রন্ধনাগার ও অতিথিশালার দিকে গিয়াছিল, গৃহের পিছনের পথ বলিয়া সে অংশটা অপেক্ষাকৃত প্রচ্ছন্ন, সহজে কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই। মায়া স্বচ্ছন্দ নিশ্বাস ফেলিয়া, গৃহের দেয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইল। ক্লিষ্টচিত্তে দুর্ভাগ্যের দাহ-স্মৃতি বিশ্লেষণে অজ্ঞাতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। ব্যথিত নিশ্বাস

বুকের ভিতর আড়ষ্ট সংকোচে গোপনে গুমরিতে লাগিল, আহা, শুধু তাহার জন্য, দিদিমাকে জীবনে কি জঘন্য হীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে!

পাশে গৃহাভ্যন্তরে দুইজন লোক নিম্নস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, খোলা জানালার নীচে দণ্ডায়মানা মায়ার কানে, তাহাদের অস্ফুট-ধ্বনি আসিয়া পৌঁছিতেছিল, কিন্তু মায়ার সে দিকে লক্ষ্য ছিল না, হঠাৎ একজন লোক উগ্র-কর্কশ স্বরে উত্তেজিত ভাবে বলিল, "আমি কি করব? আপনার গাধা বন্ধুর বাঁদরামী—"

বাধা দিয়া শান্ত-কোমল কণ্ঠে, পরিষ্কার হিন্দীতে, দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর দিল, "শতবার দূষণীয়! কিন্তু আপনি ত একটা বুদ্ধিবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষ! দাঁড়ান, সামান্য ব্যাপারে ধৈর্য্যহীন হবেন না, আমি নিজের অন্যায্য অপমানে বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ নই,—কিন্তু কারুর ন্যায্য সম্মানে অতর্কিতে, এতটুকুই আঘাত করতেও আমি অন্তরে আহত হই! দয়ানন্দ ঠাকুর, একজন ভদ্রসন্তানের নামে নিরর্থক কুৎসা অপবাদ সৃষ্টি ক'রে আপনারা এতখানি ঘৃণিত পরিহাস-কৌতুকে আনন্দ অনুভব করেছেন, এমন ভাবে নিজেদের ভদ্রত্বের, মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা ভুলে গেছেন,—এইটুকুই শুধু পরিতাপ! মানুষের দুর্ব্বলতার গ্লানি আন্দোলন করতে,—উচ্চারণ করতে আমার বড় ঘৃণা বোধ হয়,—কিন্তু তবুও বলছি, ছিঃ! আত্মশ্লাঘার উপকরণ কি বিশ্বে কিছুই খুঁজে পান নি, নিরপরাধের ছিদ্র খুঁজে, অন্ধ হয়ে আকাশে বাড়ী ঘর তৈরী করেছেন! আপনাদের দোষ নাই দয়ানন্দঠাকুর, আমি জানি, চরিত্রহীন মূর্খের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতায় একটা উগ্র জেদ আছে, তারা নিজেদের মনের

মাপে, প্রবৃত্তির ছাঁচে পৃথিবীর আদ্যোপান্ত চেহারা ছেঁকে নেয়, তারা জানে এ ছাড়া কিছু হয় না, হতে পারে না।"

মায়ার চমক ভাঙ্গিল, চকিতে চিত্তের গুরুভার চিন্তারাশি,—ধাক্কা খাইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া,—অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। দুরন্ত আগ্রহে তাহার কিশোর-চিত্ত নিমেষে কৌতূহলে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল!—কে ইহারা দুইজন? দয়ানন্দঠাকুর? দয়ানন্দঠাকুর ত' মন্দিরের প্রধান পুরোহিত মাননীয় পণ্ডিত শ্যামসুন্দর ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সে ত মদ্যপ, দুশ্চরিত্র, মূর্খ, অপদার্থ! তাহার গুণগ্রাম সর্ব্বজন বিদিত, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি কে? জানালার সাম্‌নে আসিয়া, পায়ের ডগে ভর দিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া, মায়া উৎসুক দৃষ্টিতে গৃহাভ্যন্তরে চাহিল, ঐ ত দয়ানন্দ! পিছন ফিরিয়া বসিয়া ঘাড় হেঁট্ করিয়া অস্ফুট ক্রোধে গোঁজ গোঁজ করিতেছে—আর ঐ সামনে দ্বারদেশে, মৃদু-বঙ্কিম ভঙ্গীতে ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়াইয়া,—কে ঐ সমুন্নত-গ্রীব সুন্দর যুবা! কি প্রশান্ত সুন্দর উহার ললাট, কি সুকুমার কোমলতা উহার বদনে! দৃষ্টি-প্রান্তে এতটুকু মৃদু-ঘৃণা,—কিন্তু তাহাও কত ব্যথিত,—কি সকরুণ! মায়ার সমস্ত দৃষ্টিশক্তি আনন্দে মুগ্ধ হইয়া গেল, আ মরি মরি! কি মনোরম শোভা? মূর্ত্তিমান নীতি বুঝি ললিত মাধুর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া বেদনা-নম্র ভ্রূভঙ্গীতে, —উগ্র রূঢ় দুর্নীতিকে, ক্ষমার শাসনে, কঠিন ধিক্কারে লাঞ্ছিত করিতেছে! কি মর্ম্মস্পর্শী তেজস্বী ভৎর্সনা। কি স্পষ্ট সজীব করুণা! পরক্ষণে মায়া স্তম্ভিত হইল!—এ যুবক যে নিরঞ্জন ভাস্কর!

নিরঞ্জন অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক কথা বলিল। তাহার কণ্ঠস্বরে রূঢ়তা ছিল, কিন্তু তবুও তাহাতে কি স্নিগ্ধ মাধুর্য্য! সমস্ত সংস্কৃত

মিশানো হিন্দী কথায়,—অনেক কথার অর্থ বুঝা গেল না। মায়া শুনিল—শুধু শব্দের ঝঙ্কার, মর্ম্মে অনুভব করিল—শুধু ওজস্বী সত্যের প্রাণোন্মাদিনী আবেগের দৃপ্ত স্পর্শ !

কেমন করিয়া কিসের ঝড় বহিল, মায়ার মূঢ় চেতনা তাহা অনুধাবন করিতে পারিল না, কয় মুহূর্ত্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কাটিয়া গেল! সহসা দণ্ডায়মান ব্যক্তির কণ্ঠস্বর থামিল, উপবিষ্ট ব্যক্তি কুণ্ঠিত সন্ত্রস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। খড়ম পায়ে, পট্ট-বস্ত্র পরিহিত বৃদ্ধ পুরোহিত শ্যামসুন্দর পণ্ডিত, দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইয়া, ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে একবার পুত্রের পানে চাহিলেন, তারপর নিম্নস্বরে কি দুই একটি কথা নিরঞ্জনকে বলিলেন, নিরঞ্জন সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া, স্মিত বদনে সসৌজন্যে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

নিরঞ্জন চলিয়া যাইবার পর, কয় মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটিয়া গেল। হঠাৎ ক্ষিপ্ত-স্বরে পুরোহিত ডাকিলেন, "দয়ানন্দ!" সঙ্গে সঙ্গে পায়ের খড়ম খুলিয়া তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া সবেগে ছুড়িলেন। দয়ানন্দ ক্ষিপ্র সতর্কতায় দুই হাতে সেটা ধরিয়া ফেলিল, পিতা দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করিয়া, রুষ্ট পাদক্ষেপে স্থানত্যাগ করিলেন।

দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকার বিচিত্র অভিনয়!—মায়ার বুকের ভিতর কি যেন কিসের একটা অস্পষ্ট আবেগ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার—পিতাপুত্রের স্নেহ সম্পর্কের অন্তরালে—একি ঘৃণিত বেদনাবহ বৈষম্য! আর ইহারই অন্তরালে কি দৃপ্ত-মধুর—কি নম্র-ললিত ঐ সৌম্য-শোভন দৃশ্য!

দূর হইতে কেবলের ডাকাডাকি শুনিতে পাওয়া গেল, আত্মসম্বরণ

করিয়া মায়া তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইল। কেবলরাম প্রবীন বৃদ্ধ মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ ভাণ্ডারীজীকে ডাকিয়া আনিয়াছিল, মায়া তাঁহার সহিত ভাণ্ডার গৃহে গিয়া, যথানির্দ্দেশ মত গঙ্গাজল লইয়া আসিয়া পূজার গৃহে পৌছাইয়া দিল। ভাণ্ডারীজী মায়াকে 'ভগবতী' বলিয়া ডাকিতেন, দেখা হইলেই মাথায় হাত বুলাইয়া কুশল প্রশ্নাদি করিতেন, মায়া গঙ্গাজল রাখিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছেন,—ভাণ্ডারী আসিয়া সস্নেহে বলিলেন, "ভগবতি, তোমার দাদার সঙ্গে শ্যামসুন্দর ঠাকুর কথা কইচেন, তুমি একটি কাজ কর মা, একটু চন্দন ঘষে দাও, পূজার চন্দনটুকু নষ্ট হয়ে গেছে।"

মায়া দ্বিরুক্তি না করিয়া চন্দন-পীঁড়ির কাছে গিয়া বসিল। ভাণ্ডারী মহাশয় অদূরে উপবেশন করিয়া আপন মনেই বিরক্তিসহকারে বলিলেন, "অনর্থক চন্দনটা নষ্ট করা! পণ্ডিত ঠাকুরের দুরন্ত ক্রোধ,—ছিঃ একটা মিছে কথার জন্যে ছেলেটাকে খড়ম ছুড়ে মারা!"

মায়া মুখ তুলিয়া চাহিল, ভাণ্ডারী মহাশয় তাহার দৃষ্টির তাৎপর্য্য কিছু বুঝিলেন কি না কে জানে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ, প্রশ্ন পৃষ্টের মত উত্তর দিলেন, "এই শ্যামসুন্দর পণ্ডিতের কথা বলছি! আর, ছেলেটার স্বভাব মন্দ হয়েছে, তা করবে কি? উপায় ত নাই! বুঝছ না—দয়ানন্দের কথা বলছি।"

ঘরে কেহই ছিল না তথাপি মায়া চকিত দৃষ্টিতে ইতস্ততঃ চাহিয়া লঘুস্বরে বলিল, "বুঝেছি দয়ানন্দ ঠাকুর কার নামে কিছু বলেছেন বুঝি?"

বৃদ্ধ সুদীর্ঘ শ্মশ্রুরাজির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিয়া, মৃদু আক্ষেপ ছন্দে বলিলেন, "দুঃখের কথা আর বলিস্ কেন মা, তুচ্ছ কথা, সব কটাই

আহাম্মুখ কি না! দয়ানন্দ বোকা-বজ্জাত, বোঝে না কিছু, কিন্তু চাল্ মেরে বজ্জাতি করতে ছাড়ে না, মিথ্যে ঠাট্টাকে সত্যি ভেবে, তোমার দাদার নামে থামকা বদনামি ক'রে, যার তার কাছে কি সব মিছে কথা বলে বেড়িয়েছে, বেদান্ত বাগীশের কানেও উঠেছে!"

"আমার দাদার নামে! কেবল দাদা?" চন্দন-কাঠ মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, বিস্ময়-অবরুদ্ধ স্বরে মায়া বলিয়া উঠিল, "নিরঞ্জন ভাস্করের নামে নয়?"

ঘাড় নাড়িয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "হাঁ হাঁ, ও-ও আছে! সে অমায়িক ভদ্র ছোক্‌রা, তার নামে মিছামিছি—কি অন্যায় বলত! আহা হা।"

বৃদ্ধ দাঁতে জিভ কাটিয়া, মাথা নাড়িলেন! তারপর পণ্ডিত শ্যামসুন্দরের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া, তাঁহার আকাট মূর্খ পুত্রের জন্য দুঃখসূচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, ঘটনার মূল কারণটা ব্যক্ত করিলেন। মায়া শুনিল—গত পরশ্ব রাত্রে দাবা খেলিবার জন্য শ্যামসুন্দর কেবলরামকে খুঁজিতে গিয়া, নিরঞ্জন ভাস্করের এক পরিহাস-কুশল বন্ধুর নিকট অবগত হয় যে, কেবলরাম ও নিরঞ্জন কোন একটা বিশেষ রকমের "চুলা" নামক নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্ফূর্ত্তির জন্য গমন করিয়াছে! কলঙ্কিত-চেতা ব্যক্তি অপরের কলঙ্ক-ছিদ্র নিকাশনে সর্ব্বদাই উৎসুক; চরিত্রহীন মূর্খ দয়ানন্দ এই সামান্য ছিদ্রটুকু অবলম্বন করিয়া, এক বিরাট রহস্য গুজবের সৃষ্টি করিয়া বসে, এমন কি ইহা লইয়া, ব্যক্তি বিশেষের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ায়, সে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে রূঢ় অপমান করিতেও পশ্চাদ্‌পদ হয় নাই!—এদিকে গুপ্ত সন্ধানে অন্যান্য সকলে প্রমাণ

পাইয়াছে যে, কেবলরাম ও নিরঞ্জন, সেদিন একজন দরিদ্র রুগ্ন ব্যক্তির সেবা শুশ্রূষা ব্যপদেশে, সে সময় মঠের অদূরে দরিদ্র পল্লীতে ছিল! তাহারা এ সংবাদের বিন্দু-বিসর্গ জানে না।

অন্য সময়ে অপরের মুখে এ সমস্ত কথা শুনিলে, মায়া হয়ত ক্ষুব্ধ-লজ্জিত হইয়া ঘাড় হেঁট করিত, কিন্তু আজ সে নিস্তব্ধ থাকিতে পারিল না, অজ্ঞাত-উত্তেজনায় তাহার চিত্তাভ্যন্তরে বিপ্লব বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। আরক্তমুখে অসহিষ্ণু ভাবে মায়া বলিল, "দয়ানন্দ ঠাকুর নিজের মত সবাইকে মনে করেন বুঝি?"

কথাটা বলিতে বলিতে মায়ার সর্ব্বশরীরে উষ্ণ-সঙ্কোচের তাড়িৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল. মায়া নিজের মূঢ়তার উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া উঠিল, ছিঃ, কি দুঃসহ স্পর্দ্ধা-প্রকাশক অনধিকার চর্চ্চা! এ কি অসংযত-বর্ব্বরতা! এ কথা বলিবার সে কে?

ভাণ্ডারী মহাশয় পুনশ্চ সুদীর্ঘ ছন্দে তাঁহার বক্তব্য ফাঁদিলেন। 'দয়ানন্দের বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছুই নাই!' কিন্তু মায়ার আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের ক্ষমতা রহিল না। শীতের প্রভাতে, শীতল কক্ষতলে অবস্থান করিয়াও তাহার মুখমণ্ডলে ঘর্ম্ম-বিন্দু ফুটিয়া উঠিল, মায়া মুখ নীচু করিয়া গভীর মনোযোগের সহিত চন্দন ঘষিতে লাগিল। সরলহৃদয় ভাণ্ডারী মহাশয়, নিরুদ্বেগে তাঁহার বক্তৃতা স্পৃহা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। শ্রোতার যোগ্যতা সম্বন্ধে কেহ কোন দিন তাঁহাকে এতটুকু চিন্তিত হইতে দেখে নাই,—লোক একটা পাইলেই হইল, এবং বলিবার বিষয় একটা থাকিলেই হইল, তার পর আলোচনাপ্রিয় ভাণ্ডারী বৃদ্ধকে আর কিছু দেখিতে হইত না।

ঘস্ ঘস্ করিয়া মায়া অনেকখানি চন্দন ঘষিয়া, চন্দনের পাত্রে তুলিল। আহ্লাদিত ভাণ্ডারী মহাশয় কহিলেন, "খুব কাজ করেছ ভগবতী, এবার বাড়ী যাও। দিদিমাকে বোলো, পণ্ডিত ঠাকুরের খড়ম লেগে পূজার চন্দনটুকু নষ্ট হয়ে গেছল, তাই তোমায় আবার খাটিয়ে নিয়েছি।"

লজ্জিত হইয়া স্মিত বদনে মায়া বলিল, "এ আর খাটুনী কি ?"

"নয় কেন ? আবার ত চন্দন ঘষতে হোল ?" বলিতে বলিতে নির্লজ্জ-হাস্য-বিকশিত বদনে দয়ানন্দঠাকুর ঘরে ঢুকিলেন। স্তম্ভিত মায়া মুখ তুলিয়া চাহিল—লোকটা দেবতা না দানব ! কয়মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের ব্যাপারটা সে ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছে, এখনই সে অসঙ্কোচে অম্লান বদনে হাসিয়া কথা কহিতে আসিয়াছে ! কিন্তু না, নিদারুণ নীচাশয় ; সে অপমানের গ্লানি তাহার কলঙ্ক-কালিমাঙ্কিত-কঠোর-চিত্তকে এতটুকুও আঘাত দিয়া সচেতন করিতে পারে নাই, এখনও—ঐ যে তাহার দৃষ্টিতে নারকীয় লুব্ধ-খরতার তীব্র দীপ্তি ঝলসিত হইয়া উঠিতেছে !

মায়া ঘৃণাভরে বিরক্ত ভাবে মুখ ফিরাইল। হাতের চন্দনটুকু পাত্রে রাখিয়া পাত্রটি যথাস্থানে সরাইয়া রাখিতেছে,—দয়ানন্দঠাকুর অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতায় হঠাৎ চন্দন-পাত্র মায়ার হাত হইতে টানিয়া লইলেন। বুড়া ভাণ্ডারীজীকে লক্ষ্য করিয়া সকৌতুকে অসভ্যের মত হাসিয়া বলিলেন, "এ যে বিস্তর চন্দন হয়েছে ভাণ্ডারীজী ! তোমায় খানিকটা মাখিয়ে দিই এস।"

মায়ার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। পণ্ডিত-পুত্র পরিহাস পাণ্ডিত্য

দেখাইবার জন্যই, এমন ব্যগ্র ঔৎসুক্যে এখানে অধিষ্ঠান হইয়াছেন। ইহাঁর ধৃষ্টতা রঙ্গ ইহাকেই শোভনীয়, মায়ার তাহা দাঁড়াইয়া দেখিবার ধৈর্য্য নাই। চন্দন-লিপ্ত হাতটা ধুইবার জন্য অন্য জল খুঁজিতে যাইবার তর্ সহিল না, মায়া গঙ্গাজলের পাত্র হইতে একটু জল হাতে ঢালিয়া লইয়া, অন্য দ্বার দিয়া নিঃশব্দ লঘুপদে দ্রুত অন্তর্হিতা হইল। দয়ানন্দ বিপন্ন বিব্রত বৃদ্ধ ভাণ্ডারীকে ধরিয়া চন্দন মাখাইবার জন্য টানাটানি জুড়িয়া দিলেন।

বাহিরে আসিয়া মায়া দেখিল, কেবলরামের সহিত শ্যামসুন্দর পণ্ডিত নাটমন্দিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া তখনও কথা কহিতেছেন। কেবল হাসিতেছে, বৃদ্ধ শ্যামসুন্দরের মুখমণ্ডল কিন্তু বিমর্ষ গম্ভীর! মায়ার ইচ্ছা হইল একটু দাঁড়ায়, কিন্তু দয়ানন্দের আচরণ মনে পড়িতেই, সে সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ তাহার চিত্ত তীব্র বিমুখ হইয়া উঠিল। কেবলের জন্য সে অপেক্ষা করিতে পারিল না, যে পথে আসিয়াছিল, দ্রুতপদে সেই পথেই ফিরিয়া চলিল।

হাতের গঙ্গাজলটুকু হাতে লইয়াই বাহিরে আসিয়াছিল, প্রাঙ্গনে ফেলিবার স্থান ছিল না। অতিথিশালার দ্বার পার হইয়া, মায়া হস্তস্থ চন্দন-সুবাসিত গঙ্গাজল পথ-পার্শ্বে নিক্ষেপ করিল। মায়া দেখে নাই যে, এক ব্যক্তি নতশিরে সেখানে বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে কি করিতেছিল, মায়ার হস্ত-নিক্ষিপ্ত গঙ্গাজল তাহারই মস্তকে, গ্রীবায়, ললাটে বর্ষিত হইল। অকস্মাৎ শীতল-জল-কণা স্পর্শে সে ব্যক্তি চমকিয়া দৃষ্টি তুলিল, বিস্ময়-বিরক্ত স্বরে বলিল, "আঃ আদিত্য!"

মায়া থত-মত খাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। অজ্ঞান-কৃত-অপরাধে

মূঢ়-লজ্জা-কুন্ঠিতা মায়ার মুখ হইতে আপনাআপনি ক্ষুব্ধ বিনয়ের কৈফিয়ত নির্গত হইল, "আমি দেখ্‌তে পাই নি, কিন্তু এ শুধু গঙ্গাজল!"

"গঙ্গাজল!" প্রসন্ন-সৌজন্যের সহিত মাথা নোয়াইয়া সসম্ভ্রমে সে ব্যক্তি বলিল, "ক্ষমা করুন, আমি ভেবেছিলুম অন্য কেউ ঠাট্টা কর্‌ছে!" সে ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল।

সর্ব্বনাশ!—মায়া স্তম্ভিতা, নির্ব্বাক্‌! এ যে নিরঞ্জন!

নিরঞ্জন বসিবার চৌকিখানা পায়ে করিয়া ঠেলিয়া সরাইতে সরাইতে অপ্রতিভ ভাবে বলিল, "আমার বসাটাই অন্যায় হয়েছে, দুয়ারের আড়াল, আপনি কেমন করে দেখ্‌বেন।"

মায়ার বাক্যস্ফূর্ত্তির ক্ষমতা ছিল না, আড়ষ্ট নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার উগ্র অসহিষ্ণুতাপূর্ণ চিত্তের উপর, একটা বিপর্য্যয় আলোড়নের দ্বন্দ্ব বাধিয়া উঠিয়াছিল; সেই দয়ানন্দ! এই নিরঞ্জন! আকারে দুই জনেই মানুষ, কিন্তু প্রকারে—এই দুইটি মানুষের মধ্যে, কি পার্থক্য, কত ব্যবধান!

দয়ানন্দের প্রগল্‌ভ ব্যবহারটা মায়ার মনের উপর অপমানের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটাইয়া দিয়াছিল, সেই দাহ-যন্ত্রণার উপর নিরঞ্জনের এই নম্র-শিষ্টতা, প্রীতির প্রলেপের মত স্নিগ্ধ মাধুরিমাময় বোধ হইল। কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া রুদ্ধ-কম্পিত স্বরে মায়া বলিল, "কিছু মনে করবেন না।"

নিরঞ্জন হেঁট হইয়া হাতের কাগজ পেন্সিল চৌকির উপর রাখিয়া ধীর স্বরে বলিল, "মনে কর্‌বার মত কিছুই হয় নি, দোষ আমারই, এটা ছবি আঁক্‌তে বস্‌বার উপযুক্ত জায়গা—" ত্রস্তে কথাটা সামলাইয়া,

সংক্ষিপ্ত নমস্কারের সহিত মৃদুকণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল, "আপনি স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন।"

কম্পিত হস্তে নমস্কার ফিরাইয়া দিয়া, মায়া জড়িত স্বরে কি বলিল—নিরঞ্জন বুঝিতে পারিল না, স্বচ্ছ উজ্জ্বল নয়নের প্রশান্ত দৃষ্টি তুলিয়া নম্র-কোমল-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "কিছু বল্‌ছেন ?"

"না।" অতি-অস্পষ্ট-ভীত উত্তর মায়ার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল : মায়া আর দাঁড়াইল না, কম্পিত চরণে অগ্রসর হইল।

মোড়ের বাঁক ফিরিবার সময় চট্‌পট্‌ চটিজুতার শব্দের সহিত. দ্রুতপদে কেবলরাম আসিয়া মায়ার সম্মুখীন হইল। কেবল বলিল, "কি রে বাড়ী যাচ্ছিস্‌, যা, আমি তোর জন্যে আবার ফিরে এলুম, আর এগিয়ে দাঁড়াতে হবে ?"

শুষ্ক-কণ্ঠে মায়া উত্তর দিল, "দরকার নেই।"

নিরঞ্জন তখনও অতিথিশালার দ্বার পার্শ্বে চৌকির উপর ঝুঁকিয়া. হেঁট হইয়া কাগজ পেন্সিল নাড়া চাড়া করিতেছিল। কেবলের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল, সোৎসাহে অগ্রসর হইয়া কেবল উচ্চকণ্ঠে বলিল, "কি হে ভাস্কর ঠাকুর, হিতোপদেশ ওল্‌টাচ্ছ না কি ? লড়াই জিতে আজ লুঠ্‌লে কি ?"

"শুধু আপশোষ।" শান্ত-সৌন্দর্য্য-শোভন দৃষ্টি তুলিয়া ঈষৎ-ম্লান হাসি হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "আপনি সব শুনেছেন তা হ'লে ? এ দিকে আসুন।"

কেবল বলিল, "আমি তোমায় খুঁজতে যাব মনে করছিলুম, তুমি এখানে ! তারপর, বসে বসে কি কর্‌ছিলে, জপ ?"

"না তপ, চিত্তগ্লানির হাতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য।" সুকুমার শিশুর মত সরল-হাস্য-রঞ্জিত বদনে, কোমলকণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল, "দয়ানন্দ ঠাকুরের ছোট-ভাই রামকৃপাল, খেলার তীর ধনুক নিয়ে তীরন্দাজী খেলছে।" অঙ্গুলি নির্দ্দেশে সম্মুখে, শষ্পাবৃত সমতল ক্ষেত্রে, কৃত্রিম শরাসন হস্তে ক্রীড়া-পরায়ণ পঞ্চমবর্ষীয় শিশুকে দেখাইয়া, নিরঞ্জন সস্মিত বদনে বলিল, "কাব্যের কন্দর্প জীবন্ত মূর্ত্তিমান, ওর সুকোমল শরীরের বক্র-লীলা-ভঙ্গী আমায় চমৎকৃত করেছে, একটু চেয়ে দেখুন।"

কেবল হাসিয়া বলিল. "ও-সব সৌন্দর্য্য তত্ত্বের রসবোধ আমার দ্বারা হইবে না, আর এ কি! এই নিয়ে ছবি আঁক্‌তে বসেছ, খাসা নক্সা হয়েছে, বাঃ!—দেখি।"

সলজ্জভাবে কাগজখানা টানিয়া লইয়া নিরঞ্জন বলিল, "ওটা থাক্ এখন কেবলবাবু।"

মোড়ের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে দণ্ডায়মানা মায়ার, আত্ম-বিস্মৃত, স্তব্ধ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে, অজ্ঞাতে এক অভিনব মোহাবেশের বিহ্বলতা ঘোর ঘনাইয়া উঠিল। হীনতার কলুষ-লাঞ্ছিত পৃথিবীর বক্ষে, অকলঙ্ক মাধুর্য্যের প্রাণময়-সত্তা-গঠিত, এ কি ভাস্বর, নির্ম্মল, উন্নত সুন্দর তরুণ দেবমূর্ত্তি! মায়া মন্ত্র-মুগ্ধ, নিশ্চল।

ধীরে—আবার দয়ানন্দের কথা মনে পড়িল, আবার—আবার সকল কথাই স্মরণ হইল, একটা উদ্ভ্রান্ত আকুলতার বিদ্যুৎ-ঝলক, মায়ার মনের উপর ঝল্‌সিয়া গেল। বৈষম্য বৈচিত্র্যে বহুরূপিণী কুৎসিত পৃথিবী, —কে বলে তুমি শুধু জঘন্য গ্লানিময়? তোমার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য অফুরন্ত, তুমি অনন্ত-সুন্দর! অতি-অপরূপ, অভিনব-মনোহর, তোমায় প্রণাম!

একরাশি চিন্তার বোঝা মনের মধ্যে ভরিয়া লইয়া, ধীর-মন্থর পাদক্ষেপে মায়া বাটীর পথে চলিল। নিজের দুঃসহ দৈন্য-লাঞ্ছনা-পীড়িত জীবনের কষ্ট চিন্তা, মায়া এক নিমিষে ভুলিয়া গেল। তাহার সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন অবশ করিয়া, একটা অননুভূতপূর্ব্ব বিস্ময় উত্তেজনা প্রখর বেগে বহিতে লাগিল। সামান্য মানুষের অভ্যন্তরে এত সৌন্দর্য্য মহত্ত্ব নিহিত আছে! সে আজ এ কি দেখিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত, মানসিক একাগ্রতা গুণটি, নিরঞ্জনের তরুণ জীবনের সতেজ-অনুশীলনের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তি মাহাত্ম্যে, এমনই প্রবলরূপে তাহার প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল যে, নিরঞ্জন অনেক সময়, দেহ-মনের সম্পর্ক ছাড়াইয়া—অজ্ঞাত ভাবানন্দে মুগ্ধ-অভিভূত হইয়া পড়িত। নিরঞ্জনের অগ্রজ—প্রৌঢ় বয়স্ক চিত্তরঞ্জন দেবের স্বভাবে, এই গুণটি স্পষ্ট জাজ্জ্বল্যমান। তাঁহার আদর্শ প্রভাব নিরঞ্জনের স্বভাবে অনেকখানি বর্ত্তিয়াছিল, কিন্তু সাধারণ মনুষ্যেরা সে জন্য নিরঞ্জনকে ক্ষমা করিত না। চঞ্চল-চপল-ধর্ম্মী সমবয়স্কগণের নিকট 'অকাল পক্কতা' অজুহাতে নিরঞ্জনকে অনেক তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত।

ইতর-বৃত্তি দয়ানন্দ, মিছামিছি তাহার নামের সহিত কেবলের নাম জড়াইয়া, জঘন্য কুৎসা প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছে শুনিয়া, হঠাৎ নিরঞ্জনের একটু রাগ হইয়াছিল। কিন্তু রাগটা রীতিমত হইয়াছিল আদিত্যের উপর, কেননা সেই ত দয়ানন্দকে মিথ্যা বলিয়াছিল, সুতরাং দয়ানন্দের মূর্খতার জন্য দায়ী ত সেই? প্রাতঃকালে মন্দিরের কাজে হাত দিয়া, ব্যাপারটা কর্ণ গোচর হয়; আদিত্য তখনও দ্বিধাহীন চিত্তে হাসিয়া রঙ্গ করিতেছে দেখিয়া, নিদারুণ চটিয়া নিরঞ্জন একখানা পাথর তুলিয়া তাহার মাথাটা গুঁড়াইয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল, আদিত্য লাফাইয়া পড়িয়া পলাইয়া যায়। নিরঞ্জন

যন্ত্রপাতি ফেলিয়া রাখিয়া দয়ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ কর্ম্মস্থান ত্যাগ করিয়া আসে।

দয়ানন্দকে বুঝাইবার জন্য রাগের মাথায় নিরঞ্জন দুই একটা মিঠে কড়া উক্তিও ঝাড়িয়াছিল,—প্রতিক্রিয়ায় শেষে নিজের মনটাও বিক্ষিপ্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। শরীর ভাল নয় বলিয়া, দাদার উপদেশ ও বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নির্দ্দেশ মত, আপাততঃ কয়দিন অল্প অল্প সারিবার মত মন্দিরের কতকটা কাজ ঠিকা চুকাইয়া লইয়া ছিল, প্রত্যহ অল্প কিছু কাজ করিত,—আজ মনটা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, আদিত্যের উপরও যথেষ্ট বিরক্তি ক্ষোভ উদ্রিক্ত হইয়াছিল, নিরঞ্জন আর কাজ করিতে ফিরিয়া গেল না। দরিদ্র পল্লীর শিশুগণকে মিঠাই খাওয়াইবার জন্য বাহির হইবার সঙ্কল্প করিল।

কিন্তু অতর্কিতে তাহার মন অন্যত্র আকৃষ্ট হইল, সৌন্দর্য্যতত্ত্ব-উপাসক শিল্পী, ক্ষুদ্র শিশুর তীর ধনুক লইয়া খেলা দেখিয়া এমনই মনোরম স্বাচ্ছন্দ্য স্ফূর্ত্তির সহিত গভীর প্রীতি অনুভব করিল যে, তখনই সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিয়া, সেই সুন্দর দৃশ্যটুকুর মাধুর্য্য চিত্রপটে প্রতিফলিত করিবার চেষ্টায় বসিল। অদূরে বালকটি যেমন মনের আনন্দে খেলিতে ছিল, তেমনই খেলিতে লাগিল! শিল্প-কুশলী যুবা তন্ময় আনন্দে, শিশুর মতই উৎসুক আগ্রহে, খামখেয়ালী চিত্রাঙ্কণে আপনাকে মগ্ন করিয়া দিল।

তারপর হঠাৎ, অপরের হস্ত নিক্ষিপ্ত শীতল জলকণা স্পর্শে,—মুগ্ধ শিল্পীর চমক ভাঙ্গিল। আত্ম-অবস্থা পর্য্যবেক্ষণে বিচার-বুদ্ধি সচেতন হইতেই, নিজের আচরণে নিরঞ্জন নিজেই লজ্জিত হইল। দ্বাররক্ষকের

পরিত্যক্ত শূন্য চৌকিখানা টানিয়া লইয়া, পথের ধারে পয়ঃপ্রণালীর পাশে বসিয়া, নিশ্চিন্ত আরামে সে চিত্রাঙ্কণ করিতেছে!—কি নির্ব্বোধ সে, ছিঃ!

লজ্জার প্রথম ধাক্কা সামলাইতে না সামলাইতে, সম্মুখে আর একটি কিশোরী বালিকাকে অপ্রস্তুত কুণ্ঠিত দেখিয়া, নিরঞ্জন মনে আরও বিপন্নতা অনুভব করিল। মাথামুণ্ড কি কতকগুলা বিমূঢ়ের মত বকিয়া গেল, কিন্তু বস্তুতঃ সে তখনও প্রকৃতিস্থ হয় নাই। তারপর তাহার বাহ্যজ্ঞান যখন স্পষ্টোজ্জ্বল হইল, তখন কেবলরাম দেখা দিয়াছে,—বালিকা চলিয়া গিয়াছে।

তখনও নিরঞ্জনের চিত্ত মধ্যে সেই পুলকাবহ-উচ্ছ্বাস-স্রোত বহিতেছিল, কেবলের প্রশ্নের উত্তরে,—অতি সহজে সরলভাবে সে আপনাকে ধরা দিল। কিন্তু কেবলরাম তাহা হাসিয়া উড়াইল, সৌন্দর্য্য তত্ত্বের রসাস্বাদনে তাহার প্রকৃতি অনভ্যস্ত। অলক্ষিতে নিরঞ্জন আহত লজ্জিত হইল, আপনাকে অন্তরে সজোরে নাড়া দিয়া সজাগ সতর্ক করিয়া লইল, ছিঃ সত্যই বড় নির্ব্বোধ সে! অঙ্কিত অসমাপ্ত চিত্রখানা সরাইয়া লইয়া, কৌতুহলী কেবলের মনটা বিষয়ান্তরে প্রক্ষিপ্ত করিবার জন্য নিরঞ্জন অতিমাত্র ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "হাঁ, দয়ানন্দ ঠাকুরের কথা কি বলছিলেন কেবলবাবু?"

কেবল উত্তর দিল, "দয়ানন্দের কথা ত কিছুই বলিনি, তার বাপ শ্যামসুন্দর ঠাকুর আমায় এইমাত্র সব বল্লেন, তিনি ভারি দুঃখিত হয়েছেন। বল্লেন কুলাঙ্গার ছেলের জন্যে আমার মান সম্ভ্রম কিছু থাকবে না।"

নিরঞ্জনের মুখে ঔদাসীন্যের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, হঠাৎ ত্রস্তভাবে বলিল, "আপনি বাড়ী যাবেন এবার? অনেক বেলা হয়েছে।"

কেবল সে কথায় কান দিল না, বলিল, "তোমার 'মহাদেব' আদিত্য কোথায়? তার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌বার ইচ্ছে আছে যে,—আচ্ছা এখন থাক, বৈকালে এসে আড্ডা দেব। ভাল কথা, তোমার ছবিখানা দেখালে না নিরঞ্জন?"

"দেখবার মত কিছুই ওতে নাই কেবলবাবু।" সবিনয়ে নিরঞ্জন বলিল, "চিত্র বিদ্যায় আমার দখল নাই, ও বিদ্যা শিক্ষা সাধনার সুযোগ পাই নি।"

হাসিয়া কেবল বলিল, "সুযোগের অপেক্ষায় কাকে বাকী রেখেছ, এর মধ্যেও বেদান্তদর্শনকে আড়ে গেল্‌বার যো করেছ।"

"আঃ, কেন লজ্জা দেন কেবলবাবু?"

"ছবি-টা দেখাবে না?"

"মাপ করুন।"

"কোন হাতে আঁকছিলে? বাঁ হাতে বুঝি? দেখি না, কেমন হয়েছে।" সহসা চৌকির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, বিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চনপূর্ব্বক কেবল বলিল, "তুমি এইখানে বসেছিলে?"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল, "গ্রহের ফের! নির্ব্বুদ্ধিতার উপযুক্ত দণ্ড আজ পেয়েছি, ভারি অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম।"

"কি রকম?"

"একটি ভদ্র মহিলা এখান দিয়ে গেলেন, তাঁর হাতে গঙ্গাজল ছিল,

দেখতে পান নি, আমার মাথায় ফেলে দিয়েছেন, আমি আচম্‌কা ভয়ানক চম্‌কে উঠেছিলুম, হঠাৎ 'আদিত্য' বলে গালি দিতে উদ্যত হয়েছিলুম—জানি না তিনি কি মনে কর্‌লেন।"

"কে ভদ্র মহিলা বল দেখি?"

"এখনই এখান দিয়ে গেছেন, আপনি পথে দেখ্‌তে পান্‌নি?"

"আমি আসবার আগে-ই! ওঃ, সে ত' আমার ভগিনী মায়া! সে তোমার মাথায় গঙ্গাজল—"

"মায়া!" স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চাহিয়া নিরঞ্জন সজোরে বলিল, "তিনি! না, না, তিনি নন।"

তবে কে? মায়া-ই ত এখনি এখান দিয়ে গেল।"

বিস্ময়বিমূঢ় নিরঞ্জন রুদ্ধশ্বাসে বলিল, "তিনি গেলেন? তিনি!—না না, কেবলবাবু আপনার ভুল, তিনি ত' নন।"

"হ্যাঁ হে সেই গেল, আমার সঙ্গে মোড়ের মাথায় দেখা হোল, কথা কইলুম,—সেই ত মায়া।"

নিরঞ্জন স্তব্ধ নির্ব্বাক! কেবল হাসিয়া বলিল, "জীবন্ত মানুষটাকে সামনে দেখে ঠাওরাতে পার নি? মঞ্জুর মাথা-কাটার দিন সে এসে জল দিয়ে মহা মুস্কিলে পড়েছিল। সেই যে সেদিন শান্তি দিদি বল্লেন, নিজে সঙ্গে করে আবার দীঘি থেকে যাকে দিয়ে জল আনান,- আহা বুঝচ না, মঞ্জুর বাড়ী যে পরিষ্কার করে দিয়ে এসেছিল, সেই যার কথা সেদিন বলছিলুম তোমাকে, বিয়ে হয়নি, বাপ মা নেই, বুড়ী দিদিমা মহা বিপদে প'ড়ে, এখানে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।"

জড়িত স্বরে নিরঞ্জন বলিল, "বুঝেছি, মাপ করুন কেবলবাবু, আমি

তাকে চিন্‌তে পারি নি।" চৌকির সম্মুখে ঝুঁকিয়া, হঠাৎ ব্যস্তভাবে নিরঞ্জন বলিল, "আমার পেন্সিল-টা ?"

"তোমার হাতে একটা রয়েছে যে।"

"ওঃ ভুলে গেছলুম। নমস্কার কেবলবাবু, আমার কাজ পড়ে রয়েছে, এখন আসি।"

"এখন আবার কাজে যাবে ? আচ্ছা এস, বৈকালে আস্‌ব এখন।"

"আস্‌বেন"—নিরঞ্জন ফিরিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া হঠাৎ ব্যাকুল উদ্বেগপূর্ণ মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল, "কেবলবাবু—"

গমনশীল কেবল দাঁড়াইল, সোৎসুকে বলিল, "কি বল্‌ছ ?"

কুণ্ঠিতভাবে নিরঞ্জন বলিল, "আমি ভয়ানক গাধা, কিছু মনে কর্‌বেন না, বাড়ীতে কারো কাছে এ সকল কথার কিছু উল্লেখ কর্‌বেন না।"

দ্বিতীয় বাক্যের সাবকাশ না দিয়া, নিরঞ্জন দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। কেবল বিস্মিতভাবে ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আপন মনে ঈষৎ হাসিয়া ভাবিল, নিরঞ্জন কি ছেলেমানুষ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সমস্ত দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর, শ্রম-ক্লান্ত নিরঞ্জন কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়াই, শয়ন-পর্য্যঙ্কে এলাইয়া পড়িয়াছিল। ঘরের কোণে যন্ত্রের বাক্সর উপর, কর্ম্মস্থান প্রত্যাগত বস্ত্রগুলা অপরিস্কৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল, সেগুলা পরিষ্কার করিবার শ্রান্তিটুকুও আর সহে নাই, অথবা মনোযোগ হয় নাই। পরিশ্রমের ক্লান্তিতে যত না হোক, সহকর্ম্মীগণের চীৎকার ও গালগল্পের গোলমাল তাহার মনকে বেশী পীড়িত-ক্লান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, নির্দ্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই নিরঞ্জন চলিয়া আসিয়াছিল, সহযোগীদ্বয় তখনও ফিরে নাই। শয্যার উপর, পরস্পর বদ্ধ বাহুদ্বয় মস্তকের নীচে স্থাপন করিয়া, উত্তান ভাবে নিরঞ্জন শুইয়াছিল। পশ্চিমের খোলা জানালার ভিতর দিয়া অস্তগামী সূর্য্যের এক অঞ্জলি রশ্মি তাহার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া, একটা মৃদুল আরামের আবেশ-স্নিগ্ধতা জাগাইয়া তুলিতেছিল। কিন্তু তাহার দৃষ্টি লক্ষ্যহীন, মন চিন্তাকুল।

ঘরে সৌখীন আসবাবপত্র বিশেষ কিছুই ছিল না। যন্ত্রের বাক্স, পাথরের টুকরা, হরেক রকমের শিল্প-সম্বন্ধীয় চিত্র ও অন্যান্য খুচরা জিনিষ এক পাশে স্তূপাকার করা রহিয়াছে, অন্য পার্শ্বে একখানা জলচৌকির উপর রাশিকৃত বই। সবগুলাই বিশৃঙ্খল ন্যস্ত, দেখিলেই বুঝা যায় তাহার ভিতর হইতে যখন যেখানা খুশী, টানিয়া লইয়া দুই চারি পাতা উল্টান হইয়াছে। সংস্কৃত কাব্য পুরাণ, রাজস্থানী কবির

প্রাচীন-সঙ্গীত-সংগ্রহ, শিল্পকলা বিষয়ক পুস্তকই বেশী ছিল। শয্যার উপর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট হইতে আনীত দুইখানি সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িয়াছিল, সে দুইখানি শুদ্ধাদ্বৈত-মত-প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্য কৃত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য ও শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা। বই দুইখানা এখনও আদৌ পড়া হয় নাই। শয্যাপার্শ্বে জানালার উপর, নিরঞ্জনের সাধের কুমারসম্ভব কাব্য, অনাদৃত অবস্থায় মুক্ত বক্ষে বিরাজিত,—পড়িতে পড়িতে কখন অন্যমনস্ক হইয়া রাখিয়া দিয়াছিল, আর তুলিতে মনে নাই। দেয়ালে দড়ির আন্‌লায় পরিধেয় বস্ত্রাদি, এবং তাহার পাশে, আদিত্যের সখের এস্রাজটি টাঙ্গান রহিয়াছে। দুই দিন পূর্ব্বে নিরঞ্জন এস্রাজ কাড়িয়া আনিয়াছিল, আর ফেরত দেওয়ার কথা মনে পড়ে নাই: আদিত্য ও সনাতন পাশের ঘরে শয়ন করিত, তাহাদের হুঁকা, কলিকা, দোক্তা, তামাকের বৃহৎ হাঙ্গামা আছে, একে ত টিকা, গুল, ছাইভস্মে সব অপরিষ্কার হয়, তাহার উপর ধূমের গন্ধ, এবং হুঁকার অলস-আর্ত্তনাদ নিরঞ্জনের পক্ষে অত্যন্ত-ই বিরক্তিকর, সেই জন্য নিরঞ্জন একটু স্বতন্ত্র স্বস্তি, এবং নির্জ্জনতার শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিতে ভালবাসিত তা ছাড়া, আর একটু কথা ছিল,—সংসারতত্ত্ব অনভিজ্ঞ নিরঞ্জনের সাংসারিক তথ্যের দুজ্ঞেয় রহস্য অনুধাবন ব্যাপারে তিলার্দ্ধও ঔৎসুক্য ছিল না। বিবাহিত সহযোগীদ্বয়ের দাম্পত্য জীবনের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী গুঞ্জন, তাহার কানে উৎকট বিস্বাদের সুরে বাজিত। নিরঞ্জন পাশ কাটাইয়া চলিলেও, নির্দ্দয় আমোদপ্রিয় বন্ধুদ্বয়ের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইত না, কাজেই আত্মরক্ষার জন্য নিরঞ্জন একটু সমঝাইয়া চলিত। কিন্তু তবুও বন্ধুরা ক্ষান্ত

হইতেন না, সময়ে অসময়ে তাহার ঘরে আসিয়া আড্ডা জমাইতেন।

ঊর্দ্ধমুখে, স্তব্ধ ভাবে নিরঞ্জন পড়িয়া ভাবিতেছে। খানিকক্ষণ পরে বাহিরের সিঁড়িতে সজোর-বিন্যস্ত পদক্ষেপ ধ্বনির সহিত, আদিত্যের উচ্চ কণ্ঠের পুরাতন অভ্যস্ত সঙ্গীত শুনা গেল—

এস সখি, স্মৃতি-সঞ্চারে—
স্বপন আবেশে, এস হৃদি বাসে, মনোময় শোভা-সম্ভারে।

পরক্ষণে পাশের ঘরের দ্বার সশব্দে উদ্ঘাটিত হইল : চৌকি সরান, যন্ত্রের বাক্স খোলা,—'হুড়মুড়—ঝন্-ন্-ন্ ঝন্ ঝন্' শব্দে বাক্স মধ্যে যন্ত্র-পাতি ফেলা ইত্যাদি ধ্বনি উপর্য্যুপরি ধ্বনিত হইয়া, একটা দৃপ্ত-উৎপাতের আবির্ভাব চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত করিল। নিরঞ্জন বুঝিল সঙ্গীরা আসিয়াছে—সে কিন্তু যেমন শুইয়াছিল, তেমনি রহিল।

কয়মুহূর্ত্ত পরে নিরঞ্জনের অর্দ্ধমুক্ত গৃহদ্বার অনাবশ্যক শক্তি-সংঘাতে সজোরে পূর্ণমুক্ত করিয়া, আদিত্য ও সনাতন গৃহে ঢুকিল। নিরঞ্জনকে স্তব্ধ নির্ঝুম ভাবে শায়িত দেখিয়া আদিত্য বলিল, "কি ঠাকুর, ত্যক্ত-নির্ম্মোক অহির মত নির্জ্জীব ভাবে পড়ে কেন? গাম্ভীর্য্য সাধনা হচ্ছে?"

সনাতন হাসিয়া বলিল, "আদির উপমা প্রয়োগের বাহারে গেলুম, জলজ্যান্ত মানুষ-টা ত্যক্ত-নির্ম্মোক অহি হোল?"

আদিত্য সজোর ধাক্কায় সবেগে তক্তপোষটা কাঁপাইয়া, সশব্দে নিরঞ্জনের পাশে বসিল। সনাতন অন্য অংশ দখল করিল, নিরঞ্জনের

মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "শরীরটা ভারি ক্লান্ত বোধ হচ্ছে, না? হবেইত, সারাদিন সমানে খাট্‌ছিস্, বারণ কর্‌লুম, কাহিল মানুষ, কেন বাপু অত খাটা? দশদিনের জন্যে যেগুলো হাতে নিয়েছিলি সেগুলো দশদিনেই হোত, পাঁচদিনে তাকে শেষ করবার কি এত তাড়া ছিল?"

"যথেষ্ট!" মৃদু হাস্যের সহিত নিরঞ্জন উত্তর দিল, "ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে জেত্‌বার জিদ্ ধর্‌লে, 'কাল'কের মুখ চেয়ে বসে থাক্‌তে নেই, 'আজ'কেই যতটা সাধ্য এগিয়ে থাকতে হয়।"

"আরে রাখ।" অবজ্ঞার স্বরে আদিত্য বলিল, "ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই! পুরুষকার, শরীরের "ম্যাও" ধরুন! কেন জ্যাঠামী কর্‌িস্?"

নিরঞ্জন মনে একটু আহত হইল, কিন্তু তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া মুখে শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "ধরালে-ই 'ম্যাও' ধরেন? আমার ত মারাত্মক ব্যাধি কিছুই হয়নি, শারীরিক দুর্ব্বলতা মাত্র।"

আদিত্য ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আরে তাকেই সাম্‌লায় কে? তোর ঐ বেদান্তবাগীশ বুড়ো কি সাধ করে বলে—"

ত্রস্তে নিরঞ্জন উঠিয়া বসিল, অসহিষ্ণু ভাবে বাধা দিয়া, ভৎসনার স্বরে বলিল, "ভদ্রলোকের মত কথা কও আদিত্য, মাৎসর্য্যের দম্ভে পৃথিবীটাকে তুমি খুব তাচ্ছল্যের দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পার, কিন্তু পরের সম্বন্ধে কথাগুলো শিষ্টাচারের খাতিরে সংযত ভাবে বোলো?"

অপ্রতিভ হইয়া আদিত্য বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, না হয়, বেদান্তবাগীশ মহাশয়-ই বল্লুম, তাতে কি এসে-গেছে? কিন্তু উনিও ত—" হঠাৎ সে কথাটা ছাড়িয়া দিয়া সোৎসুকে আদিত্য বলিল, "আচ্ছা নিরু, একটা কথা বল্‌বি?"

"কি বল্‌ব ?"

"আচ্ছা প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কি বয়স্ক লোকের ওপর, তোর যথার্থ শ্রদ্ধা-সম্মান আছে ?"

নিরঞ্জন হাসিল, "এই কথা ! আপাততঃ এর উত্তর না দিলেও চলে।"

সাগ্রহে আদিত্য বলিল, "না না, দোহাই তোর, দিব্য রইল সত্যি কথা বল।"

কয় মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া নিরঞ্জন ধীর-গম্ভীর স্বরে বলিল, "সম্মানের কথা যদি বল ত অকপটে বল্‌ছি, পৃথিবীর কোন মানুষের ওপর আমার অগ্রাহ্যের ভাব নাই, আমি অতি বড় নগণ্য প্রাণীকেও মানুষ বলে খাতির করতে বাধ্য। তবে শ্রদ্ধা জিনিসটা কোন বাধ্যতামূলক আইনের বশবর্ত্তী নয়, ওটা মানুষের অন্তরের স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তি, ওর যথার্থ প্রতিষ্ঠা, শ্রদ্ধা-পাত্রের নিজস্ব বিশেষত্ব, মাহাত্ম্যের ওপর।"

"বহুৎ আচ্ছা !" উৎসাহভরে নিরঞ্জনের পিঠ চাপড়াইয়া আদিত্য বলিল, "দেখ্‌লি সনাতন, নিরু-দা আমাদের লৌকিকতা জানে ব্যক্তিগত গুণ-গৌরবের মর্য্যাদা, ওর কাছে অস্বীকৃত হবার যো নেই।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিরঞ্জন বলিল, "হঠাৎ এ-সব তত্ত্ব বিশ্লেষণের ঢেউ উঠল কেন ?"

সনাতন আদিত্যের মুখ পানে চাহিয়া মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল, আদিত্য গম্ভীর ভাবে ঘাড় চুল্‌কাইয়া বলিল, "সংসারে কতকগুলো কাজের ভিন্নার্থ-বোধক ভাব, রূপ, নাম, আছে, যথা,—সরলতার নাম বোকামি, সাহসের নাম গোঁয়ারতমি, তেজস্বিতার নাম মরণ-বাড়,

নম্রতার নাম ভীরুতা, সৌজন্যের নাম নীচতা-প্রকাশ ! আবার পক্ষান্তরে অহমিকার দম্ভ, আত্মশ্লাঘার গর্ব্ব অতি বুদ্ধির লক্ষণ বলে প্রতিপন্ন হয় !"

নিরঞ্জন বলিল, "তা ভূমিকা রাখ, ব্যাপারটা কি ?"

ঔদাস্যের সহিত আদিত্য বলিল, "অতি সূক্ষ্মবুদ্ধি পণ্ডিতের বক্র-বিজ্ঞতার চেয়ে, স্থূলবুদ্ধি মূর্খের সরল অভিজ্ঞতা ঢের ভাল।"

নিরঞ্জন বাধা দিয়া বলিল, "অর্থাৎ, সম্প্রতি নূতন কিছু কেলেঙ্কারী করে এসেছ।"

সমর্থন সূচক মস্তকান্দোলন সহ আদিত্য বলিল "অস্বীকার কচ্ছি নে, তবে এবার সেই হাবাতে-মূর্খ দয়ানন্দকে নিয়ে নয়, কিম্বা মঙ্গল-মঠ কাছারীর ধমকবাজ সহকারী দেওয়ানের চোখ-রাঙানীর জন্যে নয়; এবার—আমাদের এই অতিথিশালার ভক্তিভাজন সাধু সোমচাঁদ ভট্টকে নিয়ে, যৎকিঞ্চিত—"

সংক্ষেপে আদিত্য বলিল, কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিবার সময় আজ একটা মজা হইয়া গিয়াছে। মঞ্জুর নিকট হইতে সংগৃহিত সেই নূতন ফুলের নক্সা নিরঞ্জন ইতিমধ্যে মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে অতি সুন্দররূপে উৎকীর্ণ করিয়াছিল। অনেকেই তাহার প্রশংসা করিয়াছেন,—আজ মঠের পরিদর্শক কর্ম্মচারীর সহিত সোমচাঁদ ভট্ট নামক অতিথিশালার জনৈক সাধু সেই ফুলের নক্সা দেখিতে আসিয়াছিলেন। রচনার পারিপাট্যের চমৎকারিতায় তাঁহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াছেন, কিন্তু সোমচাঁদ ভট্ট ইহা নিরঞ্জনের মৌলিক রচনা বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। তিনি সনাতন ও আদিত্যের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া, প্রবল অবজ্ঞার সহিত বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন, এই অল্প বয়সে নিরঞ্জন এরূপ অদ্ভুতকর্ম্মা গুণী

লোক হইলে, বিশ্বকর্ম্মাকে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট ইস্তফা লিখিয়া অবসর গ্রহণ করিতে হইবে।

আদিত্যের কথা শেষ হইলে নিরঞ্জন মৃদু-হাস্য-রঞ্জিত বদনে, অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি কি এতই অপদার্থ ?"

আদিত্য সজোরে বলিল, "নিশ্চয় ! গাছের ডালে খঞ্জন পাখির নাচ দেখে নক্সা আঁকতে ব'সে, পাহাড়ের গুহায় উপবাস করে শীতের রাত্রি কাটাতে পার, তাতে কি আসে যায় ! চেহারাটা খুব বিশাল-বিপুল গোছের স্যাণ্ডেল না হলে কি কেউ খাতির করে। মনে আছে, উৎকলের ওস্তাদ-জীর কথা ? তিনি ঠিক-ই বলেছিলেন।"

আদিত্যের পানে চাহিয়া সনাতন বলিল, "আদিত্য, সে কথাটি বল্‌ব ?

উদ্‌গ্রীব হইয়া নিরঞ্জন বলিল, "কি কথা রে ?

মুহূর্ত্তে আদিত্য ও সনাতনের মধ্যে তুমুল ঝটাপটি বাধিয়া গেল, আদিত্য বলিতে দিবে না, সনাতন বলিবে। অবশেষে সনাতন জিতিল, পরাভূত আদিত্য সনাতনের মাথায় চাটি মারিয়া 'গোরিয়া' আওয়াজে বলিল, "বলো না, নিরঞ্জনের ইতরভদ্র বিচার নেই, আছে শুধু চক্ষুলজ্জা : চক্ষুলজ্জার দায়ে বন্ধু আমার, মাথাটা আড়াই সের ওজনের পাথর ছুঁড়ে গুঁড়িয়ে দেবার জন্য রুখে উঠতে জানেন, সত্যিমিথ্যের খোঁজ রাখেন না !"

আদিত্যকে থামাইয়া নিরঞ্জন বলিল, "হয়েছে কি ?"

সনাতন আদিত্যের মুখ পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "সোমচাঁদের কথা শুনে, উনি উত্তর দিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি একে

সমজদার তায় প্রবীণ বিজ্ঞ! বয়সের মাপে ধর্ম্মশাস্ত্রের আইন মুখস্ত করে, পরিব্রাজক হয়েছেন, আপনি স্থাপত্য-শিল্পের 'কলা' জান্‌বেন বৈকি! আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী, ফল ফুলের খবর রাখি মাত্র।' "

অসহিষ্ণু হইয়া নিরঞ্জন বলিল, "তোর জ্বালায় কি করি আদি?"

উদাসভাবে আদিত্য উত্তর দিল, "কিছুই না, নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় পড়ে ঘুমোও।"

"তুই হলি কি?"

"আগে ছিলাম ঘণ্টা-নাড়া বামুন, এখন হয়েছি পাথর-কাটা ভাস্কর।"

"না না বখামিতে?"

"যথা পূর্ব্বং তথা পরং, তবে বাঙালীর বিরহ-বিকার, বিশ্ববিশ্রুত বিকট ব্যাপার, ওটার জন্যে আশ্চর্য্য হস্‌নে ভাই।"

নিরঞ্জন হাসিয়া ফেলিল। আদিত্য গম্ভীরভাবে বলিল, "ছেলে মানুষ, শিখেছ শুধু বসে বসে নক্সা আঁক্‌তে, এ সব নিগূঢ় তত্ত্বের দুরূহ মর্ম্ম কি বুঝ্‌বে? আমাদের অবস্থা না কি ভয়ানক, সে শুধু জানি আমরা, আর জানেন ভগবান। আমরা বাঙালী—"

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া ব্যঙ্গস্বরে সনাতন বলিল, "আমরা বাইশ বছর বয়েসে অবিবাহিত থাক্‌লে, বিরহ যন্ত্রণায় সাড়ে সতেরবার আত্মহত্যা করি, আঠারবার সন্ন্যাসী সাজি, উনিশবার ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় বাধাই, কুড়িবার অভিভাবকদের জাহান্নামে পাঠাই।"

আদিত্য থপ্ করিয়া বলিল, "তা বলে সত্য সত্য পাথর ছুঁড়ে কারুর মাথা ফাটাই না!"

অপ্রস্তুত-হাস্যে নিরঞ্জন বলিল, "এখনো সে কথা ভুলে যাস্‌নি? না আদিত্য, দাদা ভিন্ন কেউ তোকে সামলে রাখ্‌তে পারে না, তাঁর কাছে ভিজে বেড়াল! কোন ভিরকুটি নাই, তোর যত নষ্টামী আমাদের কাছে। ছিঃ, পঁচিশ পেরিয়েছিস্‌ কি না সন্দেহ,—এরই মধ্যে পঞ্চাশ বছরের বুড়োকে খাতির নদারদ্‌—"

আদিত্য নরম হইয়া বলিল, "তার সে লম্বা চাল দেখে—"

নিরঞ্জন বাধা দিয়া বলিল, "চওড়া ডালের বন্দবস্ত করাটা মোটেই বাহাদুরী কাজ হয়নি।"

আদিত্য বলিল, "কিন্তু ন্যায় সঙ্গত।"

সনাতন মাঝে পড়িয়া বলিল, "শিল্পীর সত্যের চেয়ে সমালোচকের কল্পনার দৌড়, জোর কদমে ছুটলে সেটা অসহ্য মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া নিরঞ্জন বলিল, "সে মৃত্যু গৌরবের! জানিস্‌ সোমচাদ ভট্ট এক সময় ভাস্কর ছিলেন!"

ব্যঙ্গস্বরে আদিত্য বলিল, "অতীতে—বর্ত্তমানে কিন্তু গোপীভাবের সাধনা কচ্ছেন।"

অকস্মাৎ নিরঞ্জনের ললাটে, উষ্ণ-চিন্তার তীব্র আকুঞ্চন রেখা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। মনের কোন একটা গোপন-লজ্জা-পীড়ন ক্লান্ত নিভৃত অংশে, আদিত্যের কথায় হঠাৎ যেন চাতুড়ীর ঘা বাজিল। মুহূর্ত্তকাল অর্থহীন দৃষ্টিতে স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল, তারপর সজোরে আত্মদমন করিয়া ধীর স্বরে ডাকিল, "আদিত্য।"

আদিত্য একটু কুণ্ঠিত হইল। সাম্প্রদায়িক দোষ ত্রুটির উল্লেখ

কুৎসা শ্লেষাত্মক ইঙ্গিত দেখিলে, নিরঞ্জন জলিয়া যাইত,—কিন্তু আদিত্য অভ্যাস দোষে প্রায়শঃ সেই সকল বিষয়ে ব্যঙ্গবর্ষী রসনা সঞ্চালন করিত। অবশ্য কোন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের উপর তাহার আন্তরিক বিদ্বেষ তেমন কিছু ছিল না, কিন্তু কৌতুক প্রিয়তার অনুরোধে, অনর্থক সে যাহাকে যখন খুশী হইত, ধরিয়া টান দিত। সম্প্রতি, মঙ্গল-মঠে বল্লভাচারি সম্প্রদায়ের সংসর্গে আসিয়া, গুরুশিষ্য সম্বন্ধীয় আপত্তিজনক আচার অনুষ্ঠানগুলা, আদিত্যের বিদ্রূপস্থল হইয়াছে। পূজ্যপাদ আদিগুরু বল্লভাচার্য্য প্রবর্ত্তিত শুদ্ধাদ্বৈতমত-বাদ ও সাধন সম্পর্কীয় আচার অনুষ্ঠানে এখন অবশ্য বিস্তর গলদ ঘটিয়াছে, পূর্ব্ব কথিত বিধি ব্যবস্থার সহিত বর্ত্তমানের প্রায় আমূল পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, এখন সম্প্রদায়ের গুরুগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন ও শিষ্যাগণ কায়মন সমর্পণে গুরু সেবায়—তথা কথিত অবতার পূজায় আদিষ্ট হন। বল্লভাচার্য্য প্রবর্ত্তিত উন্নত সাধন লক্ষ্য এখন বাহ্যাড়ম্বরের স্থূল অনুষ্ঠানে লুপ্ত প্রায়!

কিন্তু আদিত্য যাহাই অনুমান করুক,—নিরঞ্জন তাহার কথায় হঠাৎ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল, অন্য কারণে। কে জানে কেন, আদিত্যের ভিন্নলক্ষ্য বিদ্রূপ, হঠাৎ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ঠিকরাইয়া আসিয়া তাহাকে আঘাত করিল। নিরঞ্জন আপনাকে সামলাইয়া লইল, কিন্তু নিজের মধ্যে একটা গোলযোগের বিপন্নতা স্পষ্ট-অনুভব করিল। ঐ 'গোপীভাব সাধনার' সমসূত্রে গাথা কোন একটা অপরাধ গ্লানির অস্পষ্ট ইঙ্গিত, বিদ্যুৎ-কশার মত তাহার মর্ম্মে বাজিল। নিরঞ্জন সচেতন হইয়া চাহিল—না, অতি মূর্খ সে!

নিজেকে চোখ রাঙাইয়া নিরঞ্জন ভুল সংশোধনে মন দিল। কুণ্ঠিত আদিত্যের মুখ পানে চাহিয়া ক্ষীণভাবে হাসিয়া বলিল, "বৈষ্ণব সাধন তত্ত্বের উচ্চ আধ্যাত্মিক তথ্য বুঝিস্ না, বাহ্যাংশের ত্রুটি দেখে ব্যঙ্গ করিস্—বড় অন্যায়।"

সাহস পাইয়া আদিত্য বলিল, "আচ্ছা ভাই, তুই এদের আচার অনুষ্ঠানগুলা ভাল বলিস্?"

নিরঞ্জন বলিল, "ভাল না বল্লেও, মন্দ বল্‌বার অধিকার আমার নাই, কারণ আমি এদের সম্প্রদায়ের খুড়ো জ্যাঠা সম্পর্কীয় কেউ নই,—কিন্তু তুই অত্যন্ত ফাজিল হয়ে পড়েছিস্।"

নিশ্চিন্ত-মুখে আদিত্য উত্তর দিল, "অগত্যা! কারণ তোমার মত নিতান্ত হাল্কা-বৈরাগ্য এখনও মনে রীতিমত জাঁকিয়ে ওঠেনি।" খাটের পাশে জানালার উপর হইতে মুক্ত-বক্ষ কুমারসম্ভব কাব্যখানা ফস্ করিয়া টানিয়া লইয়া বলিল, "পড়া হচ্ছিল না কি? এ কি রতিবিলাপ যে!"

আদিত্য স্বভাব-সিদ্ধ পুরুষ গম্ভীর কণ্ঠে পড়িতে আরম্ভ করিল :—

> "কস্ত মাং ত্বদধীনজীবিতাং বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
> নলিনীং ক্ষত সেতুবন্ধনো জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥
> কৃতবানসি বিপ্রিয়ং ন মে প্রতিকূলং ন চ তে ময়াকৃতম্।
> কিমকারণমেব দর্শনং বিলপন্ত্যৈ রতয়ে ন দীয়তে॥
> স্মরসি স্মর—"

যোড় হাতে সনাতন বলিল, "রক্ষা কর, কবি বড় দুঃখেই

'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ' বলে লিখে গেছেন, কেন স্বর্গীয় ভদ্রলোকের নিরীহ আত্মার উপর নিষ্ঠুরতা করছ। রতিবিলাপ তোমার মুখে মোটেই মানায় না!

কৃত্রিম বিস্ময়ে আদিত্য বলিল, "মোটেই না! আচ্ছা, অজ-বিলাপ?"

সনাতন বলিল, "আহা! ঐ জলদমন্দ্র-কণ্ঠে সে সুর দীপকে-মল্লারে লড়াই-ঝগড়া গোছ মানিয়ে উঠবে। ও সব মানায় আমাদের নিরুদার মুখে, আহা! চোখ দিয়ে জল বার করে ছাড়ে।"

হাতের উপর চিবুক স্থাপন করিয়া, অন্যমনস্ক নিরঞ্জন বাতায়নের মধ্য দিয়া দূর-দিগন্তলীন শূন্যপানে চাহিয়াছিল। সনাতনের মুখে নিজের নাম শুনিয়া, সেদিক হইতে প্রশান্ত-আয়ত চক্ষুদ্বয় ফিরাইয়া বলিল, "এ্যাঁ কি বল্‌ছিস্?"

এক-ঠেলায় সনাতনকে থামাইয়া, আদিত্য গম্ভীরভাবে বলিল, "সনা বল্‌লে তুমি যখন 'অহম্ নির্ব্বিকল্প নিরাকার রূপং, শিবোঽহং' বলে গান গাও তখন মনে হয়, বুঝি পরমার্থ-তত্ত্বের ভীড়ে তোমার শিল্প-সাধন বিদ্যার অস্তিত্বই চাপা পড়ে যায়।"

মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া নিরঞ্জন একটু হাসিল। কয় মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া, ধীর-কোমল কণ্ঠে বলিল, "বাস্তবিক সনাতন।"

ব্যঙ্গের ঝাপ্টায় নিরঞ্জনের গাম্ভীর্য্য উড়াইবার জন্য আদিত্য হাস্যোদ্দীপক ভঙ্গিতে নিরঞ্জনের সম্মুখে হাত ঘুরাইয়া বলিল, "আর বাস্তবিক নিরঞ্জন, তোর ঐ শিল্পের ওপরকার কড়াক্কড় ঝোঁক, আর বেদান্ত-বৈরাগ্য বিষয়ে ঘোরতর উৎসাহ, এ দুটোর মধ্যে আমি ত মোটেই সামঞ্জস্য খুঁজে পাইনে!"

নিরঞ্জন খাট ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। পরস্পর-বদ্ধ বাহুযুগল বক্ষের উপর স্থাপন করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, স্মিত বদনে ঈষৎ হাসিল, কোন উত্তর দিল না। সনাতন বলিল, "নিরু-দা আমাদের তান্ত্রিক লোক, ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ।"

আদিত্য সজোরে তাহার কর্ণ মর্দ্দন করিয়া বলিল, "ভুল!" 'গৃহ' বল্‌তে ইট-কাঠে গড়া যে পদার্থ-টা বোঝায় সেটা, মা-বাপের পুণ্যে ওর ভাগ্যে এখনও কিছু আছে, কিন্তু দন্ত্য 'স' এ 'থ' এ বল্‌তে যা বোঝায় সেটা ব্রহ্মচারী নিরঞ্জনের এখনও লাভ হয় নি, সুতরাং বল, ব্রহ্মনিষ্ঠ লক্ষ্মীছাড়া।"

সনাতন কানে হাত বুলাইয়া, সবিনয়ে বলিল, "আমি তোর এস্রাজও নই, বেহালাও নই, কান মুচড়ে ভুল সংশোধন করলে, একদম বে-সুরো বল্‌ব, কারণ আমি দুঃখানুভব শক্তিবিশিষ্ট সজীব মনুষ্য!"

আদিত্য সসৌজন্যে বলিল, "ধন্যবাদ, ত্রুটি মার্জ্জনা কর বন্ধু। এখন বল ব্রহ্মনিষ্ঠ লক্ষ্মীছাড়া নিরঞ্জন—না না লক্ষ্মীহারা নিরঞ্জন,—উহুঁ সেও ত ঠিক্ হয় না, ওর লক্ষ্মী-শ্রী ত কোনকালেই ছিল না, সুতরাং বল লক্ষ্মীহীন নিরঞ্জন,—ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণ, অতএব ওর 'যদ্ যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বন্তি তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ' কেমন?"

সুরে সুর মিলাইয়া সনাতন গম্ভীর মুখে বলিল, "অবশ্য, ওর মতে আত্মার ব্যক্ত-শক্তিটা জড় জগতের আনন্দজনক কাজে কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত থাক্, কিন্তু অন্তর্শক্তিটা নির্লিপ্তভাবে ব্রহ্মজ্ঞানে মগ্ন হয়ে ঘুমুক্,—অতএব বহির্শক্তিটা খুশী হয়ে শিল্পই গড়ুক।"

আদিত্য দেয়ালের গজাল হইতে এস্রাজ পাড়িয়া, তাহাতে ছড়ি

টানিয়া বলিল, "অথবা এস্রাজ-ই বাজাক্, কোন আপত্তি নেই, কেমন নিরু-দা ?"

নিরঞ্জন বলিল, "নিশ্চয়। কিন্তু আপাততঃ ও-প্রসঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ টেনে আমায় বিষয়ান্তরে এগিয়ে পড়তে হবে, অর্থাৎ তুমি এস্রাজ বাজিয়ে চেঁচিয়ে মর, আমি বেড়িয়ে আসি।"

"যাও, বেশীক্ষণ হিমে থেক না, সন্ধ্যের পরই ফিরো।"

নিরঞ্জন অগ্রসর হইয়া তাহাদের দৃষ্টি-সীমাতীত হইল। দূর হইতে আদিত্যের এস্রাজের সুরে, উচ্চ-সতেজ কণ্ঠের সঙ্গীত ধ্বনি সায়াহ্নের বায়ুস্তরে মনোরম আনন্দে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। নিরঞ্জন শুনিতে শুনিতে চলিল—

এস সখি স্মৃতি সঞ্চারে—
স্বপন আবেশে এস হৃদি বাসে, মনোরম শোভা সম্ভারে।

আদিত্যের পুরাতন নীরস-সঙ্গীত, আজ দূর হইতে বলিয়া-ই হউক, অথবা অন্য যে কারণেই হউক, নিরঞ্জনের কানে অত্যন্ত বিস্ময়াবহ নূতন বলিয়া বোধ হইল।

———

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিরঞ্জন অতিথিশালার দ্বার দিয়া বাহির হইয়া, পথের বাঁক ফিরিয়াছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে শ্যামসুন্দর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ পুত্র বালক রামকৃপাল ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চ চীৎকার করিল, "নিরান্-জন্ ?"

নিরঞ্জন বালকের কটি ধরিয়া শূন্যে ঘুরাইয়া কাঁধের উপর তুলিল, স্মিতমুখে বলিল, "কি খবর কৃপাল ?"

"খবর ভাল" বালক নামিয়া পড়িল। পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সঙ্গিনীকে ডাকিয়া বলিল, "আয় মমু এদিকে আয় রে, ভয় কি ?"

নিরঞ্জন ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, কয়েক হাত দূরে,—একটি সুন্দরী ছোট বালিকা মারাঠি-ধরণে কাপড় পরিয়া দাঁড়াইয়া, বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। হাসিমুখে সস্নেহে নিরঞ্জন হস্ত প্রসারণ করিয়া ডাকিল, "এস খুকি, এদিকে এস।"

খুকি তথাপি অগ্রসর হইতে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া, কৃপাল এক ছুটে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল। তাহাকে সাহস দিবার জন্য উৎসাহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "তুই এত ভয়তরাসে কেন রে ? ছিঃ, দ্যাখ আমি এক ছুটে এসে ওর কাঁধে উঠেছি, ভয় কি ? ও কিছু বলে না, সবাইকে খুব আদর করে। আর না,—ও আমায় একটা পাথরের মহাদেব গড়ে দিয়েছে।"

পরক্ষণেই নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া সাগ্রহে বালক বলিল, "দ্যাখো

একে একটা মহাদেব গড়ে দিও ত।" সঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিরে, মহাদেব নিবি? না কিষণ জী নিবি?"

বালিকা গালের এক পাশে জিহ্বা-টা ঠেলিয়া গাল উঁচু করিয়া সলজ্জ ভাবে বলিল, "কিষণ-জী।"

বালক বলিল, "কিষণ জী, আচ্ছা তাই তাই,—দ্যাখো নিরান্-জন্ একে মহাদেব দিও না, কিষণ-জী গড়ে দিও, বুঝলে?"

নিরঞ্জন সহাস্যে বলিল, "বুঝেছি, এটি তোমার কে? বোন্ বুঝি?"

বালক ভৎর্সনার স্বরে বলিল, "দ্যাৎ বোকা, বোন কেন? ওরা যে বাঙ্গালী! দ্যাখো ও আমার চেয়ে দু মাসের বড়, কিন্তু মাথায় আমার চেয়ে কত ছোট!"

হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ গঠনের দীর্ঘাকার মহারাষ্ট্র বালক,—অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব-ক্ষীণ গঠনের বালিকা সঙ্গিনীকে পাশে টানিয়া, তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া মাথায় মাথায় ঠেকাইয়া সগর্ব্বে বলিল, "দেখ্‌ছ, ওর মাথাটা আমার কানে পড়ে, আমি কত বড়।"

সকৌতুকে হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "তুমি খুব বাহাদুর।"

বালক পুনশ্চ বলিল, "দ্যাখো এরা মারাঠির মত কাপড় পরে, কিন্তু তাই বলে এরা মারাঠি নয়—বাঙ্গালী।"

"মারাঠি নয়! বটে, এখানে এখন অনেক বাঙ্গালী বাস কর্‌ছেন, এ মেয়েটি কোন্ বাড়ীর?"

কৃপাল বলিল, "এদের বাড়ী! এদের বাড়ী ঐ ওখানে।" বালক সজোরে সম্মুখে হস্ত প্রসারণ করিয়া কোন একটা অনির্দ্দিষ্ট স্থানকে নির্দ্দেশ করিল, নিরঞ্জন বুঝিল না—সে পুনরায় প্রশ্ন করিতে উদ্যত

হইল, কিন্তু সেই সময় পশ্চাতে কোন বৃদ্ধকণ্ঠের বিরক্তি-ব্যঞ্জক বিড়্‌বিড়ানি শুনিয়া, সেই দিকে ফিরিয়া চাহিল, দেখিল বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাড়ীর অতি বৃদ্ধা বাঙ্গালী ঝি মনুর মা আপন মনে বকিতে বকিতে আসিতেছে।

জরা-জীর্ণা বৃদ্ধা একে কুব্জা তায় স্বল্প দৃষ্টি। কাছাকাছি হইয়া তাহাদের দেখিতে পাইয়া, ঈষৎ ক্রোধের সহিত বলিল, "এমন সব দস্যি ছেলে! বাবারে বাবা! হাড় মাস জ্বালালে, চল বল্‌ছি শীগ্‌গির্,—আমার দাঁড়াবার সময় নেই!"

কৃপাল হাত মুখ নাড়িয়া, তর্জ্জনী উচাইয়া সজোরে বলিল, "তুমি চলে যাও আমরা অমনি একলা যাব।" নিরঞ্জন বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাইত, দাসী হইলেও, বুড়ো মানুষ বলিয়া তাহাকে 'সমীহা' করিয়া চলিত। বুড়ীও সেই জন্য তাহার মত 'ভাল ছেলের' উপর কিঞ্চিৎ অনুগ্রহশীলা ছিল,—দেখা হইলেই মিষ্টি মুখে 'ভাল থাকার' খবরটুকু জিজ্ঞাসা করিত। 'মেয়ে' অর্থাৎ শান্তিদেবীর নাম করিয়া, কখনও বা বাড়ীতে বেড়াইতে যাইবার নিমন্ত্রণ করিত।

নিরঞ্জন অগ্রসর হইয়া বলিল, "কি গো বুড়ি দিদি, ভাল আছ ত, দু' দিন যেতে পারি নি ওখানে, মা ভাল আছেন ত?"

বুড়ী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিরঞ্জনের মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। একটু প্রসন্ন হইয়া, নিরঞ্জনের প্রশ্নের উত্তরে পুনশ্চ কুশল প্রশ্ন সুধাইয়া বলিল, "এখন ত আর অসুখ বিসুখ নেই? বেশ সাবধানে আছ দাদা?"

নিরঞ্জন বলিল, "হ্যাঁ,—তুমি এদিকে এখন কোথা যাচ্ছ?"

বুড়ী ক্ষোভের স্বরে বলিল, "আর দুঃখের কথা বল কেন বাবা? বলে, 'নিজের দুঃখে অসংসারী, পরের দুঃখ সইতে নারি'—নিজেদের বাড়ীতে ছেলের হুজ্জুত হেঙ্গামা নেই, পরের নিয়ে যত জ্বলন! বাসন ক'খানা মাজ্‌তে বসেছিনু, তা 'মেয়ে' তাড়া দিয়ে উঠিয়ে দিলে, বল্লে—'যাও মাসী, সাঁজের বেলা কচি ছেলে দুটো, একলা কোথায় যেতে কোথা যাবে, তুমি ওদের বাড়ীতে পৌছে দিয়ে এস।' কি করি বাবা তাই ছুটোছুটি করে আবার এনু—আর এ কালের ছেলেরাও সব বড় দজ্জাল বাবা, কারুর কথা মানে না, দ্যাখোনা আমি আস্‌তে আস্‌তে এতখানি পথ ছুটে চলে এসেছে।"

সহাস্যে নিরঞ্জন বলিল, "ছেলেরা চিরকাল দুরন্ত হয় দিদি,—আচ্ছা তুমি নিজের কাজে যাও, আমি এই দিক দিয়ে বেড়াতে যাব—এদের বাড়ী পৌছে দিয়ে যাচ্ছি।"

"তুমি যাবে দাদা? তা যাও।" অস্বস্তি-মুক্তা বৃদ্ধা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "একে বুড়ো মানুষ, চোখে দেখ্‌তে পাইনে,—এতটা পথ গিয়ে ফিরে আস্‌তে দেরী হ'ত, বাড়ীর কাজকর্ম্ম সব পড়ে রয়েছে,—আমি তা হ'লে যাই?"

নিরঞ্জন বলিল, "স্বচ্ছন্দে।"

কিন্তু এত স্বচ্ছন্দতা বুড়ীর ধাতে বোধ হয় অসহ্য, সুতরাং দজ্জাল শিশুদিগের দায় হইতে নিষ্কৃতিদাতাকে দুটা কথা না বলিয়া সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। নিরঞ্জনের দীর্ঘজীবন ও সুস্থ শরীরের জন্য ভগবানের কাছে আবেদন জানাইয়া কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে বৃদ্ধা বলিল, "যার শরীরে দয়া নেই তার ধর্ম্ম নেই! তোমার মন ভাল দাদা,

ভগবান্ তোমার ভাল করবেন—" বলিতে বলিতে সহসা কি কথা মনে পড়ায় বুড়ী সাগ্রহে বলিল, "হ্যাঁ দাদা, দয়ানন্দঠাকুর কি সব মিছি মিছি বলেছে না কি তোমার নামে ?"

বিস্মিত হইয়া নিরঞ্জন বলিল, "তোমায় কে বল্লে ?"

"আর কে বল্লে! শুনতে কি কিছু বাকী থাকে গা!" বৃদ্ধা অত্যন্ত নিকটবর্ত্তিনী হইয়া চুপি চুপি বলিল, "কারুর কথা শুন নি দাদা, এখানকার মানুষগুলো বড় চক্ষুজ্বালা লোক, তুমি আমি ত কোন্ ছার, বলে আমাদের কর্ত্তা বুড়ো ত অমন পণ্ডিত, পায়ে ধরে যাকে এখানে এরা নিয়ে এসেছিল, তাকেই বলে—এই বার বছরে বার শ হাঙ্গাম পোয়াতে হল। বলে সেই, 'জন্ম যে কুলে, জানে গোকুলে'—আমার অছাপা কিছু নেই কত হো'ল কত গেল সব দেখ্ লুম, ঐ 'কুরুজ-কুটো' দয়ানন্দ ছোঁড়া কি কম? গেল বছর ত অধিকারী মহারাজ ওকে দরওয়ান দিয়ে মঠ থেকে দূর করে দিয়েছিলেন, শেষে আমাদের বুড়ো কর্ত্তাই মাঝে পড়ে সেবারে ওকে বাঁচিয়েছিলেন। শুনেছ ত সব, ওর কি কম বুকের পাটা ?"

কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া নিরঞ্জন বলিল, "কই কিছুত শুনি নি ?"

"শোন নি!"—আশ্চর্য্য বৃদ্ধার প্রাণের মধ্যে বিষম ছটফটানি ধরিল—নিরঞ্জনকে সব শুনাইতে হইবে। নিজের ফিরিবার তাড়াতাড়ি বৃদ্ধার মনে রহিল না, সে মন খুলিয়া মনের বোঝা নামাইতে আরম্ভ করিল।

পথের ধুলা লইয়া খেলিতে খেলিতে বালকবালিকা দুইটি তখন যথেচ্ছ বিশ্রামালাপ জুড়িয়াছিল। বুড়ী তাহাদের দিকে লক্ষ্য রাখিল না,

হস্ত মুখ নাড়িয়া নিরঞ্জনকে দয়ানন্দের গুণগান শুনাইতে লাগিল। নিরঞ্জন শুনিল,—পূর্ব্বে দয়ানন্দের-ঘনিষ্ঠ-বন্ধু-সম্পর্কীয়া কোন দুশ্চরিত্রা রমণী মঠের দেবালয়ের দৈনন্দিন কার্য্য করিত। বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাহাকে ছাড়াইয়া তাহার স্থানে, নিজের দেশ হইতে আগত কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ বিধবাকে নিযুক্ত করেন। দয়ানন্দ সেই আক্রোশে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নামে অনেক জঘন্য কুৎসা রটনা করিয়া বন্ধুবান্ধবের নিকট আস্ফালন করিয়া বেড়ায়। বেদান্তবাগীশ বিরক্ত হইয়া কর্ম্মত্যাগে উদ্যত হন। অধিকারী মহারাজের কানে সব কথা উঠে, দয়ানন্দের মিথ্যা ধরা পড়ে। অনেক অপমান লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া, উদার স্বভাব বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কৃপাবলে দয়ানন্দ সে যাত্রা রক্ষা পায়, না হইলে এতদিন সে 'খই খাইয়া খই হইয়া যাইত।'

ঘোরতর অসন্তুষ্টা বৃদ্ধার ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গিমা অত্যন্তই হাস্যোদ্দীপক দৃশ্য হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু নিরঞ্জন চাপিয়া গেল, হাজার হউক বুড়া মানুষ! নবোদগত রোম-রেখা-শোভিত ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি সঞ্চালনে মনোযোগী নিরঞ্জন, ক্ষুব্ধ বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য হাসি হাসি মুখে বলিল, "দয়ানন্দঠাকুর বড় সুবিধে লোক নন, ছেলে-মানুষীটা ওঁর বড়ই বেশী! বয়সটাও নেহাৎ কাঁচা।"

"হুঁ! ভারি কাঁচা! তিন ছেলের বাপ মিন্‌সে, আরও কি ন্যাকরা করবার বয়স আছে না কি?"

বৃদ্ধার মন্তব্য স্রোত ক্রমশঃ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের দিকে ঠেলিয়া চলিয়াছে দেখিয়া, নিরঞ্জন বিব্রত হইয়া উঠিল। কথাটা ফিরাইয়া

লইবার জন্য হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা দিদি, এই মেয়েটি কি সত্যি বাঙ্গালীর মেয়ে?"

ক্রীড়ারতা বালিকার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ, বাঙ্গালীর মেয়ে। দেশে আমাদের সব এক জায়গায় বাড়ী।"

"এক জায়গায় বাড়ী! ও, আচ্ছা, এর বাপের নাম কি?"

"ওর বাপের নাম হৃষিকেশবাবু, তারপর শোননা বলি—দয়ানন্দটি—"

অতিমাত্র ব্যগ্রতার সহিত নিরঞ্জন বলিল, "আচ্ছা, হৃষীকেশ বাবু—কোন্ হৃষীকেশ বাবু? যিনি কেবলবাবুর দাদা হন তিনি কি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ তিনিই! আমাদের ঠাকুরের ভাইপো হন, জান না ঐ ওঁরই বাড়ীতে ত তোমাদের ঠাকুরবাড়ীর সেই বুড়ী দিদিমা,—এই যার কথা বলছ,—যাঁকে রাখার জন্য ঠাকুরের সঙ্গে দয়ানন্দের 'ঠেকৃরাঠেকৃরি' হয়েছিল, সেই তিনি।"

চঞ্চল হইয়া নিরঞ্জন সংক্ষেপে বলিল, "বুঝেছি বল।"

বৃদ্ধা বলিল, "সেই তিনি, ঐ হৃষীকেশবাবুর বাড়ীতেই থাকেন, আহা কি দশা! আমারই মত কপাল করে বুড়ী ভারতে এসেছিল আর কি! ধরণী গিন্নি মেয়ে, শূর-বীর জামাই,—আহা কি রূপ! আমরাই দেখেছি সব, এমন মানুষ কোথাও দেখবো না—তা সব কি ধড়ফড়িয়ে মরে গেল! আহা জামাইটাও যদি বেঁচে থাকত তা হলে কি আজ বুড়ীর এত 'দুক্কু' হয়। আবার তারা গেল, গেল,—বুড়ীর এই বয়সে শাস্তি দ্যাখো দিখি, একটা আইবুড়ো মেয়েকে গলায় গেঁথে দিয়ে গেল।"

নিরঞ্জনের চক্ষু কর্ণ সমস্ত সচকিত হইয়া উঠিল। প্রসঙ্গক্রমে বুড়ী কাহার কথা আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহা—এক মুহূর্ত্তে নিরঞ্জনের সমস্ত

অনুভূতিকে তীব্র সতর্কতায় নাড়া দিয়া গেল। সরলহৃদয়া বুড়ীর অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতাস্রোতে বাধা দিতে—গোপন কৌতুক আগ্রহটুকু আর তাহার মনে দাঁড়াইবার স্থান পাইল না। নিরঞ্জন সহসা স্তব্ধ গম্ভীর হইয়া গেল।

বুড়ী আপন মনে বলিতে লাগিল, "ঐ মেয়েটা যদি না থাকতো তা হলে আজ ভাবনা কি? আর তাও বলি, ভাগ্যে ঐটুকু ছিল, তাইত মাগী আজ ওর মুখ চেয়ে বুক বেঁধেছে? আহা কি রূপ মেয়ের, আর কি স্বভাব? ও মেয়েকে বুকে রাখলে বুক ব্যথা করে না, ওর মাও ঠিক এমনি ছিল বুঝলে?"

নিরঞ্জন বুঝিল। কিন্তু বুড়ী যাহা বুঝাইতেছিল তাহা নহে, অন্য আর কিছু। গল্পবাজ কেবলরামের মুখে, ইতিপূর্ব্বে নিরঞ্জন এ সকল বিষয়ে অনেক কথা-ই শুনিয়াছিল, কিন্তু তাহা শোনা মাত্র। বঙ্গপল্লীবাসিনী ইতরশ্রেণীর রমণীগণ, পূজা-পার্ব্বনে মুখে তেল মাখিয়া ও কোরা বিলাতী কাপড় পরিয়া বেশ-বিন্যাস করে, পুরুষেরা সুরা-মাহাত্ম্যে অসার অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকা সেরা আমোদ মনে করে এবং ভদ্রলোকেদের বৈঠকখানায় প্রতিবেশীকে জব্দ করিবার জন্য মিথ্যা মামলা সাজায় ও তাস, পাশা, দাবা, বড় জোর হারমোনিয়ামের সহিত কর্কশ বেসুরা কণ্ঠের চীৎকার ধ্বনি ও প্রত্যহ কুইনাইনের সহিত ব্রাণ্ডি সেবনে যে ম্যালেরিয়ার হস্তে মুক্তিলাভ অনিবার্য্য তৎসম্বন্ধে ব্যক্তিগত মতামত, কচিৎ তর্কবিতর্ক করে,—ইত্যাদি ইত্যাদি অদ্ভুত রহস্য শ্রবণে সে যতটুকু মনোযোগ দিয়াছিল—বুড়ী দিদিমার পারিবারিক কাহিনী শুনিতেও তদতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার আবশ্যকতা বিবেচনা করে

নাই। কিন্তু আজ!—আজ নিরঞ্জন বুঝিল, তাহার নিভৃত নীরব অন্তরে, একটা অপূর্ব্ব আগ্রহ, বেশ স্পষ্ট উত্তেজনায় স্পন্দিত হইয়া উঠিতে চাহিতেছে!—ঐ একটি প্রসঙ্গে।

বুড়ী দাসী বলিতে লাগিল, "কেই-বা গন্ধ ছেদ্দা করে, কেই-বা দেখে, নিজেরও কোন কিছুতে গেরাজ্জি নেই। কিন্তু তোর মেয়েটা—আহা! কি চুল গো—এক ঢাল, নরম যেন রেশমের গোছা।"

অগত্যা নিরঞ্জন অতি কষ্টে মুখে একটু ম্লান হাসি আনিয়া বলিল "থাক্ দিদি, বাড়ী যাও সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।"

"এই যে যাই।" বুড়ী তৎক্ষণাৎ বক্তৃতা-প্রবাহ সম্বরণ করিয়া বলিল, "তা হলে তুমি এদের নিয়ে যাও, আমি আসি?"

বুড়ী ফিরিয়া চলিল। মুহূর্ত্তে নিরঞ্জনের মনে একটা বেদনার অনুতাপ বিদ্যুদ্বেগে চমকিয়া গেল। মূর্খ, মূঢ় সে! কেন এমন নির্ব্বোধের মত তাড়াতাড়ি উহাকে থামাইল? বুড়ী যে প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছিল, তাহা নিরঞ্জনের পক্ষে কত সুদুর্লভ—কি প্রবল-ব্যগ্রতাময়ী!

হঠাৎ তীক্ষ্ণ-সূচি-বেধ যন্ত্রণার মত পূর্ব্বকথা নিরঞ্জনের মনে পড়িল। আশ্চর্য্য অন্ধ সে! সুযোগের মুহূর্ত্তে সশরীরে সম্মুখে আবির্ভূত মানুষটাকে সে আদৌ লক্ষ্য করিল না!

কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িল, সে সময় লক্ষ্য করিবার মত কিছু ছিল না। ভাব-সৌন্দর্য্যের উপাসক সে, কাহার বাহ্য-সৌন্দর্য্যের পরিমাণ কতটুকু, তাহার ওজন-যাচাই করিবার লালসা তাহার নাই

পাথর কুঁদিয়া, শিল্প গড়িয়া, পরিশ্রমের উপর সে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সকল দিকে চোখকান রাখিবার সাবকাশ তাহার কই ?

বিশ্ব অতুলনীয় শোভাময়ী ! ফাঁকতালে—তাহার শোভা সৌন্দর্য্যের এতটুকু অংশ যখনই তাহার চোখের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তাহার মুগ্ধ দৃষ্টি সেই আনন্দালোকে ক্ষণিকের জন্য বিহ্বল আত্মহারা হইয়া উঠে ! তারপর ? তারপর সব চুকিয়া যায়, মনে থাকে শুধু—পাথর কাটা, আর শিল্প গড়া।

কিন্তু যাক্ পড়া চলিয়া গিয়াছে। নিশ্বাস ফেলিয়া নিরঞ্জন বালক বালিকা দুইটির হাত ধরিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল।

দশ পা চলিতে দুইবার ডিগবাজি খাওয়া রূপালের অভ্যাস, সুতরাং সে অবিলম্বে হাত ছাড়াইয়া লইল, অন্যমনস্ক নিরঞ্জন কিছু বলিল না। রূপালের সঙ্গিনী বালিকা মমতা—নিরঞ্জনের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য তাহার হাত টানিয়া পরম ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "ওগো ওগো, দ্যাখো,—ও দুষ্টু ছেলে, আপনি একলা যাচ্ছে।"

নিরঞ্জন চমকিয়া বালিকার মুখপানে বিস্ময়পূর্ণ কটাক্ষপাত করিল, পরমুহূর্ত্তে হঠাৎ বলিল, "মায়া দেবী তোমাদের বাড়ীতে থাকেন নয় ? তিনি—তিনি কি তোমায় ভালবাসেন ?"

নিরঞ্জনের কণ্ঠস্বর জড়াইয়া গেল। কথাটা শেষ করিয়াই শঙ্কিত দৃষ্টিতে সে চারিদিক চাহিল—নাঃ কেহ কোথাও নাই। কিন্তু ছিঃ, কি ভীষণ বর্ব্বরতা তাহার !

বিচলিত নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিয়া বালিকা বলিল, "মায়া ? পিসিমা ? হাঁ খুব ভালবাসেন, আমার চন্দন-গৌরী পাখীটাকেও

খুব ভালবাসেন। আচ্ছা, তুমি আমায় কবে কিষণ-জী করে দেবে?"

কৃপাল ছুটিয়া আসিয়া, নিরঞ্জনের হাত ধরিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "ওকে খুব শীঘ্র করে দিও, বুঝ্‌লে—ও খুব ভাল, ওকে সবাই ভালবাসে জান?"

নিরঞ্জন ব্যস্ত বিব্রতভাবে উভয়কে কোন মতে সান্ত্বনা দিয়া, নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে পৌছাইয়া, দ্বার হইতে ফিরিল। তারপর লক্ষ্যহীন ভাবে এখানে সেখানে ঘুরিয়া বহুক্ষণ পরে আবার সেই পথে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ

বুড়ী দাসীর কথাগুলা খুবই সামান্য, খুবই সংক্ষিপ্ত। ধরিতে গেলে তাহা 'কিছু নয়' বলিলেই হয়, কিন্তু কে জানে কেন, সেই তুচ্ছ কথা কয়টির সমষ্টি-বদ্ধ ভাবটা, এত অদ্ভুত মত্ততায় জমাট বাঁধিয়া, নিরঞ্জনের সমস্ত মনের উপর চাপিয়া বসিয়া, তাহাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিল। নিরঞ্জন জোর করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া আপনাকে হাল্কা করিয়া লইতে চাহিল কিন্তু পরিল না, বিদ্রূপ সে লক্ষ্যে আজ গতিহীন!

বুড়ীর ভাষায় সেই "নরম যেন রেশমের গোছা"—কেশ সৌন্দর্য্য প্রশংসা বাস্তবিকই কিছু অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার নহে, বরং বুড়ীর সারল্য উচ্ছ্বাসের পাগলামীতে তাহা কিছু হাস্যোদ্দীপক বৈচিত্র্যে প্রকটিত হইয়াছিল। কিন্তু নিরঞ্জনের আজ সে সকল বিষয়ে মন ছিল না, সে আজ অস্বাভাবিক অন্যমনস্ক এবং কিছু বেশী গম্ভীর-ম্লান।

সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে যাইবার জন্য নিরঞ্জন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু সমুদ্রের ধারে মোটেই যাওয়া হয় নাই, পথে পথে ঘুরিয়াই তাহার সময়টুকু কাটিয়া গেল। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিবার কথা, কিন্তু সেখানকার কলরবে ভিড়িতে আজ আদৌ উৎসাহ ছিল না। এতক্ষণ পথে পথে ঘুরিয়া পরিচিত, অপরিচিত, কত লোকের সহিত দেখা হইয়াছে, সৌজন্যের অনুরোধে কত লোকের সহিত হাসি

মুখে কথা কহিয়াছে, কিন্তু নিভৃত অন্তরে—সেই একটা চিন্তাপ্রবাহ সমান-স্রোতে বহিয়া যাইতেছিল!

পূর্ব্বপথে ফিরিয়া আসিয়া, নিজের কথা নিরঞ্জনের স্মরণ হইল, সে সমুদ্র-বায়ু সেবনের জন্য পথে বাহির হইয়াছে। ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধভাবে নিরঞ্জন ভাবিল, তারপর বিশৃঙ্খলতার বোঝা ভরা মস্তকের উপর হইতে উষ্ণীষটা খুলিয়া, চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে ধীর পাদবিক্ষেপে সমুদ্রের তটাভিমুখে চলিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু শুক্ল-ত্রয়োদশীর-সান্ধ্য জ্যোৎস্না 'ঘোমটে' মূর্ত্তিতে হিম কুয়াশাচ্ছন্ন পৃথিবীর বুকে এলাইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনায় নাই। শীতের জন্য সকল গৃহের বাতায়ন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পথে ভ্রমণ করিবার জন্যও কেহ ছিল না—শুধু নিরঞ্জন একাকী।

সোজা পথে সমুদ্রের তটে যাইতে হইলে অনেকটা ঘুরিতে হয়। নিরঞ্জন রাস্তা ছাড়িয়া—দয়ানন্দঠাকুরের বাড়ীর পিছনের আম-বাগানের পথ ধরিল। পথটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং সম্পূর্ণ নির্জ্জন। দিবসে এ পথে খুব কম লোক চলাচল হয়, রাত্রে আদৌ কেহ যায় না।

পত্রপল্লবাচ্ছন্ন উদ্যানপথে জ্যোস্নালোক মৃদু কিরণ বিতরণ করিতেছিল। উদ্যান পাশে—সুদূর বিস্তৃত জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ভূমি, পূর্ব্বে এখানে মনুষ্য-বসতি ছিল, এখন সেখানে দুই চারিটা ভগ্ন প্রাচীর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চতুর্দ্দিকে দুর্গম কাঁটাবন গজাইয়াছে, স্থানটা মনুষ্যের অগম্য।

নির্জ্জন পথে চলিতে চলিতে—সহসা বিস্মিত হইয়া নিরঞ্জন থমকিয়া দাঁড়াইল। কোথা হইতে একটা অস্পষ্ট—অতি সকরুণ সঙ্গীত সুর কানে আসিয়া পৌঁছিল। নিরঞ্জন চারিদিকে চাহিল, কোথাও কেহ নাই, স্বর লক্ষ্যে কান পাতিল—হাঁ, সঙ্গীতই বটে, কিন্তু বড় করুণ, বড় কোমল—বড় ব্যথিত বেদনাতুর ধ্বনি! যেন বুকভাঙ্গা হতাশার আকুল দীর্ঘশ্বাস—কিন্তু মৃদু, কুণ্ঠিত।

রুদ্ধশ্বাসে নিরঞ্জন ভাল করিয়া কান পাতিল—হাঁ, ঐ দিকে, জঙ্গলাকীর্ণ পতিত ভূমির ও-পাশে, ঐ ছোট বাড়ীর একখানা ঘরের অৰ্দ্ধোন্মুক্ত বাতায়ন পথে যে আলোকরশ্মি নির্গত হইতেছে—সঙ্গীতের ক্ষীণ করুণ শব্দ ঐখান হইতেই আসিতেছে। এ স্থানটা বড় নির্জ্জন, তাই ঐ অস্পষ্ট শব্দটুকু শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, নচেৎ উহা শ্রুতিগোচর হওয়া সম্ভব নহে!

যাক্! নিরঞ্জন ফিরিতে উদ্যত হইল—কিন্তু পরক্ষণেই চমকিত হইয়া পুনশ্চ দাঁড়াইল! এ কি! এ যে বাঙ্গলা গান! হাঁ, ঐ সেই কুণ্ঠা-শঙ্কিত-কণ্ঠের বেদনাবেগরুদ্ধ মৃদু স্বর ঝঙ্কার—

"হৃদয়ের মাঝে খুঁজিতে হৃদয়, শূন্যে শুধু পাই শূন্য পরিচয়,
ভ্রান্তি-কোষে বদ্ধ দুরাশা নিচয়, মোহাবেশে করে মরণ রচনা!"

নিরঞ্জনের মস্তিষ্কের মধ্যে সহসা উদ্দাম প্রখরতায় রক্তস্রোত ছুটিল। কে এই গায়ক! এ কি গান? কেন ঐ বেদনাহত সুর!

নিরঞ্জনের ভাবিবার সাবকাশ হইল না, সে তীরবেগে ফিরিল। মরু প্রান্তরে তাহার জন্ম, দুর্গম অরণ্যে, বন্ধুর পর্ব্বতে, নির্জ্জন উপত্যকায়,

স্বেচ্ছাধীন ভ্রমণে সে চির অভ্যস্ত। একলম্ফে কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলে অবতীর্ণ হইয়া সে দ্রুত অগ্রসর হইল—গানটা ভাল করিয়া শুনিতে হইবে।

জঙ্গলের কোণে সেই বাড়ীর পশ্চাৎ-প্রান্ত আসিয়া মিশিয়াছে। বাড়ীর দুই পাশে প্রতিবেশীদের প্রাচীর বেষ্টিত দুইটি উদ্যান, কাজেই সে অংশটা বড়ই নিস্তব্ধ; সম্ভবতঃ গায়ক নিভৃত স্থান বলিয়াই সেখানে গান গাহিতেছে।

জঙ্গল পার হইয়া নিরঞ্জন সেই বাতায়নের নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইল। বাতায়ন উচ্চে, গৃহমধ্যে কে ছিল, না ছিল দেখা গেল না—দেখিবার ইচ্ছাও ছিল না। নিরঞ্জনের উন্মুখ চিত্ত একরোখা আগ্রহে ছুটিয়াছিল, শুধু গান শুনিতে।

রুদ্ধশ্বাসে নিরঞ্জন শুনিতে লাগিল—সেই বেদনাতুর ক্ষীণ-কোমল সঙ্গীত ধ্বনি,—কক্ষ ভিতরে প্রতিধ্বনিত হইয়া, স্পষ্ট পরিষ্কার সুরে, সুমিষ্ট বংশীধ্বনির উদাস-করুণ সঙ্গীতের মত—রুদ্ধ-আবেগ তাড়নায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া—কাঁদিয়া কাঁদিয়া—জন-মানবহীন কণ্টক-কানন বক্ষে বিহ্বল বেদনায় লুটাইয়া পড়িতেছে! সে গান যেন কাহাকেও শুনাইবার জন্য নহে—নিজে শুনিবার জন্যও নহে—গাহিবার জন্যও নহে। গায়কের কণ্ঠস্বর অজ্ঞাতে সন্ত্রস্ত-ভীত হইয়া উঠিয়াছে। মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধতা, ভিতর হইতে সবেগে ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠ নিষ্পেষণ করিতে চাহিতেছে, তাহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে,—তবু সে গাহিতেছে। সে ত গান নহে, সে দুৰ্দ্দম্য আবেগ-বিদীর্ণ গৈরিক নিঃস্রাবের উচ্ছ্বসিত বেদনাস্ফুলিঙ্গ!

গায়ক ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বার বার গাহিল—

অনন্ত অসীমে একি অলীকতা, একি গো অসার নেশার ছলনা।
সজীব-জীবন মিছা অন্বেষণ, সে যে অপরাধী ভ্রমের ভাবনা!
হৃদয়ের মাঝে খুঁজিতে হৃদয়, শূন্যে শুধু পাই শূন্য পরিচয়
ভ্রান্তি কোষে বদ্ধ দুরাশা নিচয়, মোহাবেশে করে মরণ রচনা!
নিগূঢ় নিথর নীরবতা মাঝে, কে জানে কে কোথা ঘুমায়ে জাগিছে,
নিভৃত বিজনে, অন্ত অন্তস্থানে, আকুল আবেগে কে সাধে সাধনা?
কোথা মরু মাঝে অমৃত বিরাজে, কোন পাষাণেতে স্পন্দন-চেতনা!

গান সমাপ্ত হইল। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ, একটি নিশ্বাসের শব্দও আর শুনিতে পাওয়া গেল না।

বাহিরে নিরঞ্জন স্বপ্নাভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীতে সেই বেদনা-হত সঙ্গীত সুর, এক অপূর্ব্ব আবেগ ঝঙ্কনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। নিরঞ্জন স্পন্দহীন, নিষ্পন্দ! উজ্জ্বল করুণা-সজল বিশাল আয়ত দৃষ্টি-যুগল—ঊর্দ্ধে নীল আকাশের পানে তুলিয়া পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তে সে প্রস্তর-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। শীতের মৃদু সঞ্চারী তীক্ষ্ণ বায়ু, বৃক্ষ পল্লবের মর্ম্মর-গুঞ্জনে বহিয়া আসিয়া, তাহার ললাট চুম্বন করিয়া যাইতে লাগিল। গান শেষ হইল, কিন্তু নিরঞ্জন যেমনকার তেমনই রহিল, নড়িল না।

কয় মুহূর্ত্ত পরে, সজোরে একটা শব্দ হইল। বিস্ময়-চকিত নিরঞ্জন মুখ ফিরাইয়া, বাতায়ন-পথে—কক্ষ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল বাতায়ন সম্মুখবর্ত্তী কক্ষ দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া, নগ্নদেহে একটি

ক্ষুদ্র সুন্দর বালিকা কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভয়ত্রস্ত কণ্ঠে ডাকিল, "পিসিমা।"

করুণা-বিগলিত কণ্ঠে কক্ষস্থ ব্যক্তি উত্তর দিল, "কেন মা?"

পরক্ষণেই কক্ষের অদৃশ্য প্রান্ত হইতে অগ্রসর হইয়া, এক সুন্দরী কিশোরী, বালিকার সম্মুখে আসিল। পুষ্পিতা লতার মত সুকোমল লীলাভঙ্গী সহকারে জানু পাতিয়া ভূমে বসিয়া, ভীতা বালিকাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুমা খাইয়া সস্নেহে বলিল, "কি হয়েছে মনু?"

কিশোরীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বালিকা অস্ফুট স্বরে চুপে চুপে বলিল, "মা মারতে আসছে ছাখ না পিসিমা।"

"মা?" কিশোরীর বিষাদ-বেদনাপূর্ণ মুখমণ্ডলে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে বালিকাকে কোলে লইয়া দীপ সম্মুখে ফিরিয়া বসিল। স্বচ্ছ-উজ্জ্বল দীপালোক রশ্মি তাহাদের উভয়ের মুখের উপর প্রতিফলিত হইল—নিমেষে নিরঞ্জনের চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল। তাহার শিরায় শিরায় বৈদ্যুতিক উন্মাদনার অগ্নিশিখা চমকিয়া গেল। একি—মমতা ও মায়া! মায়াদেবী এতক্ষণ কক্ষাভ্যন্তরে ছিলেন, তিনিই এতক্ষণ ঐ গানে, সেই অনন্ত অসীমব্যাপী অলীক-ছলনায় আহত-ক্ষুব্ধ-চিত্তে—বেদনা-করুণ আক্ষেপ-রাগিণী, বায়ু স্তরে ঢালিয়া দিতেছিলেন। উনিই সেই! হাঁ হাঁ, ঐত সেই বিষাদ-বিনম্র সকরুণ দেবীমূর্ত্তি! ঐ সেই আয়ত সুন্দর নয়নের স্নেহ-কোমল দৃষ্টি। সে দৃষ্টি আত্মবিস্মৃতির শান্ত প্রসন্নতায়, স্নিগ্ধ-সুষমা-স্নাত—করুণা-উজ্জ্বল।

নিরঞ্জনের সমস্ত অন্তরাত্মা উন্মাদ-বিদ্রোহিতায় হুঙ্কার করিয়া উঠিল।

আর চাহিয়া থাকিবার শক্তি-সাহস রহিল না, দুইহাতে উত্তেজনা-স্পন্দন-স্ফীত বক্ষঃ চাপিয়া ধরিয়া, নিরঞ্জন সেইখানে বসিয়া পড়িল। মূর্খ, মূর্খ, অতি মূর্খ সে! এতক্ষণ চাহিয়াও দেখে নাই, কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এইবার—হাঁ এতক্ষণের পর, তাহার দৃষ্টি স্পষ্ট পরিষ্কার হইয়াছে, এ ত হৃষীকেশবাবুর বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগই বটে! ঐ অদূরে শ্যামসুন্দর পণ্ডিতের ভবন, ঐ নারিকেল বাগান, এ পাশে, ইহাই ত মিশ্র মহাশয়ের উদ্যান—তবুও লক্ষ্মীছাড়া কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ সে, বুঝে নাই—ধিক্!

কতক্ষণ পরে তাহার বাহ্য চেতনা একটুখানি ফিরিল। সে ধীরে উঠিয়া অগ্রসর হইল সম্মুখে,—বিশাল—বিস্তৃত সমুদ্রের দিকে!

ধীরে ধীরে শৈত্য কুয়াশাচ্ছন্ন ম্লান জ্যোৎস্নালোক অপসৃত হইল। চন্দ্রদেব ক্রমোজ্জ্বল কান্তিতে ঝলমল করিয়া মধ্য গগনে উঠিতে লাগিলেন। দূর দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র-জলরাশি জ্যোৎস্না কিরণে ঝিকমিক্ করিয়া হাসিতেছিল। দূর দূরান্তর ব্যাপিয়া যতদূর দৃষ্টি চলে, সৌম্য শান্ত জ্যোৎস্নালোকে অপরূপ শোভা! পাশে অদূরে মলয়াচল শ্রেণী, হিম-জ্যোৎস্নালোকে স্তব্ধ ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তিতে নিস্পন্দ! যেন বাহ্য জগতের সমস্ত চাঞ্চল্য বিক্ষোভ গ্লানি দূরে ঠেলিয়া, নিভৃত গোপন মর্ম্মকেন্দ্রে যোগাসনে বসিয়া—অন্তরের আরাধ্য, আত্মতরের ধ্যান সাধনায় সমাসীন! উপকূলের অদূরে ইতস্ততঃ দণ্ডায়মান তাল, নারিকেল, খর্জ্জুর, বৃক্ষগুলা, আকাশে মাথা তুলিয়া, চিত্রিত ছায়ার মত যেন, কোন অনির্দ্দিষ্ট রহস্য বিস্ময়ের আকস্মিক সংঘাতে স্তব্ধ নীরবতায় মগ্ন নিঝুম! দূর হইতে ঝিল্লির মৃদু গুঞ্জন তাল, অজ্ঞাত

আবেগের আকুল উচ্ছ্বাসের মত রণিয়া রণিয়া ধ্বনিত হইতেছিল। কিন্তু চারিদিকে মধুর সৌন্দর্য্য, করুণ-বেদনা সিক্ত শীত প্রকৃতির, বিহ্বল আবেশময়ী মর্ম্মতন্ত্রীর সহিত, আজ সে অস্পষ্ট আবেগ গুঞ্জন, কি নিগূঢ় বন্ধনে গাঁথা—কি অপূর্ব্ব সুষমায় তৃপ্ত মনোহর! .

নিরঞ্জন তটভূমির উপর পরস্পর বদ্ধ বাহুদ্বয় জানুর উপর স্থাপন করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বসিয়া রহিল। আজ কোন্ ঐন্দ্রজালশক্তি বলে, বাষ্পাচ্ছন্ন কুহেলিকা ঘোর কাটিয়া, তাহার নয়ন সমক্ষে, সারা জীবনের অজ্ঞাত অনুভূতিতে—একি অলৌকিক রহস্য-জগতের দ্বার উন্মুখ হইল! আজ সে আত্মহারা মন্ত্রে—একাগ্র তন্ময় সাধক! আজ তাহার চিত্ত রাজ্যে নবসৃষ্টি উদ্বোধনের পূজা।

দণ্ডের পর দণ্ড নিঃশব্দে কাটিয়া চলিল। নিরঞ্জন স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে জ্যোৎস্নালোকিত বিশাল সমুদ্র পানে চাহিয়া, আত্মহারা হৃদয়ে—স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রত্যূষে ভাস্করগণ যথানিয়মে কাজে বাহির হইল। যন্ত্রের বোঝা লইয়া আদিত্য সকলের আগে চলিয়াছিল, সনাতন মাঝে,—নিরঞ্জন সকলের শেষে।

পিছন হইতে ভাণ্ডারী-জীর ভাগিনেয় দ্বাদশ বর্ষীয় বালক সুবলচাঁদ আসিয়া নিরঞ্জনের কাঁধে চড়িয়া বসিল। ছেলেদের আমোদের জন্য নিরঞ্জন সকল রকম ত্যাগস্বীকারে চির-অভ্যস্ত, সুতরাং হাসিয়া তাহাকে কাঁধে বহিয়া লইয়া চলিল। সুবলচাঁদ পরম আরামে দুলিতে দুলিতে, সনাতনের সহিত—আগামী চাচর পর্ব্বের উৎসব সম্বন্ধীয় গল্প ফাঁদিল। নিরঞ্জন নীরবে চলিল।

মোড় ফিরিয়া অগ্রবর্ত্তী আদিত্য—একটু সন্ত্রস্তভাবে পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল, সনাতনও পিছু হটিল। নিরঞ্জন চাহিয়া দেখিল, বেদান্তবাগীশ মহাশয় আসিতেছেন, তাঁহার সহিত আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক। সুবলকে নামাইয়া দিয়া নিরঞ্জন অগ্রসর হইয়া নমস্কার করিল। সৌম্য-শান্ত-দর্শন বৃদ্ধ বেদান্তবাগীশ মহাশয় প্রসন্ন স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "বেশ ভাল আছ? কাজকর্ম্ম বেশ চল্‌ছে?"

নত নয়নে নিরঞ্জন উত্তর দিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

বেদান্তবাগীশ মহাশয় পুনশ্চ বলিলেন, "তোমাদের যতটা কাজ হয়েছে, দেখেছি—বেশ সুন্দর হয়েছে, অধিকারী মহারাজ শীঘ্রই মঠে আস্‌বেন, আমার বোধ হয় তিনিও সমস্ত দেখে সন্তুষ্ট হবেন।"

নিরঞ্জন কোন উত্তর দিল না। আদিত্য সরিয়া আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইয়া, গোপনে তাহাকে একটু ঠেলা দিল, নিরঞ্জন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল, পরক্ষণেই উভয়ের মধ্যে একটু অর্থসূচক দৃষ্টি বিনিময় হইল। নিরঞ্জন মুখ নত করিল, ম্লানভাবে ঈষৎ হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল 'না'।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় সস্নেহে সুধাইলেন, "কিছু বল্‌বার আছে ?"

নিরঞ্জন ক্ষুব্ধ-চকিত নয়নে আদিত্যের পানে চাহিল। আদিত্য তাহার দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া, বিনীতভাবে ঘাড় চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে মৃদুস্বরে বলিল, "আজ্ঞে এমন কিছু নয়—শুধু আপনার নিরঞ্জনকে একটু বারণ করুন, অত রাত পর্য্যন্ত যেন বাইরে ঘুরে না বেড়ায়। কাল অনেক রাত পর্য্যন্ত—"

সস্নেহ ভর্ৎসনার স্বরে বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিলেন, "সত্য না কি ?"

নিরঞ্জনের দৃষ্টিকোণে মুহূর্ত্তের জন্য একটা প্রচ্ছন্ন ব্যাকুলতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। আত্মসম্বরণের জন্য ত্রস্তভাবে কাশিতে কাশিতে নিরঞ্জন বলিল, "আজ্ঞে বিশেষ কিছু নয়—নমস্কার, আসি এখন।"

"এস, যেন্দা কোন অনিয়ম কোরো না।" বেদান্তবাগীশ মহাশয় সঙ্গীর সহিত গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন। মোড় ফিরিয়া নিরঞ্জন যে আদিত্যের উপর এক হাত লইবে, তাহাতে আদিত্য বা সনাতনের বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু মোড় ফিরিয়া নিরঞ্জন কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া চিন্তাকুল বদনে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, সঙ্গীরা আশ্চর্য্য হইল! নিরঞ্জন যে ক্রুদ্ধ হয় নাই তাহা স্পষ্ট

বোঝা গেল, কিন্তু সে যে একটু সন্ত্রস্ত হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে বাকী রহিল না।

সনাতন সহাস্যে বলিল, "আচ্ছা নিরুদা, কাল অত রাত্রি পর্য্যন্ত বাইরে থাকার জন্য—সন্তোষজনক সত্য কৈফিয়তটা কেন দিতে চাইছিস্ না, বল্‌ত ?

নিরঞ্জন চলিতে চলিতে উন্মনাভাবে উত্তর দিল, "মানুষের অভিধানে সকল 'কেন'র উত্তর নাই।"

সনাতন বলিল, "অন্ততঃ একটা ন্যায়সঙ্গত কারণ।"

জোর করিয়া কণ্ঠস্বরে একটু বিদ্রূপরস মিশাইয়া নিরঞ্জন উত্তর দিল, 'পৃথিবীর সকল ব্যাপারই ন্যায়ের শাসনশৃঙ্খলিত নয়।" কিন্তু পরক্ষণেই নিরঞ্জন থামিল, সে কথা উল্টাইয়া লইয়া হঠাৎ ব্যস্তভাবে বলিল, "অধিকারী মহারাজ আস্‌ছেন—এখানকার কাজ যত শীঘ্র সেরে নিতে পারা যায় ততই ভাল, এবার উঠে পড়ে লাগতে হবে।"

ব্যঙ্গস্বরে আদিত্য বলিল, "বাধিত হইলাম। এবার তোমার আহার নিদ্রা বন্ধ, কেমন ?"

নিরঞ্জন কোন উত্তর দিল না, দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল।

কর্ম্মস্থানে আসিয়া, পাকড়ী ও জুতা খুলিয়া, জামার আস্তিন গুটাইয়া সকলে কাজে বসিল। প্রস্তরের পর প্রস্তর সজ্জিত ও সংলগ্ন হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারই বুকে খোদাই কার্য্যের চারু শিল্প উৎকীর্ণ; বহুদিনের পুরাতন কাজ—কোথাও অস্পষ্ট, কোথাও সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সেইগুলার সংস্কার এখন চলিতেছে। বহিঃপ্রাচীরের কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, ভাস্করগণ

এখন দেব-বিগ্রহের শয়ন-মন্দিরের বহিরাংশে পিছনের দিকে কাজে নিযুক্ত।

এখন পাথর বহিবার কাজ চুকিয়া গিয়াছে, যোগাড়ে শ্রমজীবিদল বিদায় লইয়াছে, মাত্র দুইজন আছে। তাহারা ভাস্করদের পূর্ব্বেই কর্ম্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

নিরঞ্জন নিজে সূক্ষ্ম ও শক্ত-কাজগুলি বাছিয়া লইয়া, সঙ্গীদের উপর মোটা মোটা সহজ কাজগুলার ভার দিয়াছিল। সূক্ষ্ম কাজ তাহারা ভাল পারিয়া উঠে না, খারাপ করিয়া ফেলে, নিরঞ্জনকে দো-কর খাটায়। নিরঞ্জনের দুই হাত রেখাঙ্কণে সমান সুদক্ষ, তাহার বাম হাতের কাজ এমনই সুন্দর নিপুণ, যে অনেক প্রবীণ ভাস্করও সারাজীবনে ডাহিন হাতকে সেরূপ পটুতায় তুলিতে পারেন নাই। নিরঞ্জনের শিক্ষাগুরু চিত্তরঞ্জনদেবও এখানে তাহার কাছে পরাভব মানিতেন।

সকলের হাসি-খুসি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কলরব-অন্তরালে নিরঞ্জন চিরদিন যেমন নীরবে কাজ করে, আজিও তেমনই করিল। দ্বিপ্রহরে ছুটি হইল, যন্ত্র রাখিয়া সঙ্গীসহ নিরঞ্জন স্নানাহারে গেল। দ্বিপ্রহরের স্নানাহারের ছুটিটা পুরা মাত্রায় আদায় করিয়া সনাতন ও আদিত্য প্রত্যহ যখন পুনরায় কাজ করিতে আসিত, তখন তাহাদের আগে ফিরিয়া আসিয়া নিরঞ্জন নিজের কাজে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া থাকিত। অপ্রয়োজনে সময় নষ্ট করা তাহার স্বভাবে সহ্য হয় না, কিন্তু আজ সনাতন ও আদিত্য স্নানাহারের পর সহযোগী শ্রমজীবিদের সহিত খোস-গল্প করিতে করিতে যখন কর্ম্মস্থানে দ্বিতীয় বার আসিল, তখন দেখিল, নিরঞ্জন ভিত্তিগাত্রে ঠেস্ দিয়া বসিয়া উন্মনা ব্যাকুল দৃষ্টিতে

চাহিয়া নীরবে কি ভাবিতেছে। যন্ত্রগুলা পায়ের কাছে গড়াগড়ি যাইতেছে, অত্যাবশ্যকীয় অসমাপ্ত কাজ যেখানকার যাহা সব পড়িয়া রহিয়াছে, নিরঞ্জনের কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

আদিত্য আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কিরে নিরুদা, আমরা যে ভাব্‌তে ভাব্‌তে আস্‌ছি তুই আজ কাজের তাড়ায় আমাদের নিশ্বাস ফেল্‌তে দিবি না। অধিকারী মহারাজ শীঘ্র আস্‌বেন শুনেছিস্‌, আর তোকে লুকিয়ে রাখতে পারব না—কিন্তু তুই যে আজ অবস্থা-ব্যবস্থার তত্ত্ব ভুলে পরমহংস সেজে বস্‌লি, রকম কি?"

লজ্জিত নিরঞ্জন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। ম্লান হাস্যে উত্তর দিল, "বুঝ্‌তে পারছি না।"

সনাতন টিপ্পনী কাটিয়া বলিল, "অধিকারী মহারাজের কাছ থেকে কি পুরস্কার আদায় করবি, তাই ভাবতে ভড়্‌কে গেছিস্‌ বুঝি?"

পরিহাসচ্ছলে তাহার স্কন্ধে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া নিরঞ্জন বলিল, "আমি ঘোড়া নই।"

আদিত্য একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া, গম্ভীর ভাবে বলিল, "গাধা?"

"হতে পারি।" নিরঞ্জন যন্ত্র তুলিয়া লইয়া গিয়া নিজের কাজে লাগিল। প্রহার প্রত্যাশায় ব্যর্থ-মনোরথ আদিত্য গোঁফ চুম্‌রাইয়া বলিল, "নিরুদা আজ-কাল খাসা ভদ্রলোক হয়ে উঠেছে।"

নিরঞ্জন হাসিল, কোন উত্তর দিল না। ভাস্করগণ কাজ আরম্ভ করিল।

মন্দিরের পশ্চাদ্দিক বলিয়া, সে স্থানে বাহিরের লোক কেহ নিষ্প্রয়োজনে আসিত না; নিরঞ্জন একাকী অদূরে বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে

কাজ করিতে লাগিল। তাহার দেহ নিশ্চল হইল, দৃষ্টি একাগ্র স্থির হইল—শুধু হাত দুইখানি যন্ত্র চালিতের মত ক্ষিপ্র লঘুতায় সঞ্চালিত হইতে লাগিল।

সনাতন ও আদিত্য একজায়গায় বসিয়া কাজ করিতেছিল, শ্রমজীবি দুইজনও তাহাদের নিকটে বসিয়া হাতে হাতে জোগাড় দিতেছিল ছুটির সময় হইয়া আসিতেছে বলিয়া সকলের মনই স্ফূর্তিতে মাতিয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং চারিজনের মধ্যে গল্প ও হাসির স্রোত তুমুল জোরে চলিতেছিল। গল্পটা অবশ্য ঠিক্ গল্প নহে, প্রকৃত পক্ষে তাহা আদ্যশ্রাদ্ধের মন্ত্র বলাই ন্যায়সঙ্গত। মঠের বর্ত্তমান সহকারী দেওয়ান দেবলচাঁদ ও তাহার মর্ত্ত্য পিতা—কাছারীর বৃদ্ধ কারকুন শ্রীমন্তচাঁদের কথা লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ চলিতেছিল।

পিতা অতিকষ্টে খাটিয়া-খুটিয়া পুত্রকে মানুষ করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া তোষামোদের জোরে এখন সহকারী দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উপযুক্ত পুত্র এখন তাই—পিতাকে, অর্থাৎ শ্রীমন্ত কারকুণকে, রীতিমত তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করিয়া চলে। ভাল মানুষ পিতা—গণ্যমান্য ছেলের কাছে সর্ব্বদাই অতিমাত্রায় সন্ত্রস্ত থাকেন। পিতা-পুত্রের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া, আশপাশের লোকেরা চোখ টেপাটিপি করিয়া হাসে।

শ্রমজীবিদের মধ্যে একজন হাসিতে হাসিতে মিটি মিটি চক্ষে চাহিয়া সঙ্গীকে বলিল, "ওরে আমরা ছোটলোক, আমাদের পয়সা নেই কিনা, তাই পৃথিবীশুদ্ধ লোক আমাদের এতটুকু ছুতো পেলে, ঘেউ ঘেউ করে ভালকুত্তোর মত টুঁটী কাম্‌ড়ে মেরে ফেল্‌তে চায়, আর ওরা বড়লোক,

সভ্যজাত ; পয়সা আছে, বিদ্যে আছে—তাই ওঁদের বড় বড় ঘরে বড় বড় কীর্ত্তি। নিজের স্যাঙ্গার নিজেরা হজম করে-ই ওরা সাবাস্ বুদ্ধিমান, জানিস !”

তাহার স্বগোত্রিয় বন্ধুটী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বড় রসিকতাই হইয়াছে। সনাতন ও আদিত্য পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া হাসিল। দ্বিতীয় শ্রমজীবি প্রচণ্ড আড়ম্বরে হাত মুখ নাড়িয়া, বুক ঠুকিয়া বলিল, “আমার ছেলে যদি বড় হয়ে—আমার সঙ্গে অমি বাদশাই চাল্ যাবে, তাহলে আমি বাবা ঠিক্ ছেলের বুকে নির্ঘাত বর্শা বসিয়ে, নিজে সমুদ্রে ঝাঁপ দেব।” তাহার অবশ্য এখনও বিবাহ হয় নাই এবং বয়সেও সে উক্ত দেবলচাঁদের অপেক্ষা ঢের ছোট।

তাহার কথায় চাপা হাসির উৎস খুলিয়া গেল। খুসী হইয়া আদিত্য তাহার হাস্যোৎপাদন ক্ষমতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিল। বাহাদুরী গৌরবে লোকটার অন্তরাত্মা উল্লাসদম্ভে স্ফীত হইয়া উঠিল।

প্রথম শ্রমজীবি মুখে হাসিলেও, সহকর্ম্মীর ভবিষ্য-বীরত্বের নিষ্কলঙ্ক প্রস্তাব শুনিয়া, নিজের সুদূর পল্লীবাসী পিতাকে স্মরণ করিয়া মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইল। পিতার সহিত তাহার বনে না, পিতা গ্রামে থাকেন, মাসের মধ্যে দশদিন উপার্জ্জন করেন ত বিশদিন নেশাভাঙ্গ খাইয়া চুর হইয়া পড়িয়া থাকেন—কাজেই দুর্নীতিপরায়ণ অবাধ্য পিতাকে—পুত্র দুই চক্ষে দেখিতে পারে না, তাহাকে কখনও এক পয়সা সাহায্য করে না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এখানে উপস্থিত কেহ সে সকল সংবাদ জানে না, তাই সে বাহ্য উৎসাহে দাপট মারিয়া বলিল, “নিশ্চয়,

জুতোর সুকতলা পাগড়ীর উপর বাহার দেখাতে চাইবে! এক লাঠিতে মাথাশুদ্ধ গুঁড়িয়ে দেব না! হাত্তেরি ছেলে!"

সনাতন গম্ভীর মুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "বাস্তবিক এখনকার কালে বাবার সম্মান শুধু টাকার খাতিরে, টাকা না থাকলে আর বাবা কিসের?"

তাহারা কালচক্রের আবর্ত্তন মানব প্রকৃতির বিবর্ত্তন—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের, সাংসারিক রীতি, ও সামাজিক নীতির অবস্থা পর্য্যালোচনায় মহা দুশ্চিন্তায় রঙ্গ ব্যঙ্গ হাস্য পরিহাস চালাইতে লাগিল। আর ওদিকে, নিরঞ্জন নিজের মধ্যে ধ্যানস্তিমিত হইয়া অখণ্ড মনোযোগে শিল্পরেখা আঁকিতে লাগিল। ইহাদের কথা তাহার শ্রুতিগম্য হইতেছিল কি না, ভগবান জানেন, কিন্তু সে ইহাদের দিকে একবারও দৃক্‌পাত করিল না।

পাঁচ মিশালী সঙ্কর ভাষায়, মারাঠা শ্রমজীবিদের সহিত—বিহারী বাঙ্গালী সনাতন ও আদিত্যের মনোমত গালগল্প খরস্রোতে চলিতে লাগিল। আদিত্য বলিল, "কাল আমি আর নিরঞ্জন, কাছারিতে দেওয়ানজীর কাছে গেছলুম, দেওয়ানজী ছিলেন না। আমলাদের জিজ্ঞাসা করে ওর ঘরে গিয়ে দেখি আরে বাপ্! ব্যাটা চৌকী চাপড়ে বাপকে ধমক্ কস্‌ছে, আর বাপ্ এককোণে কুঁকড়ি হয়ে চিঁ চিঁ ক'রে কি বল্‌ছে। ব্যাটা যাহাতক লাল চোখে হাঁকার দিয়েছে, "চোপ্‌রাও বোকা কাঁহাকা," আর অমনি আমরা ঠিক্ দোরে ঢুকেছি, ব্যস্ দুজনেই চুপ! আমার যা হাসি—" সে সজোরে উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "নয় ভাই নিরঞ্জন?"

স্বপ্তোত্থিতের মত চমকিয়া নিরঞ্জন বলিল, "এ্যাঁ।" তাহার চোখ মুখ ছাপাইয়া উৎকট ব্যাকুলতা জাগিয়া উঠিল। তাহার রকম দেখিয়া ভাস্করদ্বয় আবার হাসির তরঙ্গে গা ঢালিল, শ্রমজীবিদ্বয়ও নিরঞ্জনের মুখের ভাব দেখিয়া, মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। অপ্রস্তুত নিরঞ্জন যন্ত্র ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল, নম্র লজ্জিত হাস্যরঞ্জিত বদনে বলিল, "কি বল্‌ছিলি ?"

বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে আদিত্য বলিল, "কোন্ দিকে কান রেখে কথা শুনছ ?"

অন্তর্জগতের রহস্যোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া নিরঞ্জন বাহিরের দিকে চাহিল, তাইত বাহিরের বন্ধুবান্ধবের দল যে তাহার পাশেই বসিয়া আমোদ করিতেছে! সে অনেকক্ষণ ইহাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, একেবারে আলস্য ভাঙ্গিয়া হাসিয়া বলিল, "হাতে দিক নির্ণায়ক যন্ত্র নাই, কোনদিকে কান রেখেছিলুম ঠিক বল্‌তে পার্‌লুম না ভাই, মাপ কর। তারপর, কোন্‌খানটায় কাজ আট্‌কাচ্ছে দেখি ?"

সে অগ্রসর হইয়া আসিয়া আদিত্যের পাশে দাঁড়াইয়া, ঝুকিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার অঙ্কিত শিল্পকার্য্য সমস্ত দেখিল। আদিত্য বলিল, "হা কপাল, আমি তোমায় তাই জন্যে বুঝি ডাক্‌লুম মনে কর।"

"তবে কি ?"

কিঞ্চিত ব্যঙ্গ করিয়া আদিত্য আবার সালঙ্কারে ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত বর্ণন আরম্ভ করিল। শুনিতে শুনিতে নিরঞ্জন অন্যমনস্কভাবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল ; স্পষ্ট বুঝা গেল

সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আদিত্য ভগ্নোৎসাহে তাড়াতাড়ি শেষের দিকটা সংক্ষিপ্তভাবে সমাধা করিয়া ফেলিল।

আদিত্যের কথা শেষ হইলে নিরঞ্জন বলিল, "ওঃ এই জন্যে ডাকছিলে? তা হবে আমি অত লক্ষ্য করি নি।" সে আবার আসিয়া হাতে যন্ত্র তুলিয়া লইল, আরব্ধ কার্য্যে মন দিল।

নিরঞ্জন চিরদিন একটু খেয়ালী ধরণের লোক। কাজ লইয়া বসিলে তাহার বাহ্যজ্ঞান লোপ হইত, সেখান হইতে সহসা অন্য কাজে তাহাকে টানিয়া আনা শক্ত ছিল। সহযোগীরা তাহাকে 'ঘুমন্ত ভাস্কর' বলিয়া ঠাট্টা করিত। নিরঞ্জনকে তাহাদের আলোচনার মধ্য হইতে নির্লিপ্তভাবে পাশ কাটাইতে দেখিয়া, তাহারা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেও বিশেষ আশ্চর্য্য হইল না। আবার পূর্ব্বকথা লইয়া চারিজনের মধ্যে মন্তব্য-স্রোত চলিতে লাগিল।

নিরঞ্জন আঁকিতে লাগিল—সুভদ্রা হরণ। পূর্ব্ব অঙ্কিত চিত্র সম্পূর্ণরূপে এখানটায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, নিরঞ্জন সে সমস্ত ঘসিয়া উঠাইয়া—নূতন করিয়া আঁকিতেছিল।

অর্জ্জুন ও সুভদ্রাকে লইয়া রথ বায়ুবেগে ছুটিতেছে, দারুক রজ্জুবদ্ধ নিশ্চেষ্ট, কিন্তু তাহার মুখে প্রসন্ন কৌতুকের হাস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। রথমধ্যে সব্যসাচী, আক্রমণকারী যাদবগণের উপর উভয় হস্তে শরজাল বর্ষণ করিতেছে, তাহার নয়নে দৃপ্ত বীরত্ব—অধরে দৃঢ় নির্ভীকতা—ললাটে উন্নত মহত্ত্ব কিরণ, উজ্জ্বলরাগে বিকসিত। অশ্বগণ বায়ুবেগে ছুটিয়াছে, কিন্তু অশ্বগণের চালনাকারিণী—দেবী সুভদ্রার মূর্ত্তি পরিকল্পনা লইয়া ভাস্কর—একটু গোলে পড়িয়াছিল।

অতুলনীয়-সৌন্দর্য্যময়ী কোমলহৃদয়া, তরুণী কিশোরীকে, উৎকট রণরঙ্গিনী ভীমামূর্ত্তিতে ফুটাইয়া তুলিতে তাহার হাত সরিতেছিল না, মন মানিতেছিল না,—কিন্তু মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতেও দ্বিধা জাগিতেছিল। বাহিরের দিকে চাহিয়া, শিল্পী অন্যমনস্কভাবে ইতস্ততঃ করিতেছিল।

দূর হউক, দেবীমূর্ত্তি দেবীর মত হওয়াই উচিত!—বলুক বাহিরের মুখ যাহা বলিতে পারে, দেখুক বাহিরের দৃষ্টি—দেখিয়া যাহা অনুমান করিতে পারে। সে অন্তরের ভাবাত্মিকা—ধ্যানময়ী মূর্ত্তিকে—অকম্পিত হস্তে প্রসন্ন গৌরবে—পাষাণের গায় রেখার বন্ধনে ফুটাইয়া তুলিবে!

ভাস্কর সসম্ভ্রমে মর্ম্মদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া সমস্ত দিধা-দ্বন্দ্ব ঠেলিয়া মুক্ত সঙ্কোচে নিজের অন্তরের পানে দৃষ্টিপাত করিল!—হাঁ এই যে তাহার জীবনের বরণীয় দেবী হৃদয় শতদলের উপর উজ্জ্বল গরিমায় অধিষ্ঠিত! না না—ইঁহাকে ছলনার দ্বারা ছাপাইয়া চলিলে হইবে না! এ ঘুমন্তের স্বপ্ন নয়, এ যে জীবন্ত সত্য!

তাহার করুণ হৃদয়, মুগ্ধ-আবেশে আত্মহারা হইয়া উঠিল। উন্মুখ আবেগে শিল্পী সহস্র দিক দিয়া সহস্র প্রকারে, দৃষ্টির সহস্র তাৎপর্য্য দিয়া প্রাণ ভরিয়া সে সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল—বুক ভরিয়া সে মাধুর্য্য অনুভব করিতে লাগিল। অন্তরের দিক হইতে অভিনব ভাব মাধুরীতে মণ্ডিত করিয়া সে দীপ্তি-লেখা শত বারে, শত নবীনতায় পরিবর্ত্তিত করিয়া দেখিল। অসহ্য আবেগে তাহার বুক ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। শিল্পী অন্তরের মধ্যে বিহ্বল হইয়া লুটাইয়া পড়িল, করুণ বেদনায় শব্দহীন কণ্ঠে মিনতি ব্যাকুলতা নিবেদন করিল, ওগো দেবি—ওগো সৌন্দর্য্যের

জীবন্ত স্বপ্ন—ওগো নিভৃত মর্ম্মমন্দির বিহারিণী দেবি! একবার এই অকৃতি শিল্পীর প্রীতি-মুগ্ধ চিত্তের, সমগ্র ধারণাশক্তির বন্ধনে মুহূর্ত্তের জন্য একবার ধরা দাও, শিল্পী ধন্য হউক!

যশ-লক্ষ্মীর প্রসাদাকাঙ্ক্ষা তাহার জীবনে একদিন ছিল, আজ আর নাই! হে সরস্বতী একবার তোমার গৌরবালোকে তাহাকে আত্মহারা লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দাও—সে বাঁচিয়া যাক? তাহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া—তাহাকে পূজার কামনা হইতে মুক্তি দাও, তাহার নম্রোজ্জ্বল আশা পূর্ণ কর, আয়োজন তৃপ্ত কর!

নিরঞ্জন যন্ত্র লইয়া আঁকিতে বসিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ছুটীর সময় হইল, ভাস্করদ্বয় যন্ত্রপাতি গুটাইয়া উঠিবার উপক্রম করিল, নিরঞ্জন তখনও উন্মুখ নয়নে চাহিয়া, সমানে হাত চালাইতেছে। তাহার দক্ষিণহস্ত ক্লান্তি-অবশ হইয়া গিয়াছে, সে এখন বামহস্তে যন্ত্র ধরিয়াছে।

আদিত্য বলিল, "কিরে, তুই আজ আর উঠবি না ?"

বালকের মত অনুনয় ব্যাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া নিরঞ্জন বলিল, "আর একটু ভাই, আর একটু, তোরা ততক্ষণ এগো, আমি এইটুকু শেষ করেই উঠছি।" তাহার মুখচোখে গভীর আগ্রহরশ্মি ঝলসিতেছিল।

"ও টুকুতে কি হচ্ছে ?" আদিত্য অগ্রসর হইয়া সোৎসুক দৃষ্টিক্ষেপ করিল। নিরঞ্জনের হাতের যন্ত্র কাঁপিয়া উঠিল ; কুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া বলিল, "মান পরিমাণ, লক্ষণ, বিচার, সমস্ত ঠিক হয়েছে কি ?"

তাহার অন্তরের মধ্যে আকুল উদ্বেগ ঘনাইয়া উঠিল, পরীক্ষক যদি ভাবের সামঞ্জস্য বিধানে কটাক্ষপাত করে ? সে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে একবার সনাতনের, একবার আদিত্যের মুখপানে চাহিল—সে এমন পরমুখাপেক্ষী দুর্ব্বল ব্যাকুলতা জীবনে আর কোনদিন অনুভব করে নাই।

শিল্পের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে আদিত্য বলিল, "আরে একি, সে মারহাট্টা চেহারার গুণ্ডা অর্জ্জুনকে বরখাস্ত করে, এতো দিব্বি ফুটফুটে পার্শী ভদ্রলোককে রাজপোষাক পরিয়ে দিয়েছিস্, আর দারুক—চ ইনি যে দিব্বি ছোকরা শালাবাবুটীর মত ফূর্ত্তি ভরা মুখ।"

সনাতন বলিল, "আরে বাঃ—একি ভদ্রাদেবী যে !"

ক্রমে আদিত্য বলিল, "দাঁড়া দাঁড়া—এ মুখখানা যেন চেনা চেনা লাগছে যে!"

সনাতন উত্তর দিল, "হাঁ হাঁ, ঠিক্ বলেছিস্, এ মুখখানা কোথা দেখেছি যেন, দাঁড়া বল্‌ব।" সনাতন ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া গোঁফ মোচড়াইয়া বিস্মৃতি স্মরণের চেষ্টা করিতে লাগিল।

উৎকণ্ঠিত নিরঞ্জন তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল, ব্যস্তভাবে বলিল, "আজ এই পর্য্যন্ত থাক, বাকী যা রইল কাল হবে।" সে যন্ত্রপাতি গুটাইতে লাগিল, তাহার সমস্ত মুখখানা আরক্ত এবং দৃষ্টি অধীর চঞ্চল হইয়া উঠিল। যাহোক্ একটা কিছু প্রসঙ্গান্তর আনিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বলিল, "হ্যাঁরে ভাই, তোরা আজ সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাবি? নতুন গরম পড়েছে।"

সহকর্মীদ্বয় তাহার সে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিল না। সনাতন উদাসভাবে বলিল, "সমুদ্রের ধারে? হ্যাঁ তা বেড়াতে গেলেও হয়, সেখানকার হাওয়ায় বেশ চমৎকার ঘুম আসে, আচ্ছা যাব।"

নিরঞ্জন আহতচিত্তে নীরব হইল। হায় সমুদ্র কূল! তোমার স্বর্গ-স্থবিম্বময় তটে ইহারা যাইতে চায়—নিদ্রার লোভে! সে আনন্দময় নিভৃত জাগরণের অমরাবতী ইহাদের কাছে শুধু নিদ্রার আরাম ভূমি! ইহাদের জ্ঞান অনুভূতি এমনই বাহ্যেন্দ্রিয়-সীমা-পরিবদ্ধ বটে! ধিক্, নিরঞ্জন আর একটি কথা কহিল্‌ না।

আদিত্য বলিল, "নিরুদা, কি ভাবছিস্ রে?"

ব্যথিতভাবে ঈষৎ হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "ভাবছি, আদি কবির রামায়ণ কাব্যের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছিলেন কে?"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া আদিত্য বলিল, "বাস্তবিক কে বল দেখি?"

সনাতনের পানে চাহিয়া নিরঞ্জন বলিল, "তুমি বল।"

কৃত্রিম-বিজ্ঞভাবে গুম্ফযুগল পাকাইয়া, মহিষ-শৃঙ্গের ন্যায় ঊর্দ্ধে তুলিয়া অবনত কুঞ্চিত দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রঙ্গভরে সনাতন বলিল, 'পূজনীয় আর্য্যগোষ্ঠীর কাউকে তো তেমন দেখি না, ঐ এক যা—"

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া নিরঞ্জন বেদনাভরে হাসিয়া বলিল, "রাক্ষসকুলের কুম্ভকর্ণ?" অজ্ঞাতে তাহার ললাটে মৃদু ঘৃণার রেখা ফুটিয়া উঠিল। "ঠিক্ বলেছিস্, ঠিক্ বলেছিস্"—সঙ্গীদ্বয় উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, সনাতন হাসিতে হাসিতে বলিল, "তা ঠাট্টাই কর, আর যাই কর বাপু, আমার সোজা সাফ্ কথা,—সূর্য্যবংশের ঐ যতগুলো মহত্ত্ব বীরত্বের কথা, আমার তো মনে হয়, সব বোকামীর গোফ দাড়ী থেকে তৈরী, মগজের সঙ্গে তার এতটুকু সম্পর্ক ছিল না!" সে হো হো করিয়া আবার হাসিল।

যন্ত্রপাতি লইয়া তিন্ জনে অগ্রসর হইল। পূর্ব্ব কথিত শ্রমজীবি দুইজন তখন অদূরে মন্দির-প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া, কি একটা বিষয় লইয়া মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল। ইহাদের অগ্রসর হইতে দেখিয়া দুইজনে সরিয়া আসিয়া বলিল, "ঠাকুর একটা কথা আছে।"

সঙ্গীদের হাসাইবার জন্য দো-আস্‌লা ভাষাতে ব্যঙ্গ করিয়া আদিত্য বলিল, "কি কথা হুজুর।"

প্রথম শ্রমজীবি সকৌতুকে হাসিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বিষণ্ণভাবে নিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া সবিনয়ে বলিল, "আমায় আজ কিছু আগাম খরচ দিতে হবে।"

তাহার মুখ ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া নিরঞ্জন বলিল, "কেন ?"

যোড় হাতে সে বলিল, "বাড়ীতে মার ভারি অসুখ ঠাকুর, আপনি যদি একবার দেওয়ানজীকে বলে দেন—বড় কষ্টে পড়েছি।"

সনাতন অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "ভাল গরজ তো! দেওয়ানজী যখন আমাদের কথা না রাখ্‌বেন তখন ? আর তা ছাড়া—"

আদিত্য বলিল, "কা'ল আসিস্, কা'ল আসিস্—আজ অমনি যা।"

তাহারা নিরঞ্জনকে টানিয়া লইয়া অগ্রসর হইবার উপক্রম করিল কিন্তু নিরঞ্জন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আজ না হ'লে কি রোজই চল্‌বে না ?"

সকরুণ মুখে সে বলিল, "অসুখের খরচ ঠাকুর !"

"আচ্ছা, দেওয়ানজী কথা রাখবেন না বাপু, আমার আজকের মজুরীর টাকাটাই নিয়ে যাও।" সঙ্গীরা কোন কথা কহিবার পূর্বেই ক্ষিপ্র হস্তে পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া নিরঞ্জন তাহাদের দিকে ছুড়িয়া দিয়া, সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া বলিল, "চল।"

আদিত্য ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের মুখ পানে চাহিল। নিরঞ্জন দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়া অপরাধীর মত হাসিয়া বলিল, "কাল ওরা ফের্ আসবে।"

লোকটা টাকা দুইটা কুড়াইয়া লইল। নিরঞ্জন মৃদুস্বরে বলিল, "তোমার মার কি হয়েছে ?"

"জ্বর যুক্ত কাশ।"

"কতদিন ?"

"অনেক দিন ঠাকুর, এখন আবার সব নতুন নতুন উপসর্গ জুটেছে।"

"এত দিন চিকিৎসে করাও নি ?"

সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া লোকটা বলিল, "গরীব লোক হুজুর।"

নিরঞ্জন উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস দমন করিয়া নীরবে তাহার মুখ পানে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সনাতন বিরক্ত হইয়া বলিল, "ঐত দোষ, মনের আনা সাড়ে তিন পাই না শেষ হলে তোরা—"

নিরঞ্জন ব্যস্তভাবে বলিল, "তা হলে তোমরা আজকের মত যাও।"

তাহারা অগ্রসর হইল ; শ্রমজীবিদ্বয় অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। আদিত্য খানিকটা গম্ভীর মুখে ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা নিরঞ্জন, তুই যে এত লোকের এত উপকার করিস্—তা তোর কেউ কিছু করে কি ?"

বালকের মত সরল হাসি হাসিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল, "দেখ ভাই, মুখ চিনে, বাহাদুরী দেখিয়ে বাহবা নেবার প্রত্যাশা আমার নাই, আমি সবাইকার কাজে যেন লাগ্‌তে পারি এই আমার প্রার্থনা। সবাই আমার কাজে লাগুক এ দুরাশা ত—" কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া সে একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলিল।

ঈষৎ তীব্র কণ্ঠে হাসিয়া আদিত্য বলিল, "ওহে ও রকম বচনের কেরামতী অনেকের অনেক দেখ্‌তে পাই, রক্তের তেজ থাকৃতে থাকৃতে অমন লম্বা চওড়া পরার্থপরতাও অনেকের দেখ্‌তে পাই ; কিন্তু অ-দিন হ'লে পৃথিবীকে সবাই নিমকহারাম বলে গাল দ্যায়।"

কথাটা নিরঞ্জনের মর্ম্মে সবেগে আঘাত করিল। হা ভগবান, ইহারা তাহার আচরণগুলা এতদূর নীচ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে ! ইহারা এমনই হৃদয়হীন বটে ; তাহা না হইলে সেদিন কি আদিত্য মায়াকে তেমন নিষ্ঠুরভাবে—, সহসা মুখ তুলিয়া ঈষৎ বেগের সহিত নিরঞ্জন বলিল,

"প্রাণের জোর হারিয়ে, পৃথিবীকে অকৃতজ্ঞ বলে গাল দেবার আগেই—রক্তের তেজে, সত্যিকার পরার্থপরতা সাধন করে—পৃথিবীর সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে নিতে পারি যেন, এইটুকু আশীর্ব্বাদ কর। স্বার্থের জন্যে মানুষের মুখ চেয়ে যেন—" সহসা সম্মুখের দিকে চাহিয়া, স্তব্ধ হইয়া সে দাঁড়াইল। সনাতন ও আদিত্য সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, অদূরে—প্রাঙ্গনপার্শ্বে কয়েকজন দেবদর্শনার্থিনী মহিলা দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন, তাহাদের পাশে দাঁড়াইয়া, সেদিনকার সেই সুন্দরী কিশোরী মায়া! সে এতক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়াছিল—এইবার তাহাদের চাহিতে দেখিয়া ত্রস্তভাবে রমণীগণের অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইল।

প্রথম দিনের কথা স্মরণ করিয়া, ভ্রূভঙ্গীসহকারে, আদিত্য পরিহাসব্যঞ্জক কণ্ঠে ডাকিল, "কন্দর্প—"

নিরঞ্জন সন্ত্রস্তভাবে বলিল, "চুপ্—এই দিকের ছোট দুয়ার দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাই আয়, ও দিকে ওরা রয়েছেন।"

"আরে দূর, ওটা যে চাকরদের যাওয়া আসার—"

"তা হোক্, তা হোক্, এই দিকেই আয়।" সে সসম্ভ্রমে দৃষ্টি নত করিয়া—যেন অলক্ষিতে কাহার উদ্দেশ্যে অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া—পাশের দুয়ার দিয়া ঠাকুরবাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। অগত্যা আদিত্য ও সনাতন তাহার পিছনে চলিল।

রাস্তায় আসিয়া, সনাতন আদিত্যের দিকে অর্থসূচক হাস্যে কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "বন্ধু আমাদের দিনে দিনে অতি সম্ভ্রমশীল হ'য়ে পড়্ছেন।"

নিরঞ্জন কিছু মাত্র অপ্রস্তুত না হইয়া, শুধু স্থির দৃষ্টিতে একবার তাহার মুখপানে চাহিল; তারপর কিছু না বলিয়া অন্যমনস্কভাবে ঈষৎ দ্রুতপদে অগ্রসর হইল: তাহার সে দৃষ্টির অর্থ কি—সনাতন বুঝিতে পারিল না, কিন্তু একটু সঙ্কুচিত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অনেকটা বেলা হইয়া গিয়াছিল। দিদিমা অনেকক্ষণ হইল ঠাকুরবাড়ী হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার মালাজপ আহ্নিক পূজা সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি এখনও রান্নাঘরে আসেন নাই। আজ রবিবার, আফিস বন্ধ। হৃষীকেশ বাড়ীতে আছেন, কিন্তু তাঁহাকে এখনই কার্য্যোপলক্ষে কোথায় বাহির হইতে হইবে। মায়ার বিবাহ সম্পর্কীয় কোন একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য তিনি দিদিমাকে ডাকিয়াছেন, বৌদিদিও সেখানে গিয়াছেন। মায়া দিদিমার বাটনাটুকু বাটিয়া, সামান্য রন্ধনের সামান্য আয়োজনটুকু গুছাইয়া, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় রান্নাঘর আগ্‌লাইয়া বসিয়াছিল। মমতা রান্নাঘরের রোয়াকের পাশে খেলাঘর পাতিয়া, খেলা করিতেছিল।

উনানের আগুন জ্বলিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, আবার নূতন করিয়া কয়লা দেওয়া হইল, সে কয়লাও ধরিয়া আসিল, কিন্তু এখনও দিদিমার দেখা নাই। মায়া দিদিমার আহ্নিকের ঘরে ঢুকিয়া আলোচাল ও রন্ধনের জল বাহির করিতে গেল। দিদিমার জিনিস-পত্র সমস্ত আহ্নিকের ঘরে স্বতন্ত্র থাকিত।

জলের ঘড়া 'কাৎ' করিয়া মায়ার চক্ষুস্থির হইল, কোথায় জল, যেটুকু জল আছে, তাহাতে ভাতে-ভাত সিদ্ধ হওয়া দূরের কথা—সামান্য তৃষ্ণা নিবারণ হওয়া সম্ভব নহে!

দুঃখে, ক্ষোভে, মায়ার চোখ ফাটিয়া জল আসিল! দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ

হইতে চলিল, ইহার পর দিদিমা দীঘি হইতে জল আনিবেন, তবে রান্না চড়িবে

কিন্তু নিষ্ফল ক্ষোভ! কাহার উপর অভিমান করিবে? এ মর্ম্মন্তুদ মর্ম্ম-বেদনা মর্ম্মের মধ্যেই নিঃশেষে নিষ্পেষণ করিয়া, নিজের মধ্যেই নিজের সতেজ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। দুরবস্থার দুঃখে—দুর্ব্বল দৈন্যে বসিয়া কাঁদিলে কি হইবে? ইহার মধ্যে ক্রন্দনের অবসর নাই।

মায়া নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঘড়া লইয়া রান্নাঘরে শিকল চড়াইয়া, মায়া নিঃশব্দে বাড়ী হইতে বাহির হইল। সঙ্গে কেহ নাই, সেই দীঘির দূর পথ। কিন্তু ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না, জল আনিতে-ই হইবে!

আর একদিন প্রাতের সেই জল আনার কথা মনে পড়িল। অলক্ষিতে তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিয়া, মায়া ঈষৎ দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

ভাবিতে ভাবিতে গতকল্য বৈকালের কথা মায়ার মনে পড়িল। প্রতিবেশিনী ভাটিয়া বণিক-বধূগণের সহিত সে মঙ্গল-মঠের ভিতর দেবদর্শনে গিয়াছিল; দেবালয়ের বহির্বাটীর প্রাঙ্গনে আর একদল পরিচিতা মহিলার সাক্ষাত পাইয়া ভাটিয়া রমণীগণ সেইখানে আটক পড়েন, বাধ্য হইয়া মায়াও অগত্যা দাঁড়ায়। মহিলাগণ পরস্পরের গলার গহনা, হাতের গহনা, পায়ের গহনার গঠন-পারিপাট্যের সূক্ষ্মতত্ত্ব বিশ্লেষণে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। গহনার আলোচনা হইতে বেশবিন্যাসের আলোচনা আসিল, আরও কত মাথামুণ্ডু কাহিনীর অসম্বদ্ধ একঘেয়ে প্রলাপ চলিল। মায়া বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহারা

দেবালয়ে আসিয়া করিতেছেন কি! মায়া অসহিষ্ণুভাবে মুখ ফিরাইয় ইতস্ততঃ চাহিতেছিল। সহসা ওকি!—আদিত্য, সনাতন ও নিরঞ্জন সারাদিনের রৌদ্র-শুষ্ক, ক্লান্ত মলিন মূর্ত্তিতে ভিতর হইতে আসিতেছেন। আহা! তাহাদের দিকে চাহিলে মায়া হয়। মায়া নিজের অজ্ঞাতে মর্ম্মে-মর্ম্মে ক্লিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, অন্যমনে তাহাদের দিকে চাহিয়াছিল তাহারা কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিল, স্ত্রীলোকদের লক্ষ্য করে নাই, শেষের দিকটায় আদিত্যের মুখপানে চাহিয়া—আবেগরক্তমুখে নিরঞ্জন বলিতেছেন—স্পষ্ট শোনা গেল, "পৃথিবীকে অকৃতজ্ঞ ব'লে গাল দেবার আগেই যেন, রক্তের তেজে সত্যিকার পরার্থপরতা সাধন ক'রে, পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে পারি!" মায়ার কানে সে কথাটা এখনও তেমনি স্পষ্ট—তেমনি মর্ম্মস্পর্শী স্বরে—সমানে ধ্বনিত হইতেছে। নিরঞ্জনের কথার মধ্যে তাহার মনের যে দৃঢ়-প্রত্যয়-শীল, প্রীতিসুন্দর কান্তিটুকু ফুটিয়া উঠিল, মায়া তাহাতে মুগ্ধ আত্মবিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল! পরমুহূর্ত্তেই নিরঞ্জন তাহাদের দেখিতে পাইয়া সসম্ভ্রমে দৃষ্টি নত করিল। তরুণ যুবার সে নম্র-সুন্দর দৃষ্টি অবনমন ভঙ্গী কি চমৎকার দেখাইয়াছিল!—কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সহযোগীদের সেই বিষাদ-লাঞ্ছিত তীক্ষ্ণ-উজ্জ্বল কটাক্ষ—মায়ার মর্ম্মে মর্ম্মে একটা অপমান-বেদনার ধিক্কার ঝঞ্ঝনা হানিয়া গিয়াছিল। মায়া ত্রস্ত হইয়া আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল—রমণীগণের অন্তরালে।

কিন্তু তবু সে দেখিয়াছিল, নিরঞ্জনের সেই সৌজন্য-মধুর—মনোহর আচরণটুকু! সে কি কোমল-ভদ্রতার সহিত-ই সঙ্গীদের দিকে ফিরিয়া

অস্ফুটস্বরে কি ইঙ্গিত করিয়া, চাকরদিগের ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। সেইটুকু আচরণের মধ্যে তাহাকে কি মহৎ—কি অপরূপই দেখাইল! মায়ার প্রাণ সেইখানেই অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিপুলকে ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে তাহার ক্ষুদ্র ব্যবহারের মধ্যে চিত্তের সমগ্র সৌন্দর্য্যটি দেখিতে পাইয়াছিল, তাহা কত উন্নত—কত চমৎকার!

আঁকা-বাঁকা সরু পথটি ধরিয়া মায়া চিন্তামগ্ন চিত্তে ঘাটের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল। ঘাটের দুই পাশে নানাবিধ বন্যবৃক্ষ গজাইয়াছিল, একটু দূর হইতে ঘাটের লোক দেখা যাইত না, আড়াল পড়িত।

চলিতে চলিতে মায়া ঘাটের অদূরে ঝোপের কাছে আসিয়া পড়িল, সেইখান হইতে ঘাট বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। সহসা উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দে চমকিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া, মায়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। অন্তরের সবেগে প্রবাহিত চিন্তাস্রোত, অকস্মাৎ অটল, উন্নত, দৃঢ় পাষাণ-প্রাকার বক্ষে আহত, বর্ষাস্ফীত নদীস্রোতের মত মুহূর্ত্তের জন্য সংঘাত-স্তম্ভিত হইয়া—পরমুহূর্ত্তে উন্মাদ-বিপ্লবে দুরন্ত ঘূর্ণীপাকের সৃষ্টি করিল—অন্তরেই—নিঃশব্দে!

ঘাটে রহিয়াছে—সেই তিন জন ভাস্কর!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এ কি অপ্রত্যাশিত ঘটনা-সংঘটন! নিরঞ্জন এখানে? মায়া স্তম্ভিত-নয়নে চাহিয়া, প্রস্তর মূর্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! ভুলিয়া গেল—নিজের কথা!

সনাতন আদিত্যকে সাঁতার শিখাইতেছিল। আদিত্য ব্যর্থচেষ্টায় তুমুল আস্ফালনে হস্ত পদ ছুড়িয়া জলরাশি উৎক্ষিপ্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে ছিটাইতেছিল, তাহার সাগ্র ব্যাকুলতায় হাস্যোদ্দীপক সন্তরণ চেষ্টা দেখিয়া সনাতন সপরিহাসে উচ্চহাস্য করিতেছিল। তাহার বিদ্রূপের তাড়নায় এবং জলের মধ্যে অতিরিক্ত লম্ফ ঝম্ফে শ্রমক্লান্ত আদিত্য নিজেও হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাসিতেছিল। সে অত শ্রান্ত হইয়াছে, তবুও হাসি ছাড়ে নাই! নিমেষ মধ্যে আত্মবিস্মৃতা মায়ার মুখচোখ স্নিগ্ধ কৌতুকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—নাঃ, ইহাদের স্বভাবকে অশিষ্টতাপূর্ণ বলিয়া গালি দিলে অন্যায় করা হয়। ইহাদের জীবনটা বুঝি শুধু নির্ভীক-স্বচ্ছ সরলতায় গঠিত—তাহার মধ্যে সম্ভ্রম-শিষ্টতা না থাক, কিন্তু কাপট্যের ছলনা নাই। কোথা হইতে থাকিবে, ইহারা যে নিরঞ্জনের বন্ধু। মায়ার মস্তিষ্কে গতকল্য ইহাদের সম্মান-লেশ-বর্জ্জিত কটাক্ষ বিক্ষেপে—যে আক্ষেপের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝলসিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা চকিতে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। নাঃ, ইহাদের উপর রাগ করা চলে না—কোন মতেই না।

আর নিরঞ্জন? সেই অপরিচিত বিদেশী, সেই এক নিমেষের

কিত দৃষ্টির সূক্ষ্ম-অনুভূতির স্পর্শ সম্বন্ধে পরিচিত সেই অপূর্ব্ব রহস্য লোকের রাজশ্রী-সুন্দর নিরঞ্জন—সে তখন স্নান করিয়া উঠিয়া, সোপানের উপর দাঁড়াইয়া মাথা মুছিতে মুছিতে শিবস্তোত্র আবৃত্তি করিতেছিল। তাহার অধরে স্নিগ্ধ-কোমল মৃদু হাস্য রেখা—বুঝি সঙ্গীদের কাণ্ড দেখিয়া!

মায়া দিদিমার জলের কথা ভুলিয়া গেল, আপনার কথা ভুলিয়া গেল বিশ্বের কথা ভুলিয়া গেল; অবশ চরণে সবলে স্পন্দিত হৃদয়ে বিস্ময়-মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল! তাহার দৃষ্টিসমক্ষে উজ্জ্বল শোভায় বিকশিত হইয়া উঠিল—এক জীবন্ত উচ্ছ্বাসপূর্ণ আনন্দ-সুন্দর অপার্থিব লীলা-বৈচিত্র্য! মায়া অভিভূত হইয়া গেল।

আদিত্যকে জল হইতে টানিয়া তীরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া সনাতন বলিল, "এই নাও, তীরস্থ হও।" পরক্ষণে হাসিয়া—মেয়েলী ধরণে তাহার চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া বলিল, "আহা ষাট্ ষাট্ মা'র বাছা! কিছু মনে করিস নি ভাই!"

হাঁপানি এবং হাসির ঠেলায় আদিত্য তখন অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কিছু মনে করিবার সাবকাশ ছিল না, ঘাটে উঠিয়া বসিয়া পড়িল। একটু দম লইয়া, আত্মত্রুটি সংশোধন চেষ্টায়, কৈফিয়ৎ দিল, "কি জানিস ভাই, জলের ভেতর হাল্কা হয়ে ভাস্তে পারি না—ডুবে যাই কেবল, তাইত দম বন্ধ হয়ে আসে।"

সনাতন ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "তা আস্‌বেই, শিবত্ব লাভ কি সহজ কথা গা! ভগবতী পার্ব্বতী যাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তপস্বিনী সেজেছিলেন।"

"কস্ত্বং বর্ব্বর শ্রেষ্ঠ—" আদিত্য লাফাইয়া জলে পড়িয়া অতর্কিতে তাহার পৃষ্ঠে প্রবল মুষ্ট্যাঘাত বসাইল। সনাতন পৃষ্ঠদেশ বক্র-সঙ্কুচিত করিয়া বলিল, "বাপ কি ভয়ানক সম্মান বোধ রে! গুরুত্বের চাপে আমার দাঁড়াটা ভেঙ্গে গেল।"

"নিবেদয়ামি চাত্মনং" বলিয়া প্রণাম সমাপ্ত করিয়া নিরঞ্জন বলিল, "অতঃপর জলযুদ্ধটা স্থগিত রাখলে হয় না?"

"এর মধ্যে?" আদিত্য ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "এই ত, মোটে বসন্ত রঙ্গ ভূমিতে নেমেছেন, জানিস তো—"

"বাপীজলানাং মণিমেখলানাং শশাঙ্কভাসাং—ঐ যাঃ ভুলে গেলুম, কিরে নিরুদা কি বলত ভাই!"

একটু কাশিয়া নিরঞ্জন বলিল, "সে আর বলে না, থাক্।"

সনাতন সোৎসাহে বলিল, "হাঁ বলিস না, খবর্দ্দার নিরু!" আদিত্য শ্লেষ ভরে বলিল, "আঃ, জানিস বলে তোর ভারি অহঙ্কার, সাধ করে বলি—" সে বাকী কথাটা উহ্য রাখিয়া গেল। অহঙ্কারের অপবাদে বিচলিত হইয়া নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল, "কি ছাই ভস্ম বলব?"

"ঐ, 'বাপীজলানাং মণিমেখলাং শশাঙ্কভাসাং—' তারপর?"

নিরঞ্জন মৃদু হাসিয়া, স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ কোমলকণ্ঠে বলিল—

"...................... ....প্রমদাজননাম্।
চূতক্রমানাং কুসুমানতানাং, দদাতি সৌরভময়ং বসন্তঃ॥"

নিরঞ্জনের কথায় বিদ্রূপ করিয়া সনাতন বলিল, "হাঁ হাঁ, বসন্তের সৌরভময় দানের খাতিরে যত না হোক, আদিত্যদেবের হাত পায়ের

কল্যাণে, বাপীজলানাং খুব পঙ্ক পঙ্কিল সৌগন্ধময় হয়ে উঠেছে। তবে তোমাদের মত দিব্য দৃষ্টিতে, 'শশাঙ্কভাসাং'টা এই ঠিক্কুর রৌদ্রে ঠাণ্ডর পাচ্ছিল না বটে। ওগো কন্দর্প দেব! তোমার ঐ 'নয়নোপান্ত-বিলোকিতঞ্চ' রাখ, দাঁড়াও ভাই, তোমার চপেটাঘাতের পাল্লা থেকে আগে সরে দাঁড়াই—তারপর—কথাটা শেষ করব।"

কৃত্রিম আশঙ্কায় ত্রস্তভাবে সনাতন যেমন মুখ ফিরাইয়া সরিতে যাইবে, অমনি রাস্তার পাশে ঝোপের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। মায়া ঝোপের পাশে একটু আড়াল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সহসা সনাতনকে চাহিতে দেখিয়া, তীক্ষ্ণ সঙ্কোচে তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন কেমন করিয়া উঠিল। অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া শূন্য ঘড়া লইয়া সে ত্রস্তভাবে ফিরিয়া চলিল।

হঠাৎ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সনাতনকে ঝোপের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া—নিরঞ্জনও সবিস্ময়ে সেই দিকে চাহিল। নিমেষে তাহার মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইল, এঁকি! মায়া ফিরিয়া যাইতেছেন? তিনি বুঝি জল লইতে আসিয়াছিলেন?

ক্ষুব্ধ সঙ্কোচে নিরঞ্জনের আপাদমস্তকে একটা অসহনীয় উষ্ণ-শিখা তড়িদ্বেগে বহিয়া গেল। ছিঃ ছিঃ, মূঢ় তাহারা—এতক্ষণ কি বাচালতাই এখানে করিতেছিল?

ক্ষণপরে সনাতনের মাথায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিল। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ডাকব? কেবলবাবুর বোন জল নিতে এসে ফিরে যাচ্ছে, ঐ ত্যাখ।"

আদিত্য গলা বাড়াইয়া দেখিল। নিরঞ্জনের কিন্তু দর্শন ব্যাপারে

কুণ্ঠাই পূর্ণ মাত্রায় ছিল, কৌতূহল আদৌ ছিল না। সে আর চাহিল না, শুধু আরক্ত মুখে অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমাদের দৌরাত্ম্যে কেউ ঘাটে আসতে পায় না—এ ভারি অত্যাচার কিন্তু।"

"দাঁড়া, ডাক্‌ছি ওকে" বলিয়া বিচলিত নিরঞ্জনকে একটি কথা কহিবার অবকাশ না দিয়া, আদিত্য নিতান্ত সহজভাবে, কোমলতা-লেশ-বর্জ্জিত পরুষ কণ্ঠে ডাকিল, "ওগো লক্ষ্মি ফিরে এস, জল নিয়ে যাও।"

নিরঞ্জনের মনের মধ্যে দৃপ্ত বিদ্রোহিতা সবেগে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। কিন্তু কেন—নিরঞ্জন তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। অতিকষ্টে আত্মদমন করিয়া, ঘাটের এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া নতমুখে গামছা নিংড়াইতে লাগিল। তাহার ললাটের শিরাগুলা স্ফীত হইয়া উঠিল।

আদিত্যের আহ্বানে মায়ার সর্ব্ব শরীরের অস্থি মজ্জার ভিতর একটা কুণ্ঠা-ক্ষুব্ধ কম্পন-ঝঞ্ঝা তীব্র বেগে বহিয়া গেল। ফিরিতে হইবে! কি ভয়ানক, ওখানে নিরঞ্জন রহিয়াছেন যে!

কিন্তু এ আহ্বান উপেক্ষা করিলে আরও অশোভন নির্লজ্জতা প্রকাশ হইবে না কি? ইঁহাদের সকলকে অপমান করা হইবে না কি? মায়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

আবার আহ্বান আসিল! এবার সনাতন ডাকিল, "এস জল নিয়ে যাও, আমরা সরে দাঁড়াচ্ছি।"

মায়া কঠিন বিপদে পড়িল। তাহার নবনীমার্জ্জিত শুভ্র কোমল ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম ফুটিয়া উঠিল। ছি ছি, ইঁহারা নিশ্চয়ই

বুঝিয়াছেন, মায়া এতক্ষণ অন্তরালে লুকাইয়া—তাঁহাদের নিরঙ্কুশ কৌতুক-চাপল্য উচ্ছ্বসিত আমোদ-রঙ্গ লক্ষ্য করিয়াছে। ইহাঁরা—বিশেষতঃ নিরঞ্জনদেব, মায়ার সে নির্ব্বুদ্ধিতায় কি মনে করিলেন!

কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর ক্ষালনের উপায় নাই। আর অপরাধের মাত্রা বাড়ান কেন? মায়া কম্পিত পদে ফিরিল। কাহারও পানে চক্ষু তুলিয়া চাহিবার সাহস ছিল না, তবুও অনিচ্ছুক দৃষ্টি চকিত গোপন কটাক্ষে—নিমেষের জন্য সকলকে দেখিয়া লইল। নিরঞ্জন অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কি দেখিতেছেন, কিন্তু সনাতন ও আদিত্য—ছিঃ, পরিষ্কার ধৃষ্টতায় অসভ্যের মত, তাহার দিকে চাহিয়া আছে—কিন্তু উপায় নাই। আত্মদমন করিয়া ত্রস্ত কুণ্ঠিত চরণে সোপান অবতরণ করিয়া মায়া জলে নামিল। হায়, জল লইবে কি? একি জল!—এ যে পঙ্কিল মৃত্তিকা মিশ্রিত অস্পৃশ্য পদার্থ।

বিব্রত মায়া ঘড়ার আঘাতে ঠেলিয়া জল ঢেউয়াইতে লাগিল, কিন্তু সমস্ত জলই কর্দ্দমাক্ত। ক্ষুব্ধ নিরুপায় দৃষ্টিতে, একবার দূরের জলের দিকে চাহিল। হাঁ, সে জল পরিষ্কার—কিন্তু আনিবে কে? সে যে দূরে!

মায়া যে অত্যন্তই বিপদে পড়িয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিল। সনাতন গম্ভীর ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিল, "এ জল বড়ই গুলিয়ে গেছে, নেওয়া চল্‌বে না ত।"

আদিত্য খপ্ করিয়া প্রশ্ন করিল, "কি করে জল নেবে?"

এ কথার উত্তর যদি মায়ার আয়ত্তের মধ্যে থাকিত, তাহা হইলে আদিত্যর পক্ষে প্রশ্ন করিবার সুযোগ ঘটিত না। মৃদু-দংশিত অধরে, নীরবে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়া মায়া বিপন্ন ভাবে মাথা নাড়িল। সে

মস্তকান্দোলন এত মৃদু, এত ক্ষণস্থায়ী, যে তাহার অর্থ 'হাঁ' কি 'না' কিছুই বুঝা গেল না। সনাতন সবিস্ময়ে বলিল, "জল নেবে না ?"

আদিত্য ততোধিক বিস্ময়ে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "অম্নি ফিরে যাবে ?"

এবার নিরঞ্জন ফিরিয়া চাহিল। সঙ্গীদের কৌতুক-চপল কটাক্ষ সঞ্চরণ দেখিয়া, নিমেষ মধ্যে ক্ষোভে বেদনায় তাহার অন্তরাত্মা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। নত নয়নে চাহিয়া ধীর স্বরে বলিল, "ঘড়াটা আমায় দিন, আমি দূর থেকে জল এনে দিচ্ছি।"

নিরঞ্জনের কথায় লজ্জায় মায়ার সর্ব্বশরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল, কিন্তু অসম্মতি জানাইবার সামর্থ্যও তাহার তখন ছিল না। সে নিরঞ্জনকে জলে নামিতে দেখিয়া, কম্পিত হস্তে ঘড়াটা ছাড়িয়া দিল। নিরঞ্জন ঘড়া লইয়া সাঁতার কাটিয়া, দূর জলে চলিল।

তাহার এই অভাবনীয় আচরণে সনাতন ও আদিত্য প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া গেল। অলক্ষিতে পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করিয়া অর্থসূচক ভঙ্গীতে দুজনেই নিঃশব্দে একটু হাসিল। তাহারা বুঝিয়াছে যে, তাহাদের অতি সম্ভ্রমশীল বন্ধু, এমন করিয়া লজ্জা-সঙ্কোচ এড়াইয়া তরুণীর সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল নিজে—শুধু তাহাদের অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য। তবু তাহারা ব্যাপারটার বিপরীত দিক্ হইতে, কাল্পনিক রহস্য আবিষ্কার করিয়া—খোঁচা দিয়া কৌতুক করিতে ছাড়িবে কেন ? মায়া চকিত দৃষ্টিতে ইহাদের সাঙ্কেতিক অভিনয় দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। লজ্জায় অপমানে তাহার হাড়ের ভিতরকার মজ্জাগুলা শুদ্ধ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল।

নিরঞ্জন দূরের পরিষ্কার জলে ঘড়া ভর্ত্তি করিয়া—কৌশলে অপরিষ্কার জল হইতে ঘড়া বাঁচাইয়া, সাঁতার কাটিয়া ফিরিয়া আসিল। জল হইতে ঘড়া তুলিয়া, মায়ার সাম্‌নে নামাইয়া দিয়া—সরিয়া গামছা নিংড়াইয়া গায়ের জল মুছিতে লাগিল। সঙ্গীদের মুখ পানে চাহিল না, কি জানি যদি আত্মসম্বরণে অক্ষম হইয়া পড়ে।

আদিত্য দাঁতে অধরোষ্ঠ চাপিয়া বিপুল গাম্ভীর্য্যের ভাণে গোঁফ চুমরাইতে চুমরাইতে সিঁড়ির উপর পাদচারণা করিতে লাগিল, আর সনাতন স্পষ্টতঃ হাসি চাপিবার ছলে কাশিতে কাশিতে অধীর হইয়া উঠিল। তাহাদের অসহনীয় ধৃষ্টতা দেখিয়া, নিরঞ্জনের ধৈর্য্য অসম্বরণীয় হইয়া উঠিল।

দুর্লক্ষণ দেখিয়া কুণ্ঠাহত মায়া, তাহার সলজ্জ-কৃতজ্ঞ দৃষ্টি, প্রাণপণে সংযত করিয়া, নত মস্তকে জলপূর্ণ কলস লইয়া সোপান বহিয়া উপরে উঠিল। নিজের উপর তখন তাহার অসহ্য ক্ষোভের উদয় হইতেছিল, কেন সে ইহাদের লক্ষ্মীছাড়া অভিনয় দেখিতে এখানে দাঁড়াইয়াছিল—কেন সে ইহাদের নিকট নিজেকে এমন নির্ম্মমভাবে ধরাইয়া দিল?

মায়া অদৃশ্য হইল। নিরঞ্জন সিঁড়িতে উঠিয়া কাপড় নিংড়াইতে লাগিল, রোষোত্তাপে তাহার মস্তিষ্ক তখন ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছিল—ইহাদের ব্যবহার ক্ষমা করিতে আজ সে মোটেই প্রস্তুত নয়।

মায়াকে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিপথাতীত দেখিয়া সনাতন বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "ভাই আদিত্য, দেশ-কাল-পাত্রভেদে, অযাচিত সহৃদয়তা জিনিসটা খুব চমৎকার ভাবব্যঞ্জক হ'য়ে দাঁড়ায়, না?"

আদিত্য উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, "ওঃ! খুব খুব।"

তাহার হাসি থামিতে না থামিতে মর্ম্মান্তিক ক্রোধে, উগ্রকণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল, "তোমাদের যদি এতটুকু আত্মসম্মান বোধ থাকৃত, তাহ'লে মানুষ বলে মান্‌তুম, উপযুক্ত উত্তর দিতুম, কিন্তু—" নিরঞ্জন আর কথাটা শেষ করিবার জন্য অপেক্ষা করিল না, দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সনাতন মনে ঈষৎ উদ্বিগ্নতা অনুভব করিল। বাস্তবিক নিরঞ্জন যে এতটা চটিয়া যাইবে, সেটা তাহারা আদৌ কল্পনা করে নাই কারণে-অকারণে অনাবশ্যক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে পরস্পরকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তোলাই তাহাদের অভ্যস্ত কৌতুক; তাহারা মিথ্যা-রহস্যের জন্য-ই তুচ্ছ সূত্রকে টানিয়া রহস্য জাল বুনে, তাহারা ত' সত্য বলিয়া কিছু মনে করে নাই; তবে কেন আজ এই সামান্য পরিহাসটুকু নিরঞ্জন এত নিগূঢ় অধৈর্য্যভাবে সহিত গ্রহণ করিল?

সনাতন স্পষ্ট বুঝিল—মিথ্যা হইলেও রহস্য-ব্যপদেশে মায়ার প্রতি কটাক্ষপাত করা তাহাদের পক্ষে বিসদৃশ ধৃষ্টতা হইয়াছে; সেই জন্যই চিরক্ষমাশীল সহৃদয় নিরঞ্জন, আজ অকস্মাৎ তাহাদের তীব্রভাবে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে যে—সে সম্মান-স্বাতন্ত্র্যের গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া অবাধে তাহাদের সহিত মিশিয়া চলিলেও, প্রকৃত পক্ষে—সকল ব্যাপারেই—শক্তি-সামর্থ্যে সে তাহাদের ঊর্দ্ধতন।

লজ্জার ধাক্কা সামলাইবার জন্য, আদিত্য নিশ্চিন্তমুখে নির্লজ্জ হাসি হাসিতেছিল। সনাতন কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া—অসন্তোষের সহিত মাথা নাড়িয়া বলিল, "না আদিত্য আর হাসিস্ না।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

অব্যক্ত ক্ষোভ-অভিমানের নিঃশব্দ লাঞ্ছনায়—মায়ার মনটা অত্যন্তই উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বাড়ীতে আসিয়া জলের ঘড়াটা রান্নাঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া, সে একটু ত্রস্ততার সহিত শয়নকক্ষের দিকে চলিল। রান্নাঘরে তখন বৌদিদি ও দিদিমা আসিয়াছিলেন, হৃষীকেশ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। মায়া বিনাবাক্যে জলের ঘড়া রাখিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া, বৌদিদি ঈষৎ হাসির সহিত বলিলেন, "দেখলেন দিদিমা, মায়া ঠাকুঝি ভাল গিন্নিপণা শিখেছে, আপনার নাতজামাইকে কিছু দেখতে শুনতে হবে না।"

ভৎসনা-করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দিদিমা মৃদুস্বরে বলিলেন, "এই দুপুরবেলা তাড়াতাড়ি জল আনতে যাবার কি দরকার ছিল? খাবার জল ছিল—রান্নাটা না হয় আজকের মত ডোবার জলেই করতুম, বিকেলে জলটা আনতুম।"

মায়া শুষ্ক হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল, কোন উত্তর দিল না। সকৌতুক ও আদিত্যের সেই হাসি, তাহার মনে তখন দুঃসহ লজ্জা ও অপমানে তীক্ষ্ণ-শান দিতেছিল। ক্ষুব্ধ উত্তেজনায় তাহার মন নিরঞ্জনকেই শুধু একমাত্র অপরাধী স্থির করিতেছিল। নিরঞ্জন মায়াকে সাহায্যের ঋণ স্বীকারে বাধ্য করাইয়া তাহাকে যথার্থই অপমান করিয়াছে।

মায়া ঘরে আসিয়া বসিয়া পড়িল। একমাত্র নিজের উপর ছাড়া,

জীবনে সে কোন দিন কাহারও উপর রাগ করে নাই—কিন্তু আজ নিরঞ্জনের উপর রাগ না করিয়া সে থাকিতে পারিল না। মায়ার চতুর্দ্দিকে যেন গোলকধাঁধার পাকচক্র বাঁধিয়া গিয়াছিল, কোন কিছুই যেন সে আয়ত্তের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। তীব্র অধীরতায় উদ্ধত অশান্তি-পীড়িত চিত্তে মায়া নিজের মধ্যে নিজেকে বার বার ব্যাকুল প্রশ্ন করিতে লাগিল। "নিরঞ্জন কেন এ কাজটুকু করিতে অগ্রসর হইয়াছিল? কেহ ত তাহাকে ডাকে নাই।"

স্তব্ধ-নিঝুম চিন্তামগ্না মায়া—হঠাৎ এক সময় নিজের মধ্যেই তীব্র চমকে শঙ্কিত হইয়া উঠিল। না না—এ কি ভ্রান্তি তাহার? এ কি কাল্পনিক দৌর্ব্বল্য বেদনার প্রভাবে সে আপনাকে আচ্ছন্ন-অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে? সত্যই ত—নিরঞ্জনের সহিত তাহার সম্পর্ক কি? দূর হউক, ও সব ক্ষুদ্র দৌর্ব্বল্য অবজ্ঞার ভ্রূকুটি পীড়নে বিতাড়িত করাই তাহার একান্ত কর্ত্তব্য। পৃথিবীর সম্মুখে—অক্ষম, অসহায়, দীন সে, দীনের মত নীরবে নতশিরে দিন যাপন করাই তাহার একমাত্র কাজ। ও সকল চিন্তায় তাহার অধিকার নাই, সে অক্ষম।

আহারান্তে দিদিমা ও বৌদিদি, শান্তি দিদির সহিত বিবাহ সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাটীতে চলিয়া গেলেন। মায়া একাকিনী নির্জ্জন শয়নকক্ষে আসিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পাতা উল্টাইতে লাগিল, কিন্তু মুগ্ধবোধের একটি বর্ণও আজ তাহার বোধগম্য হইল না। অজ্ঞাত বিদ্রোহী উত্তেজনায় তাহার সমস্ত চিত্ত অধীর বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, মায়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

হয়, সে ত আত্মপ্রবঞ্চনার দ্বারা আপনাকে জিতাইবার জন্য, নিরঞ্জনের অপরাধী আচরণের আংশিক ত্রুটি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া সযত্নে ঘসিয়া মাজিয়া উজ্জল করিয়া দেখিতে চায়—কিন্তু অলক্ষিতে নিরঞ্জনের সমগ্র স্বভাবের মহত্ব সৌন্দর্য্য বিজলী দীপ্তিতে ঝলমল করিয়া, তাহার মনের উপর নন্দন সৌরভের মুগ্ধ মোহাবেশ বিস্তার করে যে। সে কেমন করিয়া ইহাকে ঠেকাইয়া রাখে ?

মায়া মুগ্ধবোধ বন্ধ করিয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিল—এ কি হইল !

ধীরে মনে পড়িল—কৌতুক চপল সঙ্গীগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ নিরঞ্জন, যখন সেই তুচ্ছ কবিতা আবৃত্তি করিতেছিল, তখন কি সুমিষ্ট মনোরম মুগ্ধতাই তাহার তুচ্ছতাকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। সে কি অপরূপ সৌন্দর্য্য !

মায়া নিঝুম হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর হঠাৎ তীব্রবেগে ক্ষিপ্তবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। না না—এ সকল কি পাগলামী তাহার। ও সব ভুল—অলীক চিন্তাকে মনে স্থান দিবার অবসর তাহার নাই ! নিরঞ্জন তাহার সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, সে শত্রু !

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"আঃ কচ্ছিস কি নিরুদা—আজ এমন কাজের খেই হারাচ্ছিস কেন ভাই ?"

"বাহবা সন্তুদা, নিরঞ্জনের কাজের ভুল ধরছ, 'আঁ—কি ভূত, মুই !' কেমন ?" আদিত্য উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

চিন্তামগ্ন নিরঞ্জন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া বস্ত্র চালাইতেছিল, সঙ্গীদের পরিহাসে চমকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিয়া, অপ্রস্তুত ভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কি বল দেখি ?"

"বলছি অমন জোর-তলবে তুরীয় অবস্থায় সমাধিস্থ হলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতটার যে মহা বিশৃঙ্খলা বেধে ওঠে। চতুর্বর্গ তো আছেই, আপাততঃ একটু সচেতন হয়ে—"

উদ্বিগ্ন-দৃষ্টিতে চাহিয়া নিরঞ্জন বলিল, "কি করতে হবে বল দেখি।"

"ভ্রম সংশোধন।" দেখ দেখি এখানে মাথামুণ্ড এ কি সব হিজিবিজি কেটেছ।"

"তাই ত !" নিরঞ্জন স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিল, সে এতগুলো ভুল করিয়া ফেলিয়াছে, কিছুই ঠাহর করে নাই !

আদিত্য ডাকিল, "ওরে ভাই নিরঞ্জন দেখ তো এটা এমনি হবে না ?"

নিরঞ্জন সরিয়া আসিয়া মূঢ়ের মত ভাবহীন দৃষ্টিতে দুই মুহূর্ত্ত জিজ্ঞাস্য বিষয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর নিরুপায়ভাবে স্খলিত কণ্ঠে বলিল, "তাই হোক।"

"এ রেখাটা ডাইনে টান্‌ব ?"

"তাই টান" নিরঞ্জন চিন্তাকুল দৃষ্টিতে মুখ ফিরাইল। সনাতন হাতের যন্ত্র ফেলিয়া অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের মুখপানে তাকাইতেছিল। তাহার শেষ কথা শুনিয়া সবিদ্রূপে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, "বা—বা ওস্তাদ, বেশ বলেছ।"

নিরঞ্জন চমকিয়া চাহিল। সবিস্ময়ে বলিল, "কেন কি হয়েছে ?"

"ঐ রেখা ডাইনে হয় ? ও যে বাঁয়ে, দেখ দেখি ঐটে।"

"ওঃ তা হ'লে ভুল হয়েছে, আচ্ছা বাঁ দিক থেকে টান ভাই। বাঃ সনাতন যে জোরে হাসিস্, আচম্‌কা কানে ভারি লাগে।" উৎকণ্ঠিতভাবে তাড়াতাড়ি আসিয়া নিরঞ্জন নিজের যন্ত্র তুলিয়া লইল; আবার যন্ত্র ফেলিয়া অসহিষ্ণু ভাবে এটা ওটা সেটা লইয়া নাড়া চাড়া করিল—কি করিতে হইবে ভাবিয়া পাইল না।

"নিরু দা !"

"আঃ কি যে বকিস্ রাতদিন, থাম্।"

"তুমিই ত ভাই কাল রাত্তিরে নিজে আগে কথা কয়েছ।"

"ঝকমারী হয়েছে, থাম, এগুলো আগে গুছিয়ে তুলি।" ভিত্তিগাত্রস্থ সদ্য অঙ্কিত নক্সাগুলি উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে সহসা সাবেগে নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল, "না সনাতন, এ চল্‌বে না, কিছুতেই চল্‌বে না।"

আদিত্য মুখ ফিরাইয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "কেন ওদের পায়ে কি পক্ষাঘাত হয়েছে?"

অধীর হইয়া নিরঞ্জন বলিল, "না না ঠাট্টা নয়। আমার হাতের কাজ—আমারই পছন্দ হচ্ছে না, তা অন্যের কথা—সব মাটী হয়ে গেছে। সনাতন, আজ ছুটির পর আমি ফের দো-কর খাটব, সব শুধ্‌রে নেব।"

"আর নে। ওতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।"

"কিন্তু আমার মনই বা শুদ্ধ হয় কৈ" নিরঞ্জন থামিয়া গেল তাহার হাতের মশ হাতেই রহিয়া গেল, সে শুধু উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে নক্সাগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

গত কল্য রাত্রে একজন কীর্ত্তন-ভক্ত ভাটিয়া বণিক, সদলবলে খোল করতাল লইয়া ঠাকুরবাড়ীতে কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছিলেন, কীর্ত্তনের আনন্দে কিরূপ লম্ফঝম্ফে তিনি প্রচুর নৃত্য করিয়াছিলেন কেমন করিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গনে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন—কিরূপ উন্মত্তভাবে সকলকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, আদিত্য তাহাই বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী শ্রমজীবিকে শুনাইতেছিল। মাঝে মাঝে হাতের কাজ বন্ধ করিয়া যথাবিহিত অঙ্গভঙ্গী যোগ দিতেও ছাড়িতেছিল না, শ্রমজীবিটা হাসিতেছিল। সনাতনও তাহাদের সহিত যোগ দিল, তাহাদের খুব হাসি চলিতে লাগিল। তাহাদের হাসির তোড়ে নিরঞ্জনের কান ঝালাপালা হইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তবু সে তাহাদের কথায় মনোনিবেশ করিতে পারিল না। নীরবে ভাবিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া চাহিল। আঃ ইহারা আছে বেশ! হাল্কা হাসির তোড়ে জীবনের যত কিছু ভার—দিব্য ভাসাইয়া বড় সুখে উজানে বাহিয়া চলিয়াছে। কোনখানে দ্বিধা-সঙ্কোচ নাই, দিব্য সরল আনন্দময় স্বচ্ছ সুন্দর জীবন। আহা হোক হোক, উহাদের জীবন ঐরূপ স্বচ্ছলতার মধ্যেই সানন্দে বহিয়া যাক।

নিরঞ্জন সকরুণ চল্ ছল্ নয়নে তাহাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আদিত্য দেখিল, নিরঞ্জন কাজ ফেলিয়া তাহার অভিনয় দক্ষতায় মুগ্ধ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। সে উৎসাহিত হইয়া উঠিল, তুমুল আস্ফালনে হস্ত পদ ছুড়িয়া সুনিপুণ চাতুর্য্যে, কীর্ত্তন-কৌশল দেখাইতে লাগিল। উপস্থিত দর্শকগণ 'হো হো' করিয়া উচ্চ শব্দে হাসিয়া উঠিল। নিরঞ্জন তাহাদের সহিত যোগ দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অকস্মাৎ অজ্ঞাত বেদনার লৌহ কঠিন কর নিষ্পেষণে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, হাসিতে গিয়া অজ্ঞাতে যেন ফোঁপাইয়া চমকিয়া উঠিল। দীর্ঘ নিশ্বাসে ত্রস্তে আত্মসম্বরণ করিয়া, মুখ ফিরাইয়া হেঁট হইয়া বসিল।

না না—ইহাদের সহিত সে আর ভিড়িতে পারিবে না। আর এদিকে ঘেঁসিবার সাধ্য তাহার নাই, এ মিলন আনন্দের মধ্যে, তাহার জন্য স্থান নাই, তাহার পথে পড়িয়া গিয়াছে—এক মস্ত পূর্ণচ্ছেদ। তাহাকে লঙ্ঘন করা অসাধ্য, বুঝি লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা-চিন্তাও ততোধিক অসহ্য।

নিরঞ্জনকে মুখ ফিরাইতে দেখিয়া সনাতন আদিত্যকে ইঙ্গিত

করিয়া হাসিল—নিরঞ্জন কুৎসা শুনিয়া চটিয়া গিয়াছে। আদিত্য ডাকিল, "নিরঞ্জনদা!"

বিষণ্ণমুখে নিরঞ্জন আবার নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর দিল, "কেন ভাই?"

না নিরঞ্জন তো রুষ্ট হয় নাই, তবে? আদিত্য একটু বিস্মিত হইল, হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা ভাই এ সব ভণ্ডামী, ন্যাকামী দেখলে হাসি পায় না?"

নিরঞ্জন সজোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। ভণ্ডামী—ন্যাকামী! ব্যথিত-ভাবে চাহিয়া বলিল, "কোথা?"

"ঐ ভাটিয়া মহাজনের ব্যাটা এমনি কসাই সুদখোর, যে এই সব গরীবের গলায় পা দিয়ে কড়া ক্রান্তি গুণে সুদ আদায় করে, এদিকে পঞ্চাশে ঘা দিয়ে এলেন, কিন্তু এখনও মুসলমান বাইজী—"

"আঃ!" নিরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল। অসহিষ্ণুভাবে বলিল, "অত বাজে কথা ক'স্ কেন?"

"শোন্ না, তুই যে বলিস্ যে তোরা কুচ্ছ করিস্, আচ্ছা দেখ দেখি ভাই—"

নিরঞ্জন মাথা নাড়িল, সে কিছুই দেখিতে চাহে না। বিষণ্ণ ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল, "সাচ্চা ভণ্ড বাইরের নজর দিয়ে বিচার করিস্ নি ভাই, সে বিচার ভুল। মানুষের মনে এক নিমেষে যুগযুগান্তের পরিবর্ত্তন এসে পড়ে। ভুল? সেও এক নিমেষের ওয়াস্তা।"

সহসা নিরঞ্জন নিজের অজ্ঞাতে ত্রস্ত-চমক খাইয়া থামিয়া পড়িল। ব্যাকুল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া রহিল। না না, ইহাদের সহিত তাহার আর বনিবনাও হইবে না, ইহাদের ভাষার

সহিত তাহার ভাষার আর খাপ খাইতেছে না, মনের ভাবের মধ্যে সুদূর পার্থক্য আসিয়া পড়িয়াছে। সে ইহাদের বুঝিতেছে না—ইহারাও বোধ হয় তাহাকে ঝাপসা দেখিতেছে। দূর হউক—আর জোর করিয়া খাপ খাইবার চেষ্টা ভুল।

ছুটির পর নিরঞ্জন অথিতিশালায় আসিয়া সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিতেছে, আদিত্য ও সনাতন তখন উপর হইতে নামিয়া আসিতেছিল, নিরঞ্জনকে দেখিয়া বলিল, "বেড়াতে যাবি কন্দর্প ?"

কন্দর্প !—নিরঞ্জন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, কথাটা কানে বড় বিষম অদ্ভুত শুনাইল। নিজের অজ্ঞাতে, বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আবার ? এখনো কন্দর্প ?"

আদিত্য হাসিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "তবে কি শিবত্ব চাও, কিন্তু সে তোমার ধাতে সইবে কি ?"

নিরঞ্জন নীরব দৃষ্টিতে তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ তাহার যেন বাক্‌শক্তি লোপ হইয়া গিয়াছিল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সনাতন একটু হাসিয়া আদিত্যকে বলিল, "কেন ?"

"ওর প্রকৃতিটা যে অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে ধীরোদাত্ত নায়ক গোছের। ওর মধ্যে না আছে মড়ার খুলিতে সিদ্ধিপানের ক্ষমতা, না আছে সতীশোকে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংসের তেজস্বিতা।"

সনাতন বলিল, "কিন্তু তপশ্চর্য্যায় সমাধি লাভের উৎসাহটা জোর তালে আছে, তার আর ভুল নাই।"

আদিত্য অর্থ-সূচক হাস্যে বলিল, "কিন্তু উন্মত্ত মহেশের তপশ্চর্য্যার ফল কি জানিস তো ? পর্ব্বত-রাজ-দুহিতা—"

নিরঞ্জন অসহিষ্ণু ভাবে দ্রুতপদে পাশ কাটাইয়া উপরে উঠিয়া গেল ঘর খুলিয়া, যন্ত্রগুলা বাক্সর উপরে ফেলিয়া, সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া পড়িল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আদিত্য ও সনাতন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কাজ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। নিরঞ্জনের জন্য আজ তাহারা এক মুহূর্ত্তও অপেক্ষা করে নাই, কারণ সহরের অন্য প্রান্তে কোথায় একদল মহারাষ্ট্রীয় পাত্রা অভিনয় করিতেছে, অতিথিশালার সাধুসন্ন্যাসীগণ সকলেই সেখানে ভগবানের নাম গান শুনিতে যাইবে, সুতরাং তাহারা দুইজনেও তাড়াতাড়ি হুজুক দেখিতে বাহির হইয়াছে। আজ রাত্রে তাহাদের বাসায় ফিরিবার সম্ভাবনা নাই।

মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে আর অল্পমাত্র কাজ বাকী আছে। মঠের অন্যত্রও অল্প-স্বল্প কাজ আছে কিন্তু তাহা শ্রমসাধ্য নহে, মোটামুটি চিত্র। মলমন্দিরের এই অংশেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সূক্ষ্ম-শিল্প উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

বুকে হাঁটু দিয়া বসিয়া, ঘাড় গুঁজিয়া নিরঞ্জন কাজ করিতেছিল। সম্মুখে মোমবাতির উজ্জ্বল আলো। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, একথা—অনেকে অনেকবার তাহাকে জানাইয়া গিয়াছে, অতিরিক্ত পুরস্কারের আশায় অতিরিক্ত খাটুনী খাটিলেও পুরস্কারের ফল অনিশ্চিত—একথাও কেহ কেহ তাহাকে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছে, কিন্তু নিরঞ্জনের কোনকিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সে খাটিতেছে—শুধু অবিশ্রাম খাটিতেছে।

আরতি হইয়া গিয়াছে, দর্শনার্থীরা চলিয়া গিয়াছে, এদিকে আর গোলমাল নাই। পাশে ভোগবাড়ীতে কর্ম্মব্যস্ত পরিচারিকাগণের

তীক্ষ্ণ-উচ্চকণ্ঠের অসন্তোষমূলক চীৎকার-ঝঞ্ঝনা মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে। অদূরে পরিচারকগণ কেহ কেহ কর্ম্মব্যপদেশে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, কিন্তু তাহাদের মুখে অনাবশ্যক কলরব ছিল না।

প্রাতঃকাল হইতে আসিয়া, আজ নিরঞ্জন সমানে কাজ করিতেছে, দুইবার মাত্র আহারের সময় উঠিয়াছিল তারপর আর নয়। কাজ কাজ, কাজ—আজ তাহার এতটুকু বিশ্রাম নাই। সঙ্গীরা কত রকমে তাহাকে নিরস্ত করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু নিরঞ্জন গ্রাহ্য করে নাই; এক একবার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চিন্তাকুল বদনে শুধু উত্তর দিয়াছে —আজিকার এই মুহূর্ত্তগুলা কাল ফিরিয়া পাইব না, এগুলা আজ কাজে খাটাইয়া লই, তারপর অন্য কথা।

মৌননির্জ্জনতার মাঝে নিরঞ্জন একমনে নীরবে কাজ করিতেছে। আজ তাহার কাজে বাধা দিবার, চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাইবার, কেহ কোথাও নাই। এখন সে নির্জ্জনে, নিঃসঙ্গী—কিন্তু এ সঙ্গীহীনতা তাহার ক্লেশকর নয়। কর্ম্ম তাহার সম্মুখে—নিরঞ্জন নিশ্চিন্ত, আর কোন সঙ্গীর প্রয়োজন নাই।

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দূর হইতে অপরিচিতকণ্ঠে কে ডাকিল, "কে ওখানে? সর্দ্দার ভাস্কর!"

নিরঞ্জন চমকিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিল। এ নীরবতার মাঝে কোন রব ভাল লাগে না। সৌজন্যের অনুরোধে আত্মদমন করিয়া উত্তর দিল, "আজ্ঞে হাঁ, আপনি?"

উত্তর আসিল, "আমি সোমচাঁদ ভট্ট।"

ব্যস্তহাতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিরঞ্জন বলিল, "নমস্কার, আসুন।"

গৈরিক আলখাল্লা পরিহিত বিশাল দীর্ঘাকার প্রৌঢ় পরিব্রাজক সোমচাঁদ ভট্ট সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভট্ট ইতস্ততঃ চাহিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "তুমি একলা এখানে কাজ করছ? তোমার সঙ্গীরা সবাই চলে গেছে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" কম্পিত স্বরে নিরঞ্জন উত্তর দিল, "সবাই চলে গেছে।"

ভট্ট পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, "তুমি যাওনি কেন?"

কণ্ঠ ঝাড়িয়া পরিষ্কার স্বরে নিরঞ্জন উত্তর দিল, "আমার কাজ বাকি ছিল।"

"কোথায়?" ভট্ট নিরঞ্জনের মুখপানে প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। নিরঞ্জন তাহাতে শিহরিল! সত্যই ত সে কাজ কোথায় বাকী ছিল। এই নিরেট নিশ্চল পাষাণভিত্তির বুকের উপর—না, তাহার রক্ত-মাংস গঠিত মানবীয় বুকের অভ্যন্তরে। নিরঞ্জনের দৃষ্টি নত হইল, মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "এইখানেই।"

দূরে আরও কয়জন লোক কথা কহিতে কহিতে চলিয়া যাইতেছিলেন, ইহাদের কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিয়া তাহাদের একজন কৌতূহলীভাবে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "ওখানে কারা রয়েছেন?"

ভট্ট উত্তর দিলেন, "আমি, সোমচাঁদ ভট্ট, আর সর্দ্দার ভাস্কর।"

দলের ভিতর হইতে জনৈক অল্পবয়স্ক যুবক রহস্যসূচক কণ্ঠে বলিলেন, "দুই ভাস্করে ওখানে কি করছেন?"

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাঁহারা মঠের কাছারীর আমলা—সকলেই অল্পবয়স্ক, তাঁহাদের মধ্যে তিন জন

জাতিতে মারাঠি, অপর দুইজন খাস মাদ্রাজী। ভট্ট তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমরা কি এতরাত্রি পর্য্যন্ত কাছারীতে ছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দুঃখের কথা কেন বলেন, কর্ত্তাদের হুকুম, অধিকারী মহারাজ পরশু মঠে আস্‌ছেন—এতরাত্রি অবধি তাই কাজ করছিলাম, এবার দেব-প্রণাম করে বাড়ী যাব।"

নিরঞ্জন যন্ত্র কুড়াইতেছিল, তাহার দিকে চাহিয়া একজন বলিল "সর্দ্দার কি এখনো কাজ করছিলে?"

দ্বিতীয়ব্যক্তি বলিল, "বাতি জেলে পাথর কাটা! সাবাস্ চোখ।"

তৃতীয়ব্যক্তি কহিল, "তোমার মত অমন ধৈর্য্য থাক্‌লে আমি জীবনে 'এক জন' হতে পারতাম।"

নিরঞ্জন নীরব। সোমচাঁদ ভট্ট পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সম্মুখের চিত্রগুলি অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া একজন মাদ্রাজী যুবক সঙ্গীর কাঁধের উপর ভর দিয়া, আনন্দোজ্জ্বল মুখে অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন, কথাটা ভট্টমহাশয়ের কানে গেল। যুবকের দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে তিনি কহিলেন, "তরুণ ভাস্করের গুরুকে ধন্যবাদ দাও। তিনি ভাগ্যবান্— তাঁর শিষ্য, শিষ্যের কর্ত্তব্য পূর্ণমাত্রায় পালন করে, গুরুর গৌরব রক্ষা করে গুরুদক্ষিণা দিয়েছে।"

"শিষ্যের কর্ত্তব্য পূর্ণমাত্রায় পালন।" অকস্মাৎ নিরঞ্জনের বুকের ভিতর যেন নিশ্বাস আটকাইয়া গেল, আহতনয়নে সে বক্তার মুখপানে চাহিল। হায়, এ প্রশংসা আজ তাহাকে সাফল্য, সৌভাগ্যের আনন্দে লজ্জিত করিল কৈ? এ যে শুধু আজ তাহাকে তীব্র বেদনায়

নিষ্পীড়িত করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া—ধীরে নিশ্বাস ছাড়িয়া, ম্লানহাস্য-রঞ্জিত বদনে বক্তার উদ্দেশে নমস্কার করিল। সকলের পানে চাহিয়া বিনীতসম্ভ্রমে প্রশ্ন করিল, "আপনারা সন্তুষ্ট হয়েছেন?"

একবাক্যে উত্তর হইল, "চমৎকার শিল্প উৎরাইয়াছে। মহারাজ আসুন, তোমার পরিশ্রমের যোগ্য পুরস্কার পাইবে।"

ক্ষীণহাস্যে নিরঞ্জন সৌজন্য জ্ঞাপন করিল। সোমচাঁদের পানে চাহিয়া বলিল, "কোথাও ত্রুটী থাকে, আপনি অনুগ্রহ করে উপদেশ দেন।"

সোমচাঁদ বিস্মিত হইলেন। অদ্ভুত শিষ্টাচার-জ্ঞান এই বিদেশী যুবার! সামান্য ভাস্কর জ্ঞানে একদিন তিনি ইহার প্রতিভা-গৌরব অবিশ্বাস করিয়া তীব্র অবজ্ঞায় উপহাস করিয়াছিলেন, সে কথা সকলেই জানে। তাহার পর অবশ্য ইহার কার্য্য-পরিচয় পাইয়া তিনি মনে মনে লজ্জিত হইয়াছিলেন, নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ সে লজ্জা কাহারও কাছে স্বীকার করিয়া লঘু হইতে পারেন নাই। তাঁহার নিশ্চয় ধারণা হইয়াছিল, যে তাঁহার সেই অবজ্ঞার উত্তরে—এই ভাস্করও মনে—তাঁহার প্রতি প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ পোষণ করিতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য—এ ব্যক্তি স্বচ্ছন্দে আজ সকলের সমক্ষে, অকুণ্ঠিত বিনয়ে তাঁহাকে সম্ভ্রমের অর্ঘ উপহার দিল।

আত্মাভিমানী সোমচাঁদের আত্মশ্লাঘাগর্ব্বে—অলক্ষিতে গূঢ় লজ্জা-বিকার বাজিল। দীননয়নে চাহিয়া ক্ষুণ্ণস্বরে তিনি বলিলেন, "তোমায় উৎসাহ দিতে পারি, কিন্তু উপদেশ দেওয়ার স্পর্দ্ধা রাখি না।"

একটু থামিয়া অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার এই সূক্ষ্ম-শিল্পের সৌন্দর্য্য অনুভব করতে অভিনিবেশের প্রয়োজন। আমরা সহজ দৃষ্টিতে মোটামুটি শিল্প এক নিমেষে বুঝে নিই, তাই এর পানে চাইলে হঠাৎ যেন 'হ-য-ব-র-ল' মনে হয়, কিন্তু যখন মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখি—তখন এর মর্ম্ম বুঝে, মন আনন্দে ভরে উঠে।"

কথাগুলি অত্যন্ত তুচ্ছ, অন্য সময় কতদিন কতবার কত লোকের মুখে নিরঞ্জন এই রকম কত কথা শুনিয়াছে, কিন্তু আজ সোমচাদ ভট্টের মুখে ঐ কয়টি কথা তাহার কাছে পরম শ্রদ্ধাবহ এবং আশ্চর্য্য সত্য বলিয়া প্রতীত হইল। ক্ষণেক স্তব্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, নিরঞ্জন শিরোনমন করিয়া বলিল, "রাত্রি হয়ে গেছে আজ তা'হলে বিদায়—"

আগন্তুক কর্ম্মচারীগণের একজন বলিলেন, "সর্দ্দার তুমি কি এখন যাত্রা শুনতে যাবে?"

ভূমি হইতে মোমবাতি উঠাইয়া নিরঞ্জন বলিল, "আজ্ঞে না।"

হঠাৎ তিনি সাগ্রহে বলিলেন, "ওহে দাঁড়াও একবার অপেক্ষা কর ভাই, আমি তোমার বাতিটা নিয়ে ঐ নক্সাটা দেখে নিই।"

তাঁহার আগ্রহান্বিত কণ্ঠস্বরে—সকলেই চকিত নয়নে নির্দ্দিষ্টলক্ষ্যে চাহিলেন। দেখিলেন পার্শ্বে ভিত্তির নিম্নার্দ্ধে কয়েক হস্ত স্থান জুড়িয়া, সে একটি সদ্য-উৎকীর্ণ সুদীর্ঘ চিত্র! এতক্ষণ নিরঞ্জনের ছায়া-অন্তরালে তাহা অদৃশ্য ছিল, নিরঞ্জনের হস্তস্থ আলোকরশ্মিসম্পাতে এতক্ষণে তাহা গোচরীভূত হইল।

প্রস্তাব-কারকের উক্তি শুনিয়া নিরঞ্জন সহসা বিচলিত হইয়া, মুহূর্তের জন্য ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি তুলিয়া—বক্তার বদনের মধ্যে কি-যেন কিসের অনুসন্ধান করিল। তারপর ব্যথিতভাবে নৈরাশ্যব্যঞ্জক মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া, তাঁহার হাতে বাতি দিয়া নীরবে সরিয়া দাঁড়াইল।

সোমচাঁদ ভট্টকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আলোক লইয়া সকলে চিত্র সমীপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই নির্ব্বাক ভাবে, বিস্ময়মুগ্ধ নয়নে চিত্রের পানে চাহিয়া রহিলেন! বাহবা, কি সুন্দর দৃশ্যমাধুর্য্য, কি জীবন্ত ভাবলীলা! ভাস্কর শুভক্ষণে যন্ত্র হাতে করিয়াছিল। শুভক্ষণে দুশ্চর তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল, তাহার সাধনা সফল হইয়াছে!—একি মনোরম সুন্দর চিত্র।

মহাভারত অন্তর্গত কুরুবালকগণের অস্ত্র পরীক্ষার বিষয় লইয়া চিত্রটি বিরচিত হইয়াছে। পরীক্ষা সভার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য দর্শক, স্বাভাবিক দূরত্ব-নিবন্ধন তাহাদের আকৃতি অবস্থান-ভঙ্গীতে সুন্দর সামঞ্জস্য পূর্ণ, অস্পষ্টতার আভাস কৌশলে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। রঙ্গভূমির মধ্যস্থলে পরীক্ষার্থী রাজকুমারগণ, তাহাদের সকলের দৃষ্টি উৎসুক চঞ্চল—সকলের মুখভাব উত্তেজনাপূর্ণ। সকলের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া আছেন—অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য পরস্পর সম্মুখীন—ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন এবং সূতপুত্র কর্ণ।

গর্ব্বস্ফীত বক্ষের উপর পরস্পর বদ্ধ বাহুদ্বয় স্থাপন করিয়া রাজকুমার অর্জ্জুন উচ্চশিরে আভিজাত্য দম্ভে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার অধরে বিদ্রূপের হাসি—নয়নে তীব্র তাচ্ছল্য। সারথী-পুত্রের সহিত অস্ত্রপরীক্ষার

প্রতিযোগিতা ব্রজনন্দনের নিকট অগ্রাহ্য। অর্জ্জুনের ললাটে আত্ম-গরিমার প্রোজ্জ্বলদীপ্তি সগর্ব্বে ঝলসিয়া উঠিতেছে, রাধেয়নন্দন কি তাহার সমকক্ষ।

আর কর্ণ? তিনি অপমান-রক্ত চক্ষে কঠোর ভ্রূভঙ্গী করিয়া উন্নত গ্রীবায় দণ্ডায়মান। তাঁহার কটাক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইতেছে, অধর দন্ত নিষ্পীড়িত, ললাটে দর্পিত বীরত্ব ভাতি! সর্ব্বশরীরে পেশী স্ফীত, দক্ষিণ মুষ্টি অসিমূলে দৃঢ়বদ্ধ। জন্মগত নীচতা-ধিক্কারে অপমানাহত কর্ণ দর্পভরে বামহস্তের তর্জ্জনী উঁচাইয়া ক্রোধগম্ভীরভাবে প্রতিযোগী অর্জ্জুনের উদ্দেশ্যে কি যেন বলিতেছেন। চিত্রের পাদমূলে শুভ্রপ্রস্তরের বক্ষে সদ্যঃ-আহৃত শোণিতের মত উজ্জ্বল রক্ত-প্রস্তর সংযোগে, পরিষ্কার দেবনাগর অক্ষরে, খোদিত রহিয়াছে, "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মমায়ত্তং হি পৌরুষম্।"

বহুক্ষণ ধরিয়া নির্নিমেষ নয়নে সকলে চিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। ভাব-গাম্ভীর্য্যে সকলের মন অভিভূত হইয়া উঠিয়াছিল, কেহ কথা কহিতে পারিলেন না। শেষে বহুদর্শী বিজ্ঞ প্রবীণ ভাস্কর সোমচাঁদ, উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিলেন, "চমৎকার, চমৎকার!"

চতুর্দ্দিকের স্থির নিস্তব্ধতা যেন অকস্মাৎ চমক খাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। দর্শকগণ সমস্বরে তাঁহার প্রসন্ন মন্তব্যের অনুমোদন করিলেন, মুগ্ধ প্রশংসার স্রোত বহিতে লাগিল, ধন্য শিল্প, ধন্য—শিল্পী।

নিরঞ্জন অদূরে বক্ষোবদ্ধকরে দাঁড়াইয়া, ঊর্দ্ধমুখে একাগ্র স্থির নয়নে নক্ষত্রখচিত আকাশের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল। দর্শকগণের একজন তাহাকে বলিলেন, "ভাস্কর, এই চিত্র কি তুমি আজ শেষ করেছ?"

দৃষ্টি সংযত করিয়া ধীরভাবে নিরঞ্জন উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

তিনি পুনরায় ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিলেন, "এই চিত্র দেখেই কি আজ দেওয়ানজী—"

তাঁহার কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, নিরঞ্জন ঈষৎ অসহিষ্ণুভাবে গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কর্ম্মচারী মহাশয় থতমত খাইয়া সকলের মুখপানে চাহিলেন, কিন্তুতঃ করিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "দেওয়ানজী এই নক্সা দেখে বড় অসন্তুষ্ট হয়েছেন শুন্‌লাম।"

সোমচাঁদ ভট্ট রূঢ়স্বরে প্রশ্ন করিলেন, "কেন?"

কর্ম্মচারী মহাশয় নিম্নস্বরে বলিলেন, "পুরাণো নক্সা মেজেঘষে উঠিয়ে দিয়ে নূতন নক্সা আগাগোড়া তৈরি করায় খরচ বেশী।"

ওষ্ঠ আকুঞ্চনে, ঘৃণার হাসি হাসিয়া সোমচাঁদ ভট্ট বলিলেন, "এই জন্য! রক্ষা পেলুম! আগে এখানে কি ছিল?"

উত্তর হইল, "বিশ্বামিত্রের তপস্যাভঙ্গ।"

ভট্ট মহাশয় উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "খাসা!"

অপর্য্যাপ্ত কৌতুকে উৎসাহিত হইয়া সকলেই সে হাস্যে যোগ দিলেন। দেওয়ানজীর কথা লইয়া বেহিসাবী বচনবাজী নিম্নতন কর্ম্মচারীগণের পক্ষে অশোভনীয় বলিয়া, এতক্ষণ সকলে বাধ্য হইয়া চুপ করিয়াছিলেন। এইবার সুযোগ পাইয়া সকলের রসনা খুলিল, বিদ্রূপের স্বরে একজন বলিলেন, "গুরুদেব যে আমাদের বিশ্বামিত্রের চেলা।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্লেষের স্বরে বলিলেন, "স্বয়ং পরাশর।"

নিরঞ্জন অগ্রসর হইয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা করুন, অতিরিক্ত

ব্যয়বাহুল্যের জন্য—আমি যথার্থই অপরাধী। দেওয়ানজীর অসন্তোষ দোষাবহ নয়। প্রভুর কাজে তিনি ন্যায়সঙ্গত কর্ত্তব্যপালন করেছেন তবে আমার পক্ষে—" নিরঞ্জনের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল; ক্ষণেক থামিয়া পুনশ্চ বলিল, "শিল্পীর কর্ত্তব্য স্বতন্ত্র; আপাততঃ কারো সঙ্গে এ সম্বন্ধে তর্ক আলোচনায় আমি অক্ষম। তবে এটুকু জেনে রাখতে পারেন আজিকার পারিশ্রমিকের মূল্য, আমি মঠাধিকারীর তহবিল থেকে গ্রহণ করব না।"

উত্তেজিতভাবে সোমচাদ বলিলেন, "কেন গ্রহণ করবে না?"

স্থিরকণ্ঠে নিরঞ্জন উত্তর দিল, "আমি অন্যত্র পেয়েছি।"

সকলে একযোগে প্রশ্ন করিলেন, "কার কাছে?"

অবিচলিতভাবে নিরঞ্জন উত্তর দিল, "ক্ষমা করুন, এ প্রশ্নের উত্তরদানে আমি অক্ষম।"

এবার সকলে স্তব্ধ! সকলের দৃষ্টিতে বিস্ময় সম্ভ্রমের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই স্বল্পভাষী শিষ্টাচার-বিনয়ী, নম্রস্বভাব যুবার হৃদয়াভ্যন্তরে, এত তেজস্বিতা! সকলে নির্ব্বাক্!

সকলে বুঝিলেন, এ ব্যক্তির নিকট এসম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করা বৃথা। ক্ষণকালপরে কর্ম্মচারীগণের একজন বলিলেন, "আচ্ছা মহারাজ আসুন, তাঁর সিদ্ধান্ত সকলের উপর!"

আশ্বাসের স্বরে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "সে ত নিশ্চয়।"

নিরঞ্জন তথাপি নিরুত্তরে রহিয়াছে দেখিয়া, তৃতীয় ব্যক্তি তাহার উৎসাহ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবার অভিপ্রায়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন, "কিন্তু বাস্তবিক এ ছবিটির বাহার হয়েছে ভারি সুন্দর!"

বাহার! মূঢ় বেদনায় নিরঞ্জনের বক্ষঃ নিষ্পেষিত হইয়া গেল। একটি কথা উচ্চারণ করিতে পারিল না, ব্যথিতদৃষ্টিতে চিত্রের পানে চাহিয়া ক্ষুব্ধ-ম্লানভাবে একটু হাসিল। হায়, ইহারা দেখিতেছে শুধু বাহিরের বাহার।

অজ্ঞাতে তাহার দৃষ্টি চিত্রের পাদমূলে সংলগ্ন হইল। সহসা সতর্কতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া, একটা উষ্ণ নিশ্বাস বুকের ভিতর হইতে ঠেলিয়া উঠিল। —মমায়ত্তং হি পৌরুষম্!"

হায় কি বুঝিবে ইহারা—কি প্রলয়ঙ্কর সমস্যার, নিষ্করুণ মীমাংসা সমাধানের ইঙ্গিত ঐ চিত্রের মধ্যে। তাহার শোকাহত হৃদয়াবেগ আসন্ন-বেদনার সংশয়-দ্বন্দ্ব-পীড়িত আলোড়ন হইতে আপনাকে মরণান্তিক উদ্দ্যমে টানিয়া লইয়া কতখানি নিষ্ঠুর কঠোরতায় উদ্দৃপ্ত হইয়া, কতখানি আত্মহারা ব্যগ্রতায় ঐ বাণী পাষাণের বুকে দাগিয়াছে—তাহা সে জানে আর জানেন অন্তর্যামী!

চিত্রের সহিত হিসাবনিকাশ চুকাইয়া, সে নিজের জন্য একটা নির্দ্দিষ্ট পথ বাছিয়া লইয়াছে। নিষ্ফল বেদনার মনোরম স্বপ্নাবেশের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিবে! একলক্ষ্যে, অপ্রতিহত গতিতে চিত্তবৃত্তিকে ছুটাইয়া—জগতে শিল্পী-জীবনের উন্নত-আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত-সার্থক করিয়া লইবে, এই তাহার স্থির সঙ্কল্প! আজ হইতে তাহার বিরামের মধ্যে আরামের নির্ভর—একমাত্র ঐ-আশা, ঐ-আনন্দ! তাই সমস্ত প্রাণের সহিত, গভীর নিষ্ঠায় সে আত্মরক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে—"মমায়ত্তং হি পৌরুষম্।"

প্রাক্তনের ফলে, দৈববশে তাহার জীবনের শান্তিস্বচ্ছন্দতা, রাহুগ্রস্ত,

কিন্তু তবু—তবু, বাহিরের এই সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের সসীম সীমার উর্দ্ধে আত্মার দিক দিয়া, আয়ত্তের মধ্যে আছে তাহার পৌরুষ-শক্তি!

নির্ব্বাক্, নিষ্পলক দৃষ্টিতে চিত্রার্পিতের মত, নিরঞ্জনকে চিত্রের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, সকলে বিস্মিত হইলেন। আলোকধারী ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া বলিল, "ভাস্কর তোমার আলো নাও।"

"দেন।" চিত্রের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া, হস্ত প্রসারণ করিয়া নিরঞ্জন বাতি লইল। উজ্জ্বল দীপালোক-রশ্মি তাহার মুখাবয়বের উপর উদ্ভাসিত হইতেই, তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিয়া অকস্মাৎ সোমচাঁদ ভট্ট চমকিয়া উঠিলেন। একি অদ্ভুত পরিবর্তন! এই অল্পক্ষণের মধ্যে নিরঞ্জন কি হঠাৎ পাঁচ বৎসর বয়স ডিঙ্গাইয়া উঠিল। কোথায় সেই তরুণ সুকুমার বদনের কমনীয় লালিত্য? কোথায় সেই ভাবমুগ্ধ নয়নের স্নিগ্ধ-কোমল দৃষ্টি!—এ যে কঠোর পৌরুষ দর্পিত বীরাচারী সাধকের গৌরব-গর্ব্বোজ্জ্বল বদন—নির্ভীক তেজস্বী কটাক্ষ! ইহার মধ্যে কোথায় সে সরল আনন্দ লাবণ্য? এ যে কঠোর প্রশান্তিদ্যুতি!

স্তম্ভিতকণ্ঠে সোমচাঁদ ডাকিলেন, "ভাস্কর—"

নম্রস্বরে নিরঞ্জন বলিল, "আসুন আমি আলো দেখিয়ে অন্ধকারটা পার করে দিচ্ছি।"

আলোকহস্তে নিরঞ্জন অগ্রসর হইল, সকলে নিঃশব্দে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

বাসায় আসিয়া দুয়ার খুলিয়া যন্ত্রপাতি রাখিয়া নিরঞ্জন অন্য আলোক জ্বালিল। নিঃশেষ-প্রায় মোমবাতিটা ফেলিয়া দিয়া, গাত্রবস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া শয্যার উপর দেহ প্রসারিত করিল।

সম্মুখে খোলা জানালা। শুক্লা সপ্তমীর স্নিগ্ধ-চন্দ্রালোকে, বহির্দেশ আলোকজ্জ্বল। অতিথিশালায় আজ কোন গোলমাল নাই, অন্যদিনের তুলনায় আজ চারিদিক অত্যন্ত নির্জ্জন বোধ হইতেছিল; গতিশীল বায়ুতরঙ্গে বৃক্ষপত্রের করুণ-মর্ম্মর-তান, নিস্তব্ধ কক্ষমধ্যে ভাসিয়া আসিতেছিল। বাহিরে চন্দ্রালোক-সমুজ্জ্বল আকাশের নীচে কয়েকটা ক্ষুদ্রকায় চকোরপক্ষী—তৃষিত ব্যাকুলতায় ত্রস্তপক্ষসঞ্চালনে নীরবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

অদূরে আলোকোজ্জ্বল বিবাহবাটীর উৎসব কোলাহল—উচ্চ হাঁক ডাক শব্দ, মধ্যে মধ্যে নিস্তব্ধ প্রকৃতির শান্ত-গাম্ভীর্য্য, চমকিত করিয়া তুলিতেছিল। সমস্ত দিনের পর এতক্ষণে, স্পষ্ট হইতে স্পষ্টীকৃত রূপে নিরঞ্জনের স্মরণ হইল, 'আজ মায়ার বিবাহ!'

অকস্মাৎ কশাহতের মত নিরঞ্জন শয্যা ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। হউক, তাহার তাহাতে কি? মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া, আপনাকে চক্ষু রাঙ্গাইয়া উগ্র-উদ্ধতভাবে শাসন করিল—সাবধান!

এ কি ভ্রান্তি! সকল শেষের পরেও এমন অশেষ বিড়ম্বনা!

মনস্থির করিয়া কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াও—অতর্কিত মূঢ় চপলতায়

সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতেছে। না, এ অসহ্য অন্যায়! উন্মাদ ভ্রান্তির দুর্দ্দম্য তরঙ্গাঘাতে, মুহূর্ত্তের জন্য বিপর্য্যস্ত হতবুদ্ধি হইয়া একদিন সে যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিতেছে,—অনুতাপ ইহজীবনে বিস্মৃত হইবার নহে—তাহার প্রায়শ্চিত চিরজীবন প্রতিপাল্য। আজ ঐ উচ্চ শঙ্খনাদে সেই শুভ সম্প্রদানের বিজয়বাণী বায়ুমণ্ডলে বিঘোষিত হইতেছে, ইহার মধ্যে নিরঞ্জনের দীর্ঘনিশ্বাসের স্থান নাই!—অতীতের আত্মহারা দৌর্ব্বল্যের পরিতাপ-স্মৃতি স্মরণে কাতর হইবার অবসর নাই!—ঐ শঙ্খধ্বনি-মুখরিত আনন্দময় উৎসব লগ্নকে, তাহারও জীবনের উন্নতির মাহেন্দ্রযোগ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, দীক্ষাপূত জীবনকে সবল শক্তি সাধনার পথে পরিচালিত করিবার প্রবল আদেশ বুঝিয়া ঐ মুহূর্ত্তটাকে নতশিরে বরণ করিয়া লইতে হইবে। সে কেন অক্ষম হইবে? মহাশক্তি তাহার সহায়—"মমায়ত্তং হি পৌরুষম্!"

গতকল্য বৈকালে, নিষ্ঠুর-দুঃসাহসে নির্ভর করিয়া, কেবলরাম প্রভৃতির সহিত সে যখন বর অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে যায়, তখন তাহার হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থা সবিশেষ স্মরণ না থাকিলেও—এটুকু বেশ স্মরণ আছে যে তাহার মনের কোনখানে এতটুকু অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ ছিল না। যত্নকৃত চেষ্টা প্রভাবেই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, তাহার মন তখন শ্রদ্ধানিষ্ঠ ভাব-গৌরবে পূর্ণ ছিল। ষ্টেশনে যখন ট্রেন হইতে, উন্নত দীর্ঘাকার সুন্দর-কান্তি বর শান্ত প্রসন্ন বদনে অবতরণ করিলেন, তখন তাহার পানে চাহিয়া নিরঞ্জনের প্রাণ সত্য-সত্যই একটা অনাবিল তৃপ্তি-আনন্দ অনুভব করিয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল, ইনি যোগ্যপাত্র বটে!

কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, তারপর সে তাহার চিন্তা-প্রবাহ কোন দিকে অগ্রসর হইতে দেয় নাই, কোন যোগ্যতার সহিত, এ যোগ্যতাকে তুলনায় পরিমাপ করিয়া দেখিবার স্পর্দ্ধা রাখে নাই।

অসহিষ্ণুভাবে নিরঞ্জন কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল। ঝড়বেগে কত চিন্তা মনের মধ্যে বহিয়া গেল তাহার ইয়ত্তা নাই, নিরঞ্জন আবার বিচলিত আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িল।

সহসা রুষ্ট-রুদ্রের রুক্ষ-ভ্রূকুটীর মত রূঢ় আলোকচ্ছটা দ্বারদেশে উদ্ভাসিত হইল—শঙ্কাহত নিরঞ্জন শিহরিয়া উঠিল। ক্ষণকাল চক্ষু তুলিয়া চাহিতে পারিল না। দ্বার পার্শ্ব হইতে ভোগরন্ধনাগারের একৈক পাচক নিরঞ্জনের রাত্রের আহার্য্য লইয়া ঘরে ঢুকিল, বলিল, "ভোগের প্রসাদ আনিয়াছি।"

আত্মস্থ হইতে নিরঞ্জনের বিলম্ব হইল, সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না। পাচক পুনরায় বলিল, "আমরা আপনার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করিলাম, শেষে মশালচিকে সঙ্গে লইয়া আপনার গৃহে প্রসাদ পৌছাইয়া দিতে আসিয়াছি।"

নিরঞ্জনের চৈতন্য হইল। অনুতপ্ত স্বরে বলিল, "ক্ষমা কর ভাই, তোমাদের অনর্থক কষ্ট দিয়াছি—আমার ক্ষুধা নাই।"

পাচক ক্ষুণ্ণ হইয়া আরও দুই চারিবার অনুরোধ করিয়া শেষে আহার্য্য ফিরাইয়া লইয়া গেল। তাহার মশালধারী সঙ্গীও চলিয়া গেল।

ঘরে অবস্থান করা নিরঞ্জনের পক্ষে অসহ্য বোধ হইল। পুস্তক স্তূপ হইতে সাংখ্যদর্শনখানা টানিয়া, আলোক হস্তে বাহিরের ছাদে আসিয়া

শুইয়া পড়িল। সাংখ্যের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে তাহার ভিতর মনঃসংযোগের চেষ্টা করিতে লাগিল।

মনের ভিতর একটা দুঃসহ বিস্ময় নিগূঢ় অসহিষ্ণুতায় ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। এ কি অদ্ভূত মানুষের চিত্তগতি!—কয়দণ্ড পূর্ব্বে সে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়াছিল—সদর্পে ভাবিয়াছিল, এইবার তাহার সব চুকিল, এখন আর তাহার কোন ভুল ভাবনা নাই, কোন ভয় নাই। কিন্তু এখন দেখিতেছে সেই শেষের মুখেই নূতনের সুর সংলগ্ন রহিয়াছে। এইত আরম্ভ!

হায় ভ্রান্তি! সংযম-সাধনার তটবন্ধনে অনুভূতিপ্রবাহকে যে উচ্চতর সাধনার জন্য অবাধ স্বচ্ছলতায় মুক্তি দিয়াছে, তবুও নিষ্কৃতি নাই! এখনও তাহার মধ্যে এত গভীর কল-ক্রন্দন? এত চক্রাবর্ত্ত দুঃখ! এ কোন্ অদৃশ্য উপলখণ্ড-বক্ষে সংঘাত বেদনা-জনিত নিষ্ঠুর বিপত্তি-পীড়ন

হউক!—সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অবহেলায় সে জয় করিয়া লইবে—তাহার আত্মসম্বরণের অমোঘ মন্ত্র-প্রভাবে!—"মমায়ত্তং হি পৌরুষম্!"

সেই সময় সাংখ্যের একস্থলে তাহার দৃষ্টিবদ্ধ হইল। নিরঞ্জন আগ্রহাকুল চিত্তে পাঠ করিল—

"ন মলিনচেতস্যুপদেশবীজপ্ররোহোঽজবৎ।
নাভাসমাত্রমপি মলিনদর্পণবৎ॥"

সাংখ্য বন্ধ করিয়া নিরঞ্জন ক্ষিপ্রবৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। না, সে পুরুষ মানুষ! সে তাহার পৌরুষ-উদ্যমকে বাহ্য আড়ম্বরে আবৃত করিয়া অন্তরের দিকে নিষ্ফল 'শূন্য' মাত্রে পর্য্যবসিত হইতে দিবে না। "মমায়ত্তং হি পৌরুষম্" সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করিয়া চলাই

তাহার ধর্ম্ম, পায়ে পায়ে হুচট্ খাইয়া রমণীর মত ভীরু কাতরতায় এলাইয়া পড়া তাহার সাজে না। তাহাকে উঠিতে হইবে, ছুটিতে হইবে, খাটিতে হইবে—বাঁচিবার জন্য মরিতে হইবে। ভবিষ্যৎকে ফাঁকি দিবার জন্য বর্ত্তমানের কণ্ঠে ছুরিকাঘাত করিলে চলিবে না, সে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। এবার সে মানুষের মত শক্তি, সাহস, সঙ্কল্প হইয়া—সত্যকার মনুষত্ব সাধন করিবে।

ক্ষিপ্রগতি সাংখ্যদর্শন ও আলোক লইয়া নিরঞ্জন ঘরে ঢুকিল; পুস্তকরাশির উপর বইখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া জামাটা টানিয়া পরিল—তারপর আলো নিবাইয়া ঘরে চাবি দিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া চলিল। মনুষ্যহস্তের সযত্ন রচিত এই ইট-পাথরে গড়া নিরেট কৃত্রিমতার বক্ষে অবরুদ্ধ থাকিয়া—প্রাণের অকৃত্রিম স্বচ্ছতা মুমূর্ষু নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে। একবার সমুদ্রের ধার দিয়া স্বভাবের বিশাল সজীবতার গম্ভীরমহিমা অভিনন্দন করিয়া—চন্দ্রালোকে বেড়াইয়া আসা যাক্‌।

বারভূতের আড্ডা অতিথিশালার দ্বার, সমস্ত রাত্রি খোলা থাকে, যাহার যখন খুসী বাহিরে যায় আসে, তজ্জন্য কাহারো কাছে জবাবদিহি করিতে হয় না। নিরঞ্জন অতিথিশালার দ্বার অতিক্রম করিয়া বাহিরে রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

নিরঞ্জন অতিব্যস্তে প্রায় ছুটিয়া চলিয়াছিল। মোড় ফিরিতেই আগমনশীল আর একজন পথিকের উপর গিয়া পড়িল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপ্রতিভভাবে ক্ষমা চাহিল, পথিক উৎসাহের স্বরে বলিলেন, "নিরঞ্জন, বাঁচলুম—কোথা যাচ্ছ তাড়াতাড়ি ?"

নিরঞ্জন চমকিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "কেবলবাবু ?"

"হাঁ—কোথা যাচ্ছ তুমি ?"

নিরঞ্জন মুহূর্ত্তের জন্য ইতস্ততঃ করিল, উদ্দেশ্যটা ব্যক্ত করিলে অসঙ্গত শুনাইবে কি ? কিন্তু পরক্ষণে সজোরে গ্রীবা উঁচাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। নাঃ অসঙ্গতির দোহাই দিয়া আপনাকে অক্ষম ভীরুতার আশ্রয়ে আর ঠাসিয়া ধরিবে না। পরিষ্কার স্বরে উত্তর দিল, "সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাচ্ছি।"

কেবলরাম সাগ্রহে বলিল, "ওঃ বেড়াতে! কোন কাজে নয় ত ? আচ্ছা, আগে দিদিকে সঙ্গে নিয়ে একবার বাড়ী যাও, আমি অনেক কাজ ফেলে এসেছি, দেখিগে যাই, ভাগ্যে তোমায় পেলুম।" কেবল দ্রুতপদে ফিরিয়া গেল। শান্তিদেবী অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

ফাঁফরে পড়িয়া নিরঞ্জন স্তব্ধ-বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইল। একি উৎপাত! হতাশভাবে বলিল, "আবার ফিরতে হবে ?"

শান্তিদেবী অত্যন্ত ব্যস্তচিত্ত ছিলেন, নিরঞ্জনের ভাববৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিলেন না, বলিলেন, "নিরঞ্জন শীঘ্র চল বাবা, আমার এখনি ফিরে আসতে হবে।"

সহসা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া নিরঞ্জন বলিল, "এখনি ফিরবেন কেন ?"

শান্তিদেবী উত্তর দিলেন, "বরের আংটি, জোড়, সব বাড়ীতে ফেলে রেখে এসেছি, এখন মনে পড়্‌ল। এদিকে লগ্নের আর দেরী নাই।"

"আসুন" নিরঞ্জন অগ্রসর হইল। অস্ফুটস্বরে তাহার কণ্ঠ হইতে কি আর একটা কথা নির্গত হইল, শান্তিদেবী শুনিতে পাইলেন না।

চলিতে চলিতে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তুমি এখন বেড়াতে বেরিয়েছিলে কি খাওয়াদাওয়া সেরে?"

অন্যমনস্ক নিরঞ্জন চমকিয়া বলিল, "আজ্ঞে।"

শান্তিদেবী বলিলেন, "এতরাত্রে বেড়াতে বেরিয়েছ কি ঘুম হয়নি বলে?"

"হাঁ" বলিতে বলিতে নিরঞ্জন থামিয়া গেল। না না, 'ঘুম হয়নি' কথাটা যে ভুল হয়। সে ত নিদ্রার জন্য লেশমাত্র চেষ্টা করে নাই, তবে 'ঘুম হয় নাই' কথাটা এস্থলে কেমন করিয়া প্রযুজ্য হয়?

নিঃশব্দাধিকারে নিজেকে উগ্র সতর্ক করিয়া নিরঞ্জন চারিদিকে চাহিল। নাঃ, সত্যের সাধনায় আত্মোৎসর্গের মাঝে আর এতটুকু অসত্যের অনাবশ্যক ছায়াকে মার্জ্জনা করিলে চলিবে না। স্থিরকণ্ঠে নিরঞ্জন উত্তর দিল, "না আমি ঘুমাইনি।"

সে জোরের সহিত নিদ্রার উপর স্বীয় কর্ত্তৃত্বের ছাপটি দাগিয়া দিল; এ সত্যটুকু প্রচার না করিলেও কোন ক্ষতি ছিল না তাহা সে খুব ভালরকমই জানে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয়-সত্যকে বাদ দিয়া চলাও আজ তাহার কাছে ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে হইল?

তাহার কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে শান্তিদেবী একটু বিস্ময় বোধ করিলেন, কিন্তু তখন অন্য কথা কহিবার সময় ছিল না, তাঁহারা বাসার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। নিরঞ্জনকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া শান্তিদেবী দ্বারের চাবি খুলিয়া ভিতরে ঢুকিলেন, নিরঞ্জন চিন্তাকুল বদনে উন্মনাভাবে দ্বার-সম্মুখস্থ পথে, পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তে পাদচারণা করিতে লাগিল।

একটা নীরব-হৃদয়ভেদী আত্মনির্য্যাতনক্রিয়া তাহার অভ্যন্তরে চলিতেছিল, কিন্তু তাহা বড় গম্ভীর, মৌন, মূক। ক্ষিপ্ত উন্মাদনার অধীর চাঞ্চল্য আজ তাহার মাঝে আত্ম-প্রকাশ করিয়া, বুকের বোঝা লঘু করিতে ভয় পাইতেছিল। যন্ত্রণা নিষ্পীড়িত রক্তের মধ্যে স্তম্ভিত-ক্রন্দন যেন জমাট পাষাণের মত চাপিয়া বসিয়াছিল, শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়াও নিরঞ্জনের কাছে কষ্টদায়ক বোধ হইতে লাগিল।

উৎসব-মত্ত মানবকণ্ঠের উৎসাহ-উচ্ছ্বসিত কলরব, দূর হইতে তাহার কাণে যেন বিভীষিকা-বেষ্টিত করুণ-রোদনের মত শুনাইতেছিল। নিরঞ্জন প্রাণপণে আপনাকে সান্ত্বনা আশ্বাসে প্রবুদ্ধ করিতে চাহিল, সজোরে নিজকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু হায় মানবীয়-দৌর্ব্বল্য! নিরঞ্জনের সমস্ত সাহস ক্রমে শঙ্কা-পীড়িত—ভীত হইয়া উঠিতে লাগিল। এ কি নিগ্রহ!

আবশ্যকীয় জিনিসপত্র লইয়া অবিলম্বে শান্তিদেবী বাহিরে আসিলেন, দ্বারে চাবি দিয়া বলিলেন, "চল বাবা।"

পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইয়া, নিরঞ্জন বলিলেন, "আপনি আগে চলুন।"

চন্দ্রালোকে তাহার স্তিমিত-ম্লান দৃষ্টি ও শুষ্ক বিবর্ণ মুখভাব অবলোকন করিয়া স্নেহ-কোমলকণ্ঠে শান্তিদেবী বলিলেন, "তোমার বুঝি ঘুম পেয়েছে বাবা?"

ক্ষীণ হাস্যে নিরঞ্জন মাথা নাড়িল, "না।"

শান্তিদেবী বলিলেন, "চল না, ও-বাড়ীতে তা হলে বিয়েটা দেখে আসবে।"

কপালের শিরা টিপিয়া ধরিয়া যন্ত্রণা-বিকৃত কণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল,

না আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি বাসায় ফিরব। আজ আর বেড়াতে যেতে পারব না, শরীরে বড় ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।"

করুণাবিগলিত কণ্ঠে শান্তিদেবী বলিলেন, "আহা তা হবে না? সমস্ত দিন বুকে ট্রাট্ দিয়ে বসে কি দুর্জ্জয় খাটুনি!—সহজ কষ্ট?"

কষ্টোচ্ছ্বসিত নিশ্বাসের সহিত নিরঞ্জন উত্তর দিল, "অত্যন্ত।"

বিবাহবাটীর কলরব ধ্বনি ক্রমশঃ তাঁহাদের কানে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। তাঁহারা গন্তব্য স্থানের খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিলেন—সেই সময় উৎসব-বাটীর ভিতর হইতে উচ্চ শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইল। শান্তিদেবী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "এইবার বাবা তুমি এগিয়ে চল, ওখানে অনেক লোক রয়েছে, শাঁখ বাজ্‌ছে, বোধহয় বর ছাদনাতলায় এলেন, শীগ্রী চল।"

নিরঞ্জনের বক্ষের ভিতর সুপ্ত-উত্তেজনাতরঙ্গ—অকস্মাৎ সবেগে দোল খাইয়া, ভিন্নাকারে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। দন্তে ওষ্ঠ চাপিয়া সে স্খলিত চরণে অগ্রসর হইল। রক্ষামন্ত্র জপিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে চেষ্টা—বক্ষের ভিতরকার কম্পন প্রবাহে, প্রতিহত—নিস্তেজ হইয়া, ঘূর্ণীপাকে আবর্ত্তমান তৃণখণ্ডের মত ছিন্নভিন্ন হইয়া বিপন্ন কাতরতায় কোথায় যেন তলাইয়া গেল, শুধু অস্পষ্টভাবে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি হইল, "মমায়ত্তং হি পৌরুষম্।"

নিরঞ্জন পশ্চাদ্বদ্ধ হস্তদ্বয় খুলিয়া সবলে বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিল। নাঃ, কিসের অধীরতা! সে সবল শক্তিমান দৃঢ়চেতা পুরুষ। তাহার ভয় কি—সে ভুলিবে না—তাহার সকল নিরুপায়ের মধ্যে উপায় আছে,

সমস্ত অসহায় দৌর্ব্বল্যের উপর সহায় শক্তি আছে—"মমায়ত্তং হি পৌরুষম্।"

কিন্তু বহির্জ্জগতের কোলাহলে চিত্তের সাড়া, মুমূর্ষু নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। নিরঞ্জন যতই প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করুক—তাহার চারিদিকে কিন্তু চঞ্চল উদ্বেগের বিভীষিকা নিদারুণরূপে জাগিয়া উঠিয়াছিল। চলিতে চলিতে হঠাৎ ত্রস্ত ব্যাকুলভাবে সে একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু পরক্ষণে শান্তিদেবীর উপর দৃষ্টি পড়িল—না ফিরিয়া পলাইবার পথ নাই, সম্মুখের পথই সম্বল। নিরঞ্জন কম্পিত চরণে অগ্রসর হইল:

সম্মুখেই পুষ্পপত্রাভরণশোভিত আলোকোজ্জ্বল বৈঠকখানায় আসর সজ্জিত। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ ফুলেরমালা গলায় পরিয়া, ধূমপান করিতে করিতে, তর্কবিতর্ক গল্পগুজব করিতেছেন; অভ্যর্থনাকারীগণ ব্যস্ত চঞ্চল হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছেন—আসরের মধ্যস্থলে সুসজ্জিত পুষ্পাধার ও প্রজ্জ্বলিত সেজের সম্মুখে, সলমাচুমকির ঝকমক কারুকার্য্য রচিত, রক্তসাটিনের বরাসনখানি শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে; বর বাটীর ভিতর গিয়াছেন।

নিরঞ্জনের পদদ্বয় টলিতে লাগিল, মস্তিষ্কের রক্ত প্রবাহে একটা উদ্ভ্রান্ত ঘূর্ণাবর্ত্ত সবেগে গর্জ্জিয়া উঠিল। অসহায় বিকল দৃষ্টিতে একবার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী শান্তিদেবীর পানে চাহিল, একবার সম্মুখের দিকে চাহিল —নাঃ, ধৈর্য্য হারাইলে চলিবে না। শান্তিদেবী মুখের উপর ঘোমটা টানিয়া কেবলমাত্র তাহাকে লক্ষ্য করিয়া, দুই পাশের জনসঙ্ঘ অতিক্রম করিয়া আসিতেছেন, এ সময় একচুল পিছাইবার পথ নাই

দায়িত্ব স্কন্ধে—চলিতেই হইবে, যত কঠিন দুঃখের পরীক্ষাই হউক—আজি নিষ্কৃতি নাই।

ভিতরে শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি আরম্ভ হইয়াছিল, মুক্তদ্বার পথে ইতর-ভদ্র নির্ব্বিশেষে বহুলোক গমনাগমন করিতেছিল। পরিদর্শন ভারপ্রাপ্ত হৃষীকেশবাবুর জনৈক বন্ধু কি কাজের জন্য বাহিরে আসিতেছিলেন, সহসা ভিত্তিগাত্রস্থ দেয়াল-গিরির আলোকে দ্বার প্রবেশোদ্যত নিরঞ্জনের বিকৃত-বিহ্বল মুখাবয়ব তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। দ্রুত আসিয়া নিরঞ্জনের পথরোধ করিয়া ত্রস্তভাবে তিনি বলিলেন, "ম'শায় কি পাত্র পক্ষীয়! স্ত্রীআচার দেখ্‌তে যাচ্ছেন? ক্ষমা করুন।"

প্রসারিত হস্তে দ্বারের কিয়দংশ আটক করিয়া, লোক জনের ভিড় ঠেলিয়া, নিরঞ্জন শান্তিদেবীর গমন পথ উন্মুক্ত করিয়া ভদ্রলোকটীর পানে চাহিয়া ধীর-সংযত কণ্ঠে বলিল, "আজ্ঞে না, আমি ভিতরে যাব না, অনুগ্রহ করে পথ ছাড়ুন, বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বাড়ী থেকে মা আস্‌ছেন।"

ত্রস্তভাবে সরিয়া দাড়াইয়া ভদ্রলোকটী প্রশ্ন করিলেন, "আপনি বরযাত্রী ন'ন্?"

নিরঞ্জন উত্তর দিল, "না।"

"মাপ করুন ম'শায়, আমি এখানকার কাউকে চিনিনে—আসুন ম'শায় ভিতরে পায়ের ধুলা দেবেন।" উদ্বিগ্ন হইয়া নিরঞ্জন বলিল, "আজ্ঞে না, আমি এইখান থেকেই ফিরব।"

ভদ্রলোকটী তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "সে কি হয়!

সামনের উঠানে অনেক ভদ্রলোক রয়েছেন, মা ঠাকরুণকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বাড়ীর ভেতর পৌঁছে দিন।"

নিরঞ্জন বিপন্ন-ব্যাকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিল—না, কেহ নাই; কেবলবাবু, হৃষীকেশবাবুর কথা দূরে থাক একটি পরিচিত বালকেরও দেখা নাই। শান্তিদেবী অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, নিরুপায়ভাবে ইতস্ততঃ-পরায়ণ নিরঞ্জনের দিকে চাহিয়া ভদ্রলোকটী বলিলেন, "দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি? আপনি এইখানকার লোক, ভিতরে চলে যান মশাই—" ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলেন।

অদৃষ্টের বিড়ম্বনা! তাহাকে বাড়ী ঢুকিতেই হইবে! হে ভগবান, ধৈর্য্য দাও! তাহার যত্নকৃত আয়োজন—বড় গর্ব্বের পুরশ্চরণ অসিদ্ধ হইয়াছে—মন্ত্র চৈতন্যহীন হইয়াছে! আর তাহার "মমায়ত্তং হি পৌরুষম্" জপিবার শক্তি নাই, এবার তুমি তাহাকে রক্ষা কর!

পিছন হইতে শুনিতে পাওয়া গেল, সেই ভদ্রলোকটি অন্য কাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন, "বেদান্তবাগীশ ম'শায়ের বাড়ী থেকে আস্‌ছে, এ ছোক্‌রাকে চেন হে? ওঃ, মদে চুর হয়ে এসেছে।"

নিরঞ্জন হাসিল। ভদ্রলোক তাহাকে মাতাল ঠাহরাইয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি প্রশংসনীয় বটে! কথাটা অকাট্য-সত্য!

কোনগতিকে ভিড়ের পাশ কাটাইয়া, শান্তিদেবীকে লইয়া নিরঞ্জন অন্তঃপুরের দ্বারে পৌঁছিল। শান্তিদেবী ভিতরে ঢুকিলেন, নিরঞ্জন নিঃশব্দে ফিরিয়া চলিল।

সমস্তরাত্রে কেহ নিরঞ্জনের কোন সংবাদ পাইল না। পরদিন

রাতে—সারারাত্রি তামাসা কৌতুক দেখিয়া, সদ্য কষ্মস্থান-আগত সনাতন ও আদিত্য যখন সারাঠি যাত্রা অভিনয়ের নিরঙ্কুশ সমালোচনা জুড়িয়া, খুব ফূর্ত্তির সহিত হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল—তখন বদায়ের বেগে সসজ্জ নিরঞ্জন—উত্তেজনা-রক্ত মুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখানে ছুটিয়া আসিল। ঘরের চাবি ফেলিয়া দিয়া ব্যস্ত-উদ্বিগ্ন ভাবে বলিল, "দাদার চিঠি পেলুম—তিনি দিন-চারেকের মধ্যে আসছেন, এলে বলিস্ আমি সুরাটে চলে গেছি।"

আদিত্য লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "সুরাটে।"

দ্রুত স্বরে এক নিঃশ্বাসে নিরঞ্জন বলিল, "হাঁ, মোহন্ত মহারাজের সই-করা চিঠি পেলুম, পূর্ণিমার মধ্যে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমি আজই চল্লুম, যা কাজ বাকী রইল, দাদা এলে তোরা সেরে যাস্।"

আদিত্য হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিল। সনাতন উত্তেজিতভাবে নিরঞ্জনের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "নিরু, তুই কি খেপেছিস্? পূর্ণিমার এখনও ঢের দেরী। আজ এখানকার অধিকারী মহারাজ আসছেন, এতদিন ধরে যে প্রাণপণে খাট্‌লি, তার সম্মান পুরস্কার—"

সজোরে হাত ছাড়াইয়া লইয়া নিরঞ্জন বলিল, "উচ্ছন্ন যেতে দে! দাদাকে বলিস্ এ মোহন্তের আহ্বান! এই গৌরবের স্বস্তি-আশীর্ব্বাদে,—যদি নিজের অক্ষমতার দৈন্য—মুমূর্ষতার অবসাদ থেকে নিষ্কৃতি পাই, তার চেষ্টায় চল্লুম।"

"শোন নিরঞ্জন—" সনাতন উৎকণ্ঠিত ভাবে কি বলিতে গেল।

ক্ষিপ্ত স্বরে নিরঞ্জন বলিল, "আর নয়, আর পেছু ডাকিস্ না—

আমি নিজের অক্ষম দুর্ব্বলতার জন্য—আজ জগতের সৌন্দর্য্য-সাধক শিল্পী-জীবনকে অভিসম্পাত দিয়েছি, বিশ্বনাথের শিল্পকে ক্ষোভের ধিক্কারে অপমান করেছি ! আমার এ অপরাধ অমার্জ্জনীয় ! সঙ্কীর্ণতার কোটরে আশ্রয় নিয়ে বিশ্বব্যাপী ঔদার্য্য মহনীয়তাকে—হীন দৃষ্টিতে তুচ্ছ—ক্ষুদ্র দেখ্‌ছি। অন্তর দ্বন্দ্বের তাড়নায় উদ্‌ভ্রান্ত বিকল হয়ে ভুলে যাচ্ছি—আনন্দময় বিধাতার বিশ্বরাজ্যে কোন দৃশ্য অসুন্দর হ'তে পারে না, কোন দর্শন অপবিত্র হ'তে পারে না—যদি দৃষ্টি না অপরাধী হয় না সনাতন, আর নয়, আমি মূর্খ অপদার্থতার চরম সীমায় এসে দাঁড়িয়েছি, এবার সকলের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করব।"

নিরঞ্জন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল।

সনাতন ও আদিত্য হতভম্বের মত পরস্পরের মুখ চাহিয়া রহিল। চিরশান্তচেতা নিরঞ্জনকে তাহারা জীবনে কখনও এরূপ উদ্‌ভ্রান্ত ব্যাকুল হইয়া এত কথা বলিতে শুনে নাই। অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিতে পারিল না, শেষে আদিত্য নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "লক্ষ্মীছাড়া ছোকরা, ঝোঁকের মাথায় শিল্প শিল্প ক'রে—এবার নিজের মগজের মাথা খাবে।"

সনাতন দুঃখিতভাবে বলিল, "বাস্তবিক নিরঞ্জন আজ ভাবনা ধরিয়ে দিলে !—ওর গতিক ভাল নয়।"

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

জগতের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ হাসি-কান্নার তরঙ্গ সহিয়া বহিয়া—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল। আবার নূতন বসন্ত আসিয়া পুরাতন হইয়া গেল, কত শাখায় নবমুকুল মুঞ্জরিত হইল, কত ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া গেল, কত ফুল ফলে পরিণত হইল, কত পরিবর্ত্তনের প্রবাহ অপ্রতিহত বেগে অবিশ্রাম বহিয়া গেল—তাহার ইয়ত্তা নাই। পৃথিবীর অবস্থা ব্যবস্থা যেমন পূর্ব্বাপর চলিতেছিল, এখনও ঠিক তেমনই আছে।

যন্ত্রণা-উৎক্ষিপ্ত চিত্তে নিরঞ্জন যেদিন অকস্মাৎ মঙ্গল-মঠ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহার পর আজ দুই বৎসর অতীত হইয়াছে। নিরঞ্জন আজিও সুরাটে রহিয়াছে। সুরাটে নূতন মঠ স্থাপনের বিপুল আয়োজনের পশ্চাতে আজ দুই বৎসর সে একাদিক্রমে খাটিতেছে, সঙ্গে আরও অনেক ভাস্কর রহিয়াছে—কিন্তু দায়িত্বের হিসাবে তাহার প্রাধান্য সকলের উপর। আদিত্য ও সনাতন কিছুদিন এখানে আসিয়া কাজকর্ম্ম করিয়াছিল, কিন্তু প্রবাসে সুদীর্ঘ কাল মন টিকাইয়া বাস করা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে, তাহারা দেশে ফিরিয়া গিয়াছে, এখন দেশের কাছাকাছি নানা স্থানে কাজ করিয়া বেড়াইতেছে।

মঙ্গল-মঠের অধিকারী মহারাজ যথাসময়ে মঠে ফিরিয়া—তাহাদের কৃত কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া, যথোপযুক্ত পুরস্কার দিয়াছেন—কিন্তু নিরঞ্জনের ভাগ্যে তাহা স্বহস্তে গ্রহণ করিবার সুযোগ হয় নাই। অবশ্য ইহার জন্য পরে মাথা ঠিক করিয়া, নিরঞ্জন ব্যস্ততার অজুহাত দেখাইয়া দাদার কাছে যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ দিতে ত্রুটি করে নাই, কিন্তু ক্ষুণ্ণ চিত্তরঞ্জন তাহাতে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, শুধু পুরস্কারের জন্য নহে, যদি তিরস্কারের কারণই কিছু ঘটিয়া থাকিত, তবে তাহার জবাবদিহির জন্য—অন্ততঃ কর্ম্মকর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আশা নিরঞ্জনের উচিত ছিল।

নির্ম্মল-মঠের কার্য্যারম্ভের সময় চিত্তরঞ্জনদেব, প্রধান ভাস্কর রূপে প্রথমে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি সে পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন না। বিকানীরবাসী কয়জন পরিচিত তীর্থযাত্রাভিলাষী নরনারীর সহিত মিলিয়া ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিবার জন্য—বিমাতা আগ্রহ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলেন। চিত্তরঞ্জন নিজেও মাতার সহিত যাইতে প্রস্তুত হইলেন। নিরঞ্জন মঠ নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা ভার গ্রহণ করিল। মাতা অনেক দিন নিরঞ্জনকে দেখেন নাই, সেই জন্য নিরঞ্জন কয়দিনের ছুটি লইয়া চিত্তরঞ্জনের সহিত বিকানীর গেল। শোকতপ্ত অশ্রু অভিষেকের মধ্যে বিষাদ-খিন্ন চিত্তে বিদায় লইয়া, অবিলম্বে বালক ভ্রাতুষ্পুত্র দেবরঞ্জনকে সঙ্গে করিয়া সুরাটে ফিরিয়া আসিল। দেবরঞ্জন শৈশবেই মাতৃহীন হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন আর বিবাহ করেন নাই।

বিক্ষোভাহত চিত্তকে আত্ম-বিস্মৃতির অবকাশে মুক্তি দিবার জন্য

নিরঞ্জন শিল্প চর্চ্চার মধ্যে প্রাণ ঢালিয়া দিল, কিন্তু তবুও সে অসীম শূন্যতার আকুল হাহাকার নিবৃত্ত হইল না। অভাব কি তাহা স্পষ্ট বোঝা দায়, কিন্তু স্বভাবের সেই গূঢ়-অস্বস্তি-বৈষম্য—কিছুতেই সাম্য হইল না। কর্ম্মের চাপে প্রাণকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টায় নিরঞ্জন সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিল। অবিশ্রাম কর্ম্ম ব্যস্ততার স্রোতে ডুবিয়া, যদি কোন রকমে জীবনের সেই একটা 'ভুল'কে ভুলিতে পারে—যদি কোনগতিকে অন্তরের এই মহাব্যাধির হাতে নিষ্কৃতি পায় তাহারই সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

দেবরঞ্জনকে কাছে আনিয়া, পারিবারিক জীবনে একটা কর্ত্তব্যবন্ধনে আপনাকে জড়াইয়া নিরঞ্জন অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইল। পিতামহীর স্নেহ-ক্রোড়বিচ্যুত মাতৃহীন বালকের স্নেহ-পিপাসিত হৃদয়টি সে পরম যত্নে নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইল। তাহার অষ্টপ্রহরের অভাব-অভিযোগের তত্ত্বাবধান লইয়া, সময়োপযোগী শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিয়া—নিজের অনবসর সময়কে কাটিয়া ছাঁটিয়া, জোরের উপর অবসর সংগ্রহ করিয়া বালকের চিত্তবিনোদনের জন্য—কষ্ট কল্পিত কৌতুকের সৃষ্টি করিয়া, নিরঞ্জন নির্জ্জীব পাষাণ ও সজীব শিশুর সেবায় দিন কাটাইতে লাগিল। কঠোর শাসনের গণ্ডিতে মনকে পুরিয়া নিরঞ্জন আপনাকে সাংসারিকতার উপযোগী স্বচ্ছন্দ সরল লঘু করিয়া লইতে চাহিত, কিন্তু ক্লান্তি-পীড়িত হৃদয় তাহাতে সুস্থ তৃপ্ত হইত না, সময় সময় তীব্র বিতৃষ্ণায় সে উন্মাদ হইয়া উঠিত, তখন আত্মসম্বরণের চেষ্টা নিরঞ্জনের নিকট মৃত্যু যন্ত্রণার অপেক্ষা বেশী বোধ হইত, কিন্তু সে যন্ত্রণাও নিঃশব্দ গাম্ভীর্য্যে বহন করিতে পিছাইত না। কর্ত্তব্য-বিমুখ

হৃদয়কে সবলে কর্ত্তব্যের দিকে টানিয়া লইয়া চলিত, 'না' বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইতে দিত না। পাছে নিজের অবসন্ন অবসাদ সংঘাতে কাহারও স্বাচ্ছন্দ্য স্ফূর্ত্তি আহত হয় বলিয়া নিরঞ্জন সতর্কভাবে গনিয়া পা ফেলিত। মন যখন একান্তই দুর্বিনীত অধীর হইয়া উঠিত, তখন সকলের সংস্রব এড়াইয়া নিরঞ্জন অন্ধকারে সরিয়া দাঁড়াইত।

ভাস্কর-নিবাসে দেবরঞ্জনের কোন কষ্ট ছিল না। দেশদেশান্তর হইতে আগত প্রবাসী ভাস্করগণ সকলেই তাহাকে স্নেহ যত্ন করিত। সমস্ত ভাস্কর নিবাসের মধ্যে সেই একটি মাত্র শিশু, সুতরাং তাহার মনস্তুষ্টির জন্য সকলেই তাহাকে যথাসাধ্য আমোদ দিয়া, তাহার সঙ্গহীনতার অভাব মোচন করিত। ভাস্করগণের সহিত নিরঞ্জন যখন অদূরস্থ মঠের কার্য্যে চলিয়া যাইত, তখন তাহার জন্য স্বতন্ত্র বেতনভোগী ভৃত্য আসিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত।

এক বৎসর নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বদরিকাশ্রম হইতে ফিরিবার সময় শীত প্রকোপে চিত্তরঞ্জনদেব পথিমধ্যে পীড়িত হন, সহযাত্রীগণও কেহ কেহ পীড়িত হন। গোকর্ণে পৌঁছিয়া, বিমাতা সহসা এক দিনের জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পীড়িত চিত্তরঞ্জন কোন ক্রমে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া, সহযাত্রীদের সহিত দেশে ফিরিলেন।

আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিতে তাঁহার অনেক দিন লাগিল, কিন্তু রোগ শেষে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায় দক্ষিণ হস্তটি পক্ষাঘাত ব্যাধিতে চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। কয় মাসের পর এখন তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিয়া সম্প্রতি সুরাটে ফিরিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি পূর্ব্ববৎ অক্ষম হইয়া আছে।

তীর্থভ্রমণে যাত্রার পর পূরা দেড় বৎসর সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে, এই দেড় বৎসর নিরঞ্জন একলা সকল দিকে খরচ চালাইতেছে। তীর্থভ্রমণ, মাতৃশ্রাদ্ধ, চিত্তরঞ্জনের পীড়ার চিকিৎসা ও আপনার এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের ব্যয় নির্ব্বাহ ভার নিজের স্কন্ধে লইয়া, নিরঞ্জনের সঞ্চিত পুঁজি যাহা কিছু ছিল সবই নিঃশেষিত হইয়াছে—কিন্তু চিত্তরঞ্জনদেবের সঞ্চিত অর্থে অদ্যাবধি সে হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। উভয় ভ্রাতা একান্নবর্ত্তী হইলেও নিরঞ্জন উপার্জ্জন করিতে শিখিয়া অবধি, তাহার নিজস্ব সঞ্চয়ের তহবীল চিত্তরঞ্জন দেব আলাদা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আয়-ব্যয়ের হিসাব, নিরঞ্জনকে দাদার দরবারে নিয়মিতরূপে দাখিল করিতে হইত।

আজ দ্বিপ্রহরে চিত্তরঞ্জনদেব দেড় বৎসরের হিসাবের খাতা লইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের তীর্থ ভ্রমণের খরচ, তাঁহার তহবীল হইতে আবশ্যক মত তুলিয়া পাঠাইবার জন্য তিনি নিরঞ্জনকে আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আজ হিসাবের খাতা লইয়া দেখিলেন, নিরঞ্জন তাঁহার সে আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া—নিজের তহবীল সম্পূর্ণরূপে উজাড় করিয়াছে।

উপযুক্ত ভ্রাতাকে বৈষয়িক ব্যাপারে অবাধ্যতার জন্য সকলের সমক্ষে তিরস্কার করা চলে না। চিত্তরঞ্জনদেব নির্জ্জনে নিরঞ্জনকে কিছু উপদেশ দিবার জন্য, বৈকালে নির্ম্মল-মঠের উদ্যানে বেড়াইতে বাহির হইলেন। নিরঞ্জন তখন সহযোগীগণের সহিত মঠের বহিরাংশে কার্য্য-ব্যাপৃত ছিল। চিত্তরঞ্জনদেব তাহাকে বলিয়া গেলেন যেন ছুটীর পর সে উদ্যানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে।

কিন্তু নির্জ্জনতার সুযোগ ঘটিল না। মোহন্ত মহারাজ বৈকালিক ভ্রমণের জন্য উদ্যানে আসিয়াছিলেন! তিনি চিত্তরঞ্জনের সঙ্গী হইলেন।

সুবিস্তীর্ণ উদ্যান-বাটিকার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। নিদাঘ অপরাহ্ণে অকস্মাৎ আকাশে মেঘাড়ম্বর সঞ্চার হইয়া বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাঁহারা উভয়ে উদ্যানপ্রান্তভাগে 'করগেট' লৌহের ছাদযুক্ত ক্ষুদ্র বিশ্রাম স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে কতকগুলি সুদৃশ্য প্রস্তরাসন বিরাজ করিতেছিল, উভয়ে বর্ষণ নিবৃত্তির অপেক্ষায় সেইস্থানে বসিয়া নানা কথায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মোহন্ত মহারাজ সুভদ্র ভট্ট, বয়সে বৃদ্ধ। তাঁহার সুদীর্ঘ বিশাল আকৃতি আজিও যুবজনোচিত শক্তি-সামর্থে সুদৃঢ়। পিতৃমাতৃ-পুণ্যে জন্মগত শক্তি ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়া—চিরজীবন হিতাচার, মিতাহার, পরিমিত পরিশ্রম ও ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মানুগত ভাবে জীবন যাপনের ফল তাঁহার আকৃতি ও প্রকৃতিতে পূর্ণ বিদ্যমান। সৌন্দর্য্যেও তিনি অনিন্দনীয় রূপবান পুরুষ। বদনমণ্ডল শান্ত গাম্ভীর্য্য শোভা স্নাত, অধরে সদানন্দ হাস্য, নয়নে অমায়িক ঔদার্য্য প্রসন্নভাবে বিরাজমান্, সকলের উপর একটা স্নিগ্ধ সারল্য দ্যুতি উদ্ভাসিত হইয়া মোহন্ত মহারাজের সৌম্য মূর্ত্তি—অধিকতর সৌম্য-মনোহর করিয়া তুলিয়াছে।

মোহন্ত মহারাজের দয়াদাক্ষিণ্য ও সৎকীর্ত্তি কাহিনী দেশদেশান্তর বিশ্রুত। ভক্তপ্রবর তুলসীদাসের কথিত 'জগতের পাঁচ রতন' বাস্তবিকই তিনি জীবনের সার ব্রত বলিয়া অবলম্বন করিয়াছিলেন। সাধুসঙ্গ, সদালোচনা, দয়া, পরোপকার ও নিরভিমান তাঁহার স্বভাব-অভ্যস্ত

ব্যাপার হইয়াছিল। যৌবনে দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু অকালে পত্নী বিয়োগ হওয়ায়—অনাবশ্যক বোধে আর দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন নাই। অনুগত শিষ্য সহচরগণের মধ্যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন এবং তাহাকেই গদীর উত্তরাধিকারী করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন।

বল্লভাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত মঙ্গল-মঠ প্রভৃতি মঠের মধ্যে সুরাটের সুন্দর-মঠ সম্মানে ও বৈভবে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। সুন্দর-মঠাধিকারী মহারাজগণ পুরুষানুক্রমে অন্যান্য মঠাধিকারীগণের দীক্ষাদাতা, সুতরাং গুরুস্থানীয় বলিয়া ইঁহারা সকলের নিকট অধিকতর সম্মানার্হ, অনুরক্ত ভক্ত ও শিষ্যগণের নিকট 'মোহন্ত মহারাজ' আখ্যায় অভিহিত হন। কেহ কেহ অধিকারী মহারাজ বলিয়াও সম্বোধন করে।

মহারাজের পরিধানে বেশভূষায় কোনই আড়ম্বর নাই। অন্য মঠাধিকারীগণের ন্যায় ইঁহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যবস্থা বিলাসায়োজনপূর্ণ নহে, তাহা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ। পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষ ব্যতীত তিনি পদোচিত জাঁকজমকপূর্ণ বেশভূষা গ্রহণ করিতেন না। সচরাচর শুভ্র কার্পাস বস্ত্রের উত্তরীয়, বসন ও উষ্ণীষ ব্যবহার করিতেন। ভ্রমণের সময় পায়ে খড়ম ছাড়িয়া চর্ম্মপাদুকা ও হাতে একগাছি স্থূল যষ্টি লইতেন মাত্র।

চিত্তরঞ্জনদেব তাঁহার সম্মুখে অন্য প্রস্তরাসনে বসিয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জনদেব অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব—যৌবনে তাঁহার দেহকান্তি সুপুরুষোচিত থাকিলেও, এখন সংসারিক শোক-তাপ ও ব্যাধি-পীড়নে তাঁহার আকৃতি বিবর্ণ মলিন হইয়াছে। বয়সে প্রৌঢ় হইলেও তাঁহাকে বৃদ্ধ মোহন্ত

মহারাজ অপেক্ষা অধিক বয়স্ক দেখাইতেছিল। দুঃখ-নিপীড়ন-ক্লিষ্ট, মুখমণ্ডলে সহিষ্ণু ধৈর্য্যের শান্ত জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছিল। সুপ্রশস্ত বক্ষঃস্থল ও সুগঠিত অবয়বে, অতীতের কর্ম্মকুশল শিল্পীর দৃঢ় শক্তি-শালিতার পরিচয় প্রকাশিত—বিচার-বিচক্ষণতা ও কর্তৃত্ব-গরিমার দীপ্তি আজিও ললাট-পট্টের আকুঞ্চণ রেখায় দেদাপ্যমান, দৃষ্টিতে ভোগ-বীতস্পৃহ পবিত্র সরলতা কিরণ বিচ্ছুরিত হইতেছে। চিত্তরঞ্জন-দেবের বেশভূষা জাতীয় প্রথানুযায়ী। ব্যাধিগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য হস্তটি গলবন্ধনীযোগে বক্ষের উপর ঝুলিতেছিল, বামহস্ত ক্রোড়দেশে সংন্যস্ত করিয়া, পদদ্বয় গুটাইয়া তিনি বসিয়াছিলেন।

ক্রমে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল। মহারাজ বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওহে, এইখানেই আমাদের বসিয়ে রাখ্‌বে নাকি?"

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে চাহিয়া চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "সেই রকমই গতিক দেখছি, এ ত ভাল বিপদে পড়া গেল মহারাজ।"

ঈষৎ হাসিয়া, স্নিগ্ধ-রহস্য-কোমল কণ্ঠে মহারাজ বলিলেন, "মন্দ নয়, সুখ সম্পদের কোল থেকে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বিপদে পড়ায় আরাম আছে, নিশ্চিন্ত হয়ে কিছু শিখে নেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। এস ভাল করে বসে, জাঁকিয়ে গল্প ফাঁদা যাক।"

চিত্তরঞ্জন হাসিয়া কি একটা কথা বলিবার উপক্রম করিতেছেন—এমন সময় বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "একি নিরঞ্জন, বৃষ্টিতে ভিজে আসা কেন?"

উষ্ণীষ-বস্ত্রে উত্তরার্দ্ধ আবৃত করিয়া নিরঞ্জন আসিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির

জলে তাহার সর্ব্ব শরীরের বস্ত্রাদি সিক্ত হইয়া গিয়াছিল, কোন অংশ শুষ্ক ছিল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া চিত্তরঞ্জন ভৎ'সনাসূচক স্বরে বলিলেন, "ছি ছি, নিরঞ্জন করেছিস্ কি ?"

আচ্ছাদিত উষ্ণীষ-বস্ত্র খুলিতে খুলিতে, ম্লান মুখে একটু সলজ্জ হাস্য ফুটাইয়া নম্রভাবে নিরঞ্জন বলিল, "জলটা ধরে গেলেই আস্‌ব মনে করেছিলাম, কিন্তু এখন ছাড়্‌বার লক্ষণ নয় দেখে, বাধ্য হয়ে চলে এলুম।"

মহারাজ তাহার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দরকার ?"

চিত্তরঞ্জনদেব বলিলেন, "গোটাকতক কথার জন্য আমি ওকে ডেকেছিলাম, কিন্তু এরকম ভাবে ভিজে আস্‌তে বলিনি, এমন নির্ব্বোধ পাগল !"

ক্ষুণ্ণভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, চিত্তরঞ্জনদেব ব্যগ্রভাবে বাম হস্তে তাহার মস্তকের কেশরাশি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "চুলগুলা শুদ্ধ অবেলায় ভেজালি ভাই ! মাথাটা মুছে ফেল, আঃ, জামা দিয়ে দর্‌ দর্‌ করে জল ঝর্‌ছে।"

আস্তিনের বোতাম খুলিতে খুলিতে নিরঞ্জন মৃদুস্বরে বলিল, "জামাটা আগেই ঘামে ভিজে ছিল।"

ক্ষিপ্রহস্তে চিত্তরঞ্জন তাহার বুকের বোতাম খুলিয়া দিতে লাগিলেন। মহারাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি মহারাজ, এই সব নির্ব্বোধ নিয়ে সংসার চলে ? নির্ব্বিচারে শরীরের ওপর অত্যাচার করে চেহারা হয়েছে দেখুন, যেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত, দীন ! এর সমবয়স্ক

সমশ্রেণীর যুবাদের মধ্যে কার আকৃতি এত কৃশ বলুন ত? পরিশ্রম কি কেউ করে না!"

নিরঞ্জন নতশিরে নীরব রহিল। তাহার জামা খোলা হইলে সিক্ত উষ্ণীষ-বস্ত্র নিঙড়াইয়া, নিরঞ্জন মাথা মুছিয়া ফেলিল। পরিহিত বস্ত্রের জল নিঙড়াইয়া, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে চিত্তরঞ্জনদেব নিজের মস্তক হইতে উষ্ণীষ বস্ত্র উন্মোচন করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন "ভিজে কাপড় ছেড়ে এইটে পর।"

ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া নিরঞ্জন অস্ফুট স্বরে বলিল, "থাক্ না এখনি বাসায় গিয়ে কাপড় ছাড়্‌ব।"

চিত্তরঞ্জনদেব প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "না এখনি ছাড়।"

তথাপি নিরঞ্জন ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া চিত্তরঞ্জনদেব ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "এটা পর, আমার হুকুম।"

এবার নিরঞ্জন আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। নিঃশব্দে একপার্শে সরিয়া গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া আসিল, চিত্তরঞ্জনদেব নিজের আসনের অন্যপ্রান্তে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এইখানে বস।"

মহারাজ এতক্ষণ নীরবে তাহার পানে চাহিয়াছিলেন। এইবার কোমল-কৌতুক স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "চিত্তরঞ্জন ভাইকে খুব শাসনে রেখেছ!"

স্নেহপূর্ণ নয়নে কনিষ্ঠের পানে চাহিয়া চিত্তরঞ্জনদেব বলিলেন, "বড় অবাধ্য মহারাজ, ওকে একটু শাসন কর্‌বার জন্যেই এখানে নির্জ্জনে ডেকেছিলাম, কিন্তু কেমন সুব্যবস্থায় ভাই আমার এসে পৌঁছাল দেখলেন! একে কি করে শাসন করি বলুন ত?"

মহারাজ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, "শাসনের জন্য ! ওঃ, অপরাধী তা হলে সুবিচার করেছে—একেবারে শাসিত হয়েই এসে হাজির। যাক্, অপরাধটা কি শুনতে পাব ?"

"পাবেন বই কি মহারাজ, আপনি বিচার-কর্ত্তা, আপনার কাছে গোপনের কিছুই নাই।" চিত্তরঞ্জন আয় ব্যয় ঘটিত ব্যাপার আদ্যন্ত বর্ণন করিলেন। মহারাজ নীরবে হাস্য স্মিত বদনে, স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া রহিলেন। চিত্তরঞ্জনের বক্তব্য সমাপ্ত হইলে হাসিতে হাসিতে মহারাজ বলিলেন, "শোন নিরঞ্জন, তোমার দাদা আমার ওপর বিচারের ভার দিয়াছেন, এবার আমি তোমার কাছে কিছু কৈফিয়ৎ তলব করি, কি বল ?"

বিনীত হাস্যে নিরঞ্জন বলিল, "মহারাজের ইচ্ছা।"

মহারাজ বলিলেন, "ইচ্ছা ? তবে ত বিপদে ফেল্লে!" পরক্ষণে হাস্য ত্যাগ করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "না নিরঞ্জন, রহস্য নয়, যথার্থ বল্‌ছি, তোমার দাদা অসন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু আমি তোমার কাজে ভারি সন্তুষ্ট হলেম। তুমি কর্ত্তব্য পালন করেচ, বেশ করেছ, তোমায় পুরস্কৃত করা আমার উচিত।"

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া নিরঞ্জন নীরবে তাঁহাকে নমস্কার করিল। দাদার হাতে হিসাবের কাগজ তুলিয়া দিয়া আসিয়া অবধি—সে তাঁহার অপ্রসন্ন তিরস্কার আশঙ্কায় এতক্ষণ অত্যন্তই কুণ্ঠিত হইয়াছিল, এইবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। অবশ্য চিত্তরঞ্জনের স্বোপার্জ্জিত সঞ্চয় যাহা আছে, তাহাতে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া তিনি স্বচ্ছন্দ-আরামে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিতে পারেন, তাহা

সকলেই জানে—কিন্তু সেই জন্যই নিরঞ্জনের ভয়, পাছে তিনি তাহার ক্ষুদ্র শক্তির সেবা সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেন।

মহারাজের কথা শুনিয়া চিত্তরঞ্জনদেব ঈষৎ ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন, "না মহারাজ, ঐ অবিবেচক বালককে আর প্রশ্রয় দেবেন না। আপনি শুন্‌লে আশ্চর্য্য হবেন, ওর দশ বৎসরের সঞ্চয়ের অঙ্কে—আজ মাত্র দশদিনের পারিশ্রমিক ছাড়া অতিরিক্ত একটা পয়সা অবশিষ্ট নাই!"

মহারাজ ক্ষণকাল স্তব্ধ রহিলেন। তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "সাংসারিকতা হিসাবে এটা খুবই অবিবেচনার কাজ হয়েছে স্বীকার করি, কিন্তু আমার মত অসংসারীর পক্ষে সৎকার্য্যের জন্য সঞ্চয়ের অঙ্ক শূন্য করা সুবিবেচনার কাজ—আনন্দ সংবাদ।"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "মহারাজ, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার মত-দ্বন্দ্ব নাই, কিন্তু আজ বাদে কাল যাকে সংসারী হয়ে পত্নী-পুত্রের লালন-পালন ভার গ্রহণ কর্‌তে হবে, তার পক্ষে এরূপভাবে সর্ব্বস্ব ব্যয় করে রিক্তহস্ত নিঃস্ব হওয়া—"

বাধা দিয়া মহারাজ শান্তভাবে বলিলেন, "নিঃস্ব কাকে বল চিত্তরঞ্জন? যার উপার্জ্জন কর্‌বার ক্ষমতা আছে, সে শাকান্ন ভোজন করে তৃণ শয্যায় শুয়ে দিন কাটালেও—নিঃস্ব নয়। অকর্ম্মণ্য ধনী-বিলাসী, বাসনাসক্তের দলকে নিঃস্ব বলে গালি দাও—শোভনীয় হবে, কিন্তু পরিশ্রমী কর্ম্মঠকে ওকথা বোল না।"

চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "মহারাজ, নিষ্প্রোয়জনীয় তর্ক থাক। নিরঞ্জনের সমস্ত দুঃসাহসিকতা আমি ন্যায্য বলে স্বীকার কর্‌ছি, এখন আপনি শুধু অনুগ্রহ করে একটি বিষয়ে ওকে প্রতিশ্রুত করান, আমি নিশ্চিন্ত হই।"

সহসা উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে ভ্রাতার মুখপানে চাহিয়া নিরঞ্জন ঈষৎ উদ্বিগ্ন চঞ্চল হইয়া উঠিল। একটা কিছু কথা বলিবার জন্ত সে মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়াছিল বোধহয়, কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না, ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া নীরবে অধোমুখ হইল। তাহার সে চাঞ্চল্য কেহ লক্ষ্য করিলেন না, চিত্তরঞ্জনদেব আপন মনেই বলিতে লাগিলেন— "ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন, নিম্মল-মঠে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হবে, তার আগেই এখানকার কাজ সব শেষ হয়ে যাবে। মহীশূরে নিরঞ্জন নূতন কাজ পেয়েছে, কিন্তু আপাততঃ তিন মাস সে কাজ বন্ধ থাকবে। আমি নিরঞ্জনকে বলছি যে, এই সময় দেশে গিয়ে দিনকতক থাকবে চল, কিন্তু নিরঞ্জন তাতে সম্মত নয়, ও বললে— গান্ধারের স্থাপত্য শিল্প এই ছুটিতে দেখে আসব, এখন দেশে যাব না।"

নিরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল। সবিনয়ে বলিল, "গান্ধারের স্থাপত্য শিল্পে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে, জীবনে যে সব শিক্ষার সুযোগ হয়নি, এই অবকাশে যদি—"

মহারাজ বলিলেন, "উত্তম প্রস্তাব, চিত্তরঞ্জন এতে আপত্তি করছ কেন?"

চিত্তরঞ্জন উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমার শারীরিক অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে আসছে, এই সময় নিরঞ্জনের বিবাহকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্ত হই। গান্ধারে স্থাপত্য শিল্প দেখতে যাওয়ায় আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন? এর পর মহীশূর থেকে ফিরে এসে—"

নিরঞ্জন অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "ভবিষ্যতে সুযোগ হবে কি না তা'র কোনই নিশ্চয়তা নাই—কিন্তু বর্ত্তমানে—"

মহারাজ সাগ্রহে বলিলেন, "সমীচীন মন্তব্য!—না চিত্তরঞ্জন, আমি সুবিধার খাতিরে তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলুম না, বরং তোমায় অনুরোধ করছি, তুমি প্রসন্নচিত্তে নিরঞ্জনকে অনুমতি দাও। উদ্যমশীল শিক্ষার্থীর—প্রতিভা বিকাশের পথে অন্তরায় হোয়ো না; সর্ব্বান্তঃকরণে উৎসাহ দাও। তুমি বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি—স্মরণ রেখে, বিবাহের পর সংসারী যুবকের মস্তিষ্ক নানাচিন্তায় পূর্ণ হয়, সে মস্তিষ্কে উন্নতি বিষয়ক চিন্তার স্থান অল্প। সে ব্যক্তির পক্ষে উন্নতির প্রতিকূল বিঘ্ন অনেক।"

ক্ষুণ্ণভাবে চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "সব জানি মহারাজ, মাতা জীবিত থাকলে চিন্তার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন আমার শরীর ভগ্ন হয়েছে, পুত্র দেবরঞ্জন বালক—এ অবস্থায় কতদিন আর নিরঞ্জনকে অবিবাহিত রাখা উচিত? নচেৎ আমারও ইচ্ছা ছিল না যে, নিরঞ্জনের কৃশ-ক্ষীণ আকৃতি যথাযোগ্য পুষ্ট পরিণত না হ'লে ওর বিবাহ দিই। কিন্তু কি করি, নিরুপায়, সকল দিক বজায় রাখা চাই মহারাজ!"

"সে ত নিশ্চয়।" মহারাজ উভয় হস্ত ধৃত যষ্টির উপর চিবুক স্থাপন করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সকল দিক বজায় রাখতে হবে বৈকি।"

নিরঞ্জন নিঃশব্দে ক্ষীণ হাস্য করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। মহারাজ কয় মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "বেশ, তবে এক কাজ কর, যত শীঘ্র পার দেশে গিয়ে বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়ে ওকে ছেড়ে দাও।" নিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে বলিলেন, "শোন হে

ভাঙার, নববধূ নিয়ে আমোদ উৎসবের চিন্তা এখন মনে স্থান দিয়ো না, নিজের কাজে একাগ্র মনোযোগ রেখো। বিবাহ করে তুমি পাহাড়ে চলে যাও, তোমার উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য সুন্দর-মঠের কারাগার থেকে সমুদয় পাথেয় ব্যয় দেওয়া হবে, কেমন এবার ত সম্মত আছ?"

চিত্তরঞ্জন চমৎকৃত! নিরঞ্জন স্তব্ধ! মহারাজের সরস পরিহাস তাহার কানে কর্কশ পরিতাপের শোকধ্বনির মত বোধ হইল। তাহার ইচ্ছা হইল নিজের মস্তিষ্ক সবলে উৎপাটিত করিয়া মহারাজের পাদপ্রান্তে বিসর্জ্জন দিয়া—অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা, সহ্যসীমার আয়ত্তে ফিরাইয়া আনে, হৃদয়ের ভার লাঘব করে। কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না, তাহার মুখে শুধু তপ্ত বিষাদের শুষ্ক বিকৃত ভাব ফুটিয়া উঠিল। নত দৃষ্টিতে চাহিয়া নিরঞ্জন মুহ্যমান ভাবে নির্ব্বাক রহিল!

তাহাকে মৌন দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, "আমি এই মুহূর্ত্তে তোমার কাছে উত্তর চাইছি না—এখনো ঢের সময় আছে, তুমি ভাল করে ভেবে দেখো, তবে আমার বিশ্বাস এরকম ব্যবস্থায় তোমার বিশেষ কিছু কার্য্যহানি হবে না। অল্প বয়সে তুমি যে রকম কার্য্যকুশলতা, ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছ, তার সম্বন্ধে মৌখিক প্রশংসায় তোমার ওপর অবিচার করব না, তবে এটা আমি বেশ জানি তোমার স্থান সাধারণ যুবকদের উর্দ্ধে! আমি চাই, তোমার সে ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হোক, তোমার উন্নতির ব্যাঘাত যেন কখনো কোন কারণে না হয়—এখন তুমি নিজে বুঝে দেখো।"

নিরঞ্জন চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার

ক্রমশঃ রীতিমত ঘনাইয়া আসিল, কিন্তু তখনও বর্ষণ বেগ নিবৃত্ত হয় নাই। মহারাজের ভৃত্য আলোক ও ছত্র লইয়া তাঁহাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল। দূর হইতে তাঁহাদের দেখিতে পাইয়া দ্রুত সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ আমি ছাতা নিয়ে আপনাকে নানাস্থানে খুঁজেছি, সেইজন্য আস্‌তে দেরী হ'ল।"

মহারাজ সহাস্যে বলিলেন, "তা হোক বাপু, তার জন্যে জবাবদিহি করতে হবে না, আমার কোন অসুবিধা হয় নাই।"

তিনি গাত্রোত্থানের উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া, চিত্তরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাজ ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ছাতা কি মোটে একটি এনেছ?"

ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার ছাতা।"

মহারাজ বলিলেন, "আচ্ছা আগে এই ভদ্রলোকদের বাসায় পৌঁছে দিয়ে এস—আমি পরে যাব।"

চিত্তরঞ্জন ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি মহারাজ, ও আদেশ ক্ষমা করুন! আমরা—"

ভৃত্য সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "আমার ছাতাটাও আছে, যদি অনুমতি করেন—"

মহারাজ সাগ্রহে বলিলেন, "বেশত, তাহলে একটা ছাতা খুলে তুমি চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে চল, আর নিরঞ্জন তুমি আমার ছাতার নীচে এস।"

এই সামান্য আহ্বানটুকু সহসা নিরঞ্জনের ক্লিষ্ট-বেদনাতুর হৃন্মর্ম মধ্যে—আকুল পুলকোচ্ছ্বাসের গভীর আনন্দ-তানে ঝঙ্কারিত হইল।

হর্ষ-বিস্ময়ের যুগপৎ সংঘাতে উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতায় আত্মবিস্মৃত নিরঞ্জন সহসা দীন করুণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আপনার ছত্র তলে মহারাজ ?"

শান্ত দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া মহারাজ বলিলেন, "হাঁ তোমার স্থান হবে এস।"

প্রভুর ইঙ্গিতে ছত্র খুলিয়া চিত্তরঞ্জনের মস্তকে ধরিয়া ভৃত্য আলোক হস্তে অগ্রসর হইল, নিরঞ্জন মহারাজের মস্তকে ছত্র ধরিয়া চলিল। তাহার চিন্তাক্রান্ত বিমর্ষ মুখমণ্ডলে, একটা স্নিগ্ধ সান্ত্বনার শান্তোজ্জ্বল জ্যোতিঃ—ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জন ভ্রাতার মুখ পানে চাহিয়া একটু বিস্মিত হইলেন, কিছু বলিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রজনীর দ্বিযাম উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে গ্রীষ্ম-গাম্ভীর্য্যে অবসন্ন—নৈদাঘ-প্রকৃতি যেন স্তব্ধ উৎকণ্ঠিত ভাবে সময়ক্ষেপ করিতেছে, আকাশে একটিও নক্ষত্র নাই।

গৃহ কোণে একটি ক্ষুদ্র দীপ মৃদু আলোক বিকীরণ করিতেছিল। ভাস্কর-নিবাসে শয়ন কক্ষের মুক্ত বাতায়ন সমক্ষে যন্ত্রের বাক্সর উপর বসিয়া নিরঞ্জন মাথায় হাত দিয়া নীরবে চিন্তামগ্ন। পাশে শয্যার উপর সুন্দর সুকুমার বালক দেবরঞ্জন নিদ্রা যাইতেছিল, ঘরে আর কেহ ছিল না। চিত্তরঞ্জনদেব পাশের কক্ষে একাকী থাকিতেন। তাঁহার ভৃত্য অদূরে বারেণ্ডার প্রান্তে শয়ন করিত।

ওদিকের ঘরে, অন্যান্য ভাস্করগণ সকলে সমবেত হইয়া তাস খেলিতেছে ও গল্প করিতেছে। রুগ্ন চিত্তরঞ্জনদেবের নিদ্রার ব্যাঘাত হইবার ভয়ে তাহারা অপেক্ষাকৃত সংযত ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছে, তবুও মাঝে মাঝে তাহাদের উৎসাহ-উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে। আজ মঠের সমস্ত কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, ভাস্করগণ সকলেই যথাযোগ্য পারিশ্রমিক ও পুরস্কার লাভ করিয়াছে। আগামী পূর্ণিমার দিন মঠে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উৎসব অন্তে ভাস্করগণ সকলেই নিজালয়ে ফিরিবে। এ দুই দিন তাহাদের বিশ্রাম, সুতরাং গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত আজ তাহারা তাস খেলার আমোদে মত্ত হইয়াছে।

আজ বৈকালে, মহারাজ নিরঞ্জনকে ডাকিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট

পারিশ্রমিক, পুরস্কার ও গান্ধার যাত্রার অগ্রিম পাথেয় সমস্ত মিটাইয়া দিয়াছেন। তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য অনেক উৎসাহসূচক উপদেশ দিয়া শেষে সাদরে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিয়াছেন, "দাদার যখন একান্ত ইচ্ছা, তখন বিবাহটা স্থগিত রাখা আর উচিত নয়—দ্বিধা-আপত্তি কোর না, দেশে গিয়ে বিবাহ কর। তুমি প্রতিভাশালী যুবক—তোমার কোন ভাবনা নাই। তুমি স্বয়ং 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্'—বিবাহের সামান্য গোলযোগে তোমার আর কি অসুবিধা হবে?"

বেদনার হাসি হাসিয়া নিরঞ্জন নীরবে চলিয়া আসিয়াছে। সত্যই তাহার কোন কিছুতে অসুবিধা নাই, কিন্তু পাছে নিজের অক্ষমতার দৈন্যে সে কাহারও সুবিধার হন্তারক হয় এই তাহার বড় ভয়, এই ভয়ের জন্যই সে সাংসারিক চিন্তার দায়িত্ব হইতে নিজেকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া, নিজের স্বস্তি চায়, অপরের স্বাচ্ছন্দ্য প্রার্থনা করে। সে যে সংসারের পক্ষে একান্তই অযোগ্য! তাহার দ্বারা যে সংসারের কাহারও কোন উপকার আশা নাই!

কিন্তু কেন অযোগ্য, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। হয়ত যোগ্যতার শক্তি দিয়া ভগবান তাহাকে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু নিজের মূঢ়তায় সে তাহাতে আজ বঞ্চিত হইয়াছে। হউক তাহাতে কিছু আক্ষেপ নাই, কিন্তু সত্য বঞ্চনাকে—কেন আর প্রবঞ্চনার কৌশলে ঢাকিয়া, জবরদস্তি করিয়া এ দুর্ভোগের আয়োজন? ইহাকে পাশ কাটাইয়া গেলেই ভাল হয় না! ভাবিতে ভাবিতে সহসা সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া নিরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল, মুক্ত বাতায়ন পথে বহিঃপ্রকৃতির

পানে চাহিয়া নিঃশব্দে ঈষৎ হাসিল। তাহার উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের এই যে ভ্রান্ত পূজা উৎসব—ইহাও বুঝি ঐ স্তব্ধ-অন্ধকারময়ী গভীর নিশীথিনীর মত—বিরাট স্তব্ধ, গভীর মৌন, কিন্তু দিগন্তবিস্তারি স্থির অচঞ্চল! ইহার মধ্যে দেখিবার কিছু নাই, দেখাইবার কিছু নাই—আছে শুধু অপরিমেয় দুর্ণিরীক্ষ্যের অগাধ অসীমতা, নিষ্ফলতার ক্ষোভ, আকাঙ্ক্ষার বেদনা, সবই ইহার সান্নিধ্য হইতে সুদূরে অবস্থান করিতেছে। ঈর্ষা বিদ্বেষের কোন কলঙ্ক গ্লানি ইহার কোন অংশ কলুষিত মলিন করে নাই, তবু ইহা এক বিসম বৈষম্য—বিশেষণ শাস্ত্র বহির্ভূত—অদ্ভুত বিশেষ্য!

নিরঞ্জন ফিরিয়া দাঁড়াইল। ঐ বিরাট অন্ধকারের অসাড় নিস্পন্দতার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিয়া নিরর্থক প্রহর গণিয়া লাভ কি? সমস্ত জগৎ তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দ-কৌতুকে বিদ্রূপের হাসি হাসিতেছে, দৃষ্টি সম্মুখে জীবনের কর্ত্তব্য রক্তচক্ষে ভ্রূভঙ্গী করিয়া শাসাইতেছে—তবুও ভ্রান্ত নির্ব্বোধ সে, নিজের ক্লান্ত দৌর্ব্বল্যকে প্রাণাকুল আগ্রহে অন্তরের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া থাকিবে? কিসের এ মমতা, কেন এ খিন্নতা? অনায়াসলভ্য সুখের পথে জগৎ জোড়া সুবোধের দল, উদ্দাম স্বাচ্ছন্দ্যের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, শুধু একা ক্ষীণজীবি দীন দুর্ব্বল সে, মলিন মুখে অন্যদিকে চাহিয়া থাকে কেন? তাহার কাজ কি জগতে কিছুই নাই? আছে!—যথেষ্ট! নিরঞ্জনের ঘূর্ণায়মান মস্তিষ্ক মধ্যে তীব্র উত্তেজনা হুঙ্কার করিয়া উঠিল। দ্রুতপদে কক্ষ মধ্যে সে পাদচরণা আরম্ভ করিল, উত্তেজিত হৃদপিণ্ড সশব্দে বক্ষের মধ্যে ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া লাফাইতে লাগিল, ললাটের শিরা স্ফীত হইয়া

উঠিল, উষ্ণ তাড়িত স্রোত খরবেগে সর্ব্বশরীরে বহিতে লাগিল, নিরঞ্জন অধীর হইয়া উঠিল।

কতক্ষণ সেই অবস্থায় কাটিল স্মরণ নাই। সহসা দেবরঞ্জন পাশ ফিরিয়া শুইয়া নিদ্রা-জড়িত কণ্ঠে ডাকিল, "কাকা।"

চমকিয়া নিরঞ্জন স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সবলে আত্মদমন করিয়া বালকের নিকট আসিয়া, তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া স্নেহময় কণ্ঠে বলিল, "কেন বাবা?"

বালক বলিল, "তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল।"

ঘরেই কুঁজায় জল ছিল, গ্লাশে ঢালিয়া আনিয়া নিরঞ্জন বালকের মুখে ধরিল। জল পানান্তে বালক বলিল, "তুমি এখনো শোওনি?"

নিরঞ্জন বলিল, "না, এইবার শোব। ঘরে আলো জল্‌ছে, তোমার বুঝি কষ্ট হচ্ছে দেবু?"

"না কষ্ট কিছুই হয় নি. তুমি পড়্‌বে ত পড় না।" বালক গায়ের কাপড়টি টানিয়া লইয়া, পুনশ্চ নিদ্রার জন্য শুই[illegible]ল।

পড়ার কথা আজ নিরঞ্জনের স্মরণ ছিল না, [illegible]কের কথায় স্মরণ হইল। পুস্তকাধারের উপর হইতে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণখানি টানিয়া লইয়া, আলোকটা সরাইয়া আনিয়া শয্যা-শিয়রে রাখিল, বালকের পাশে শুইয়া পড়িয়া, পুস্তকের পাতা উল্টাইতে লাগিল।

কিন্তু মনোমত স্থান বাছিয়া লইয়া, পড়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই—তৈলহীন প্রদীপের শূন্য গর্ভে সলিতা জ্বলিয়া উঠিল, দপ্‌ দপ্‌ করিয়া প্রদীপটা নিভিয়া গেল। বিষাদের নিশ্বাস ফেলিয়া—আবদ্ধ নিঃশব্দে হাসিয়া নিরঞ্জন পুস্তক বন্ধ করিল। এমনই হতভাগ্য নির্ব্বোধ সে!

যে শক্তি অবলম্বনে জীবনকে গড়িয়া তুলিতে চায়, সে শক্তির আয়ু কতটুকু—তাহা চাহিয়াও দেখে না। ঝোঁকের মাথায় অন্ধ হইয়া চলিতে চায়—তাই চলা হয় না, কিন্তু অন্ধকারে পথ হারাইয়া ফেলার যন্ত্রণাটুকু, পরিপূর্ণ শক্তিতে—অব্যাহতভাবে অনুভব করিয়া লইতে বাধ্য হয়, এমনই তাহার অদৃষ্ট!

সহসা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া নিরঞ্জন সজোরে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। হউক অদৃষ্ট, কিন্তু সহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট—তাহাকে নিজের জীবনের ভীরু-দৌর্ব্বল্যে কুণ্ঠা-কাতর হইয়া অপমান করিতে পারিবে না, অবজ্ঞা করিতে পারিবে না। এই ভ্রান্তি উন্মত্ততা কাল্পনিক হউক, কিন্তু ইহাই তাহার সত্য: এই ভ্রান্তিই তাহার পক্ষে সহজ, এই উন্মত্ততাই তাহার নিকট শ্রেয়স্কর!

চিন্তার উত্তেজনায় নিরঞ্জনের মনের মধ্যে সত্যই মত্ততার নেশা ঘনাইয়া উঠিল; উদ্‌ভ্রান্তের মত সে লম্ফ দিয়া শয্যাত্যাগ করিল। আকস্মিক শব্দে নি[illegible] দেবরঞ্জন চমকিয়া ভীতভাবে অস্ফুট শব্দ করিল, নিরঞ্জন তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না; উত্তেজিতভাবে অন্ধকার কক্ষমধ্যে সবেগে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। বালক নীরবে ঘুমাইয়া অচেতন হইল।

মানুষের স্থূলবুদ্ধি স্থূলদ্বন্দ্ব-ই বুঝে ভাল, তাহার অন্তরের এ স্থূলাতীত দুঃখ-দ্বন্দ্ব কেমন করিয়া অনুধাবন করিবে? ভোগাসক্ত, বাসনান্ধ মানবের সঙ্কীর্ণ অনুভূতির সীমায়—তাহার অন্তরের এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যাচ্ছন্ন একজ্ঞায়িতা—কোন্ মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইবে, তাহা সে জানে, জানে বলিয়াই সে মানুষের হৃদয়বত্তা শ্রদ্ধা করিতে পারে

না—মানুষের সহানুভূতি-লাভ চেষ্টাকে ঘৃণা করে। মানুষ ক্ষণস্থায়ী হৃদয়াবেগের আতিশয্যে আজ যাহাকে ন্যায্য, গ্রাহ্য বলিয়া সমস্ত প্রাণের সহিত মানিয়া লয়—কাল, অস্বস্তি অসুবিধার দায়ে ঠেকিয়া, স্বচ্ছন্দে তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া—অবজ্ঞার তুড়িতে উড়াইয়া দেয়। আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতার জন্য, আত্মশ্লাঘার অনুরোধে তাহারা মনের সত্য মুখে আনিতে ভয় পায়, তাহারা এমনই প্রখর বুদ্ধিমান, এতদূর কঠিন সত্যনিষ্ঠ! মানুষের তীক্ষ্ণ খর্ব্ব বুদ্ধিকে সে কেমন করিয়া বুঝাইবে—জগতের জড় স্থূল ঘটনা সমষ্টির ভিতর দিয়া অলক্ষ্যে, কত গূঢ় চেতনায়, সূক্ষ্ম চিন্তাধারা বহিয়া—কোন্ পরিণতির মধ্যে সার্থকতা লাভ করিতে চায়! লঘুচেতা মানব, কৌতুক-প্রিয়তাই সকল আরামের সারসম্পদ বলিয়া গ্রাহ্য করে, তাহাদের উপহাস-পটুতার জয় হউক। কিন্তু তাহাদের মুখ চাহিয়া, নিরঞ্জন নিজের সাধনার মধ্যে অবিশ্বাসী, অপরাধী হইতে পারিবে না! তাহার ভ্রান্ত একগুঁয়েমিতা—আর যাহাই হউক, কিন্তু সে একনিষ্ঠ! তাহার নিকট নিরঞ্জন চিরদিন অকপট সাহসে, নির্ভীক হৃদয়ে বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। নিজের তৃপ্তির জন্য, আত্মবিস্মৃতি খুঁজিতে সাংসারিক ভোগাশক্তির চরণে, জঘন্য ভাবে আত্মবলিদান করিতে পারিবে না।

সহসা বাহিরে কে যেন ব্যস্তভাবে চীৎকার করিয়া কাহাকে ডাকিল। চিন্তা-বিক্ষিপ্ত-চেতা নিরঞ্জন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, উৎকর্ণ হইয়া শুনিল—একজন ভাস্কর, চিত্তরঞ্জনদেবের ভৃত্যকে ব্যস্ত-ত্রস্ত হইয়া ডাকিয়া বলিতেছে, "শীঘ্র এস।"

অনিশ্চিত উদ্বেগে নিরঞ্জন শঙ্কিত হইয়া উঠিল। কক্ষদ্বার খুলিয়া দ্রুতপদে বাহিরে আসিল, শুনিল—চিত্তরঞ্জনদেব গৃহাভ্যন্তরে যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক কাতরোক্তি করিতেছেন। তাঁহার ঘর হইতেই উক্ত ভাস্কর তাঁহার ভৃত্যকে ডাকিতেছে।

রুদ্ধশ্বাসে নিরঞ্জন আতঙ্ক-ব্যাকুল হৃদয়ে চিত্তরঞ্জনদেবের কক্ষে ঢুকিল। তাহাকে দেখিয়া ভাস্কর ব্যগ্রভাবে বলিল, "এই যে, দাদা এসেছেন। ঘুমন্ত অবস্থায় এঁর বুকে কোন রকম ব্যথা ধরেছে না কি বুঝতে পারছি না. ডান হাতখানা বুকের উপর চেপে ধরে ইনি ঘুমের ঘোরেই গোঙাচ্ছিলেন! খেলা রেখে আমি পাশের ঘরে ঘুমাতে এসেছিলাম, শব্দ পেয়ে এ-ঘরে এলুম. মশারি তুলে ডাকাডাকি করছি সাড়া পাচ্ছিনে—দেখুন দেখি, ব্যাপার কি!"

ভাস্কর হাতের আলোকটা তুলিয়া ধরিল। চিত্তরঞ্জনের যন্ত্রণা-বিকৃত নিষ্প্রভ মলিন মুখের পানে চাহিয়া নিরঞ্জন শিহরিয়া উঠিল, ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহার গলবন্ধনী খুলিয়া দিয়া, অসাড় দক্ষিণ হস্তটা টানিয়া বুকের উপর হইতে সরাইয়া দিল। চিত্তরঞ্জনের কাতরোক্তি নিবৃত্তি হইল, ঘন-কম্পিত নিশ্বাসে হাঁপাইতে হাঁপাইতে দৃষ্টি-উন্মীলন করিয়া জড়িত স্বরে তিনি ডাকিলেন. "রামশরণ—রামশরণ।"

সুপ্তোত্থিত ভৃত্য চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। চিত্তরঞ্জনের অবস্থা দেখিয়া, প্রত্যুৎপন্ন-মতি ভৃত্য তৎক্ষণাৎ উপস্থিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া, তাঁহাকে পাশ ফিরাইয়া শয়ন করাইল, মুখে জলের ঝাপ্টা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। ক্রমশঃ চিত্তরঞ্জন সুস্থ হইয়া উঠিলেন। অভিজ্ঞ ভৃত্য বলিল, গলার বাঁধন

না খুলিয়া কর্ত্তা শয়ন করিয়াছিলেন, নিদ্রাঘোরে হৃদ্‌পিণ্ডের উপর হস্ত ভার চাপা পড়ায় ঐরূপ যন্ত্রনা হইতেছিল, ইহা অন্য কিছু নহে।

ভৃত্যের বাক্য সমর্থন করিয়া চিত্তরঞ্জনদেব বলিলেন, "আমারই দোষ, শুয়ে একখানা বই পড়্‌ছিলাম, বড় ঘুম পাওয়ায় গলার বাঁধনটা না খুলেই অমনি শুয়ে পড়ি, তাই এ বিভ্রাট !"

ভাস্করকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "বড় উপকার করেছেন, ভাগ্যে আপনি জেগেছিলেন, না হলে শেষ পর্য্যন্ত হয় ত যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়্‌তাম।"

নিরঞ্জনের হৃদয়াভ্যন্তরে শত বৃশ্চিক দংশন করিল। সেও ত জাগিয়াছিল, কিন্তু সজ্ঞানে নহে—অজ্ঞানের মধ্যে, স্বপ্নে! তাই অকর্ম্মণ্য হতভাগ্যের কর্ণে এই অতি প্রয়োজনীয় অভাবের কাতরোক্তি পৌছায় নাই। হয় ত এই যন্ত্রণা-কাতর ধ্বনি তাহারও কক্ষে গিয়াছিল, হয় ত কোন সচেতন প্রাণী সেখানে থাকিলে, সেও ইহা শুনিতে পাইত! কিন্তু কেহই ছিল না, কাজেই কেহই উত্তর দেয় নাই, কেহই সাহায্য করিতে আসে নাই। অভাবের আহ্বান নিস্ফল-ব্যর্থতায় প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, স্বার্থ-ব্যস্ত মানব-হৃদয়, তাহার করুণা ভিক্ষায় কর্ণপাত করে নাই!

জ্বলন্ত-গ্লানি অনুতাপে নিরঞ্জনের অন্তর দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। নিজের অপদার্থতা, অকর্ম্মণ্যতার সুস্পষ্ট পরিচয় আজ এক মুহূর্ত্তে তাহার যন্ত্রণাহত চিত্তের উপর তীব্র ঘৃণা-ধিক্কারে—রূঢ়

দীপ্তিতে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। নিরঞ্জন মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দৌর্ব্বল্য-পীড়িত হৃদক্রিয়ার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ও সুনিদ্রার জন্য ভৃত্য, প্রভুকে নির্দ্দেশ মত ঔষধ সেবন করাইল। রুগ্ন প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া অভ্যাসবশে সেবা শুশ্রূষা ও আকস্মিক দুর্ঘটনার উপযুক্ত চিকিৎসায় সে রীতিমত সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল ; বিপদে মাথা ঠিক রাখিয়া, নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালনে তাহার অসাধারণ ক্ষমতা। সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র গুছান ছিল, ভৃত্য নির্ব্বিবাদে নিজের কাজ সমাপ্ত করিয়া স্তব্ধ হতবুদ্ধিভাবে দণ্ডায়মান নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে—আশ্বাসের স্বরে বলিল, কোন চিন্তা করবেন না, আরও দুইবার অসাবধানতার জন্য প্রভু এইরূপ অনর্থ ঘটাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি নিকটে ছিলাম, যন্ত্রণার উপক্রমেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়, সুতরাং প্রভুকে বিশেষ কিছু কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। তদবধি আমি সতর্ক হইয়া থাকি, ইত্যাদি।

নিরঞ্জনের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। চিত্তরঞ্জন তাহাদের নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিতে যাইবার অনুরোধ করিলেন। ভাস্কর চলিয়া গেল, কিন্তু নিরঞ্জন নড়িল না।

চিত্তরঞ্জনদেব ভৃত্যকে বলিলেন, "রামশরণ, তুমি আলো দেখিয়ে নিরঞ্জনকে ঘরে পৌছে দাও, নিজেও শোওগে। আমার আর কিছু দরকার নেই, আমি এবার ঘুমাব।"

রামশরণ প্রস্থানোদ্যত হইয়া নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া বলিল, "আসুন।"

নিরঞ্জন রুদ্ধস্বরে বলিল, "তুমি শোওগে রামশরণ, আমি একটু পরে যাব।"

চিত্তরঞ্জন বাধা দিতে উদ্যত হইয়া থামিলেন। নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিয়া একটু বিশেষ রকম বিস্ময়বোধ করিলেন। ভাবিলেন অনভিজ্ঞ নিরঞ্জন তাহার অসুস্থতা দেখিয়া বুঝি অত্যন্ত ভীত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। তাহাকে কিছু সাহস ও সান্ত্বনা দিবার জন্য অবসর সংগ্রহের অভিপ্রায়ে বলিলেন, "ভাল, রামশরণ তুমি যাও।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। অকস্মাৎ নিরঞ্জন চিত্তরঞ্জনের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, "দাদা।"

উদ্বিগ্ন হইয়া চিত্তরঞ্জন বলিলেন, "কেন, কেন নিরঞ্জন?"

"আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

"কি, বল না।"

"আমার বিবাহ দেবেন না, তার ফল ভাল হবে না।"

চিত্তরঞ্জন মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ রহিলেন। তারপর ক্ষীণভাবে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমি কি আমার শরীরের অবস্থা দেখে ভয় পেয়েছ? ভয় কি ভাই, এ ত আনন্দের কথা! তোমাদের রেখে যাওয়া আমার সৌভাগ্য, এতে দুঃখ করবার কিছু নাই। এ জীর্ণ দেহ পৃথিবীর কাজে ঢের খেটেছে, আর এবার বিশ্রামই মঙ্গল।"

অধীরভাবে নিরঞ্জন বলিল, "সে জন্য নয়, অন্য কারণ আছে। কিন্তু আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করবেন না, আমি কোন উত্তর দিতে পারব

না, ক্ষমা কর্‌বেন। শুধু এইটুকু অনুরোধ আমার রাখবেন—আমার বিবাহ প্রস্তাব আর তুল্‌বেন না।”

নিরঞ্জন উঠিবার চেষ্টা করিল, চিত্তরঞ্জন তাহার হাত চাপিয়া ধরিলেন। স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, “তোমার নিষেধ সত্বেও প্রশ্ন কর্‌ছি, আমি অল্পে সন্তুষ্ট হতে পারি না। তোমার মত সংসার অনভিজ্ঞ বালকের ক্ষণিক-উত্তেজনা-সৃষ্ট মত বিশেষের উপর নির্ভর করে আমি অযথা মত পরিবর্ত্তন কর্‌তে পার্‌ব না—তোমার আপত্তি কি খুলে বল।”

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া অনুতপ্ত-বিকল কণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল, “আমার আপত্তি অনেক, প্রধান আপত্তি—আমি সংসারের অযোগ্য। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি একবর্ণও অতিরঞ্জিত করে বল্‌ছি না, আপনার ঐ নিরক্ষর মূর্খ সামান্ত ভৃত্যটার, সাংসারিকতার উপযোগী যেটুকু শক্তি আছে, আমার আজ তাও নাই। সংসারের পক্ষে—সাংসারিকতা সম্বন্ধে, আমি নির্ব্বোধ, একান্তই অকর্ম্মণ্য, শক্তিহীন, দুর্ব্বল। আমার বাচালতা মার্জ্জনা করুন—কিন্তু ঈশ্বরের শপথ, মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি—বিবাহিত জীবন শুধু আমারই যন্ত্রণার কারণ হবে না, যাকে বিবাহ কর্‌ব সেই নিরপরাধা নারীও আমার জন্য চিরদিন অসুখী হয়ে থাক্‌বে। সাধ করে এ মনস্তাপ বরণ করে নিতে আমি অক্ষম—আমায় ক্ষমা করুন।”

চিত্তরঞ্জনদেব মনের উদ্বেগ গোপন করিয়া, শান্ত স্নেহময় কণ্ঠে বলিলেন, “নিরঞ্জন তুমি বালক, তাই নিজেকে অযোগ্য ভেবে কুণ্ঠিত হয়েছ। সদ্যোজাত শিশু একদিনে পিতা পিতামহ হবার শক্তি নিয়ে

পৃথিবীতে আসে না—কিন্তু কালক্রমে সে সকল শক্তির অধিকারী হয়ে উঠে।”

অধীর ব্যাকুলতায় নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল, “কিন্তু যে চিররুগ্ন দুষ্টরোগ-গ্রস্ত বিকলাঙ্গ, হতভাগ্য, তার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র! আমায় কোন প্রশ্ন করবেন না, দয়া করে শুধু নিষ্কৃতি দিন। আপনি অনুমতি করুন—আমি জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, আত্মোন্নতিলাভের জন্য, নিশ্চিন্ত হয়ে কর্মক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়ি।”

চিত্তরঞ্জনদেব কয় মুহূর্ত নীরব চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন। তারপর ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, “আমি বুঝেছি, কোন কারণে তোমার মানসিক অবস্থা এখন প্রকৃতিস্থ নাই। আমি আপাততঃ তোমার বিবাহ প্রস্তাব স্থগিত রাখলাম, কিন্তু তুমি সাবধান, বিকারগ্রস্ত চিত্ত নিয়ে, মানুষ জগতের, জীবনের, কোন উপকার করতে পারে না। তার উদ্দেশ্য অসিদ্ধ হয়, জীবন অসার্থক হয়। যদি উন্নতি চাও আগে মনস্থির কর।”

“আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।” বাষ্পাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে নিরঞ্জন দুইহাতে অগ্রজের চরণ বেষ্টন করিয়া পায়ের উপর মাথা নত করিল। চিত্তরঞ্জনদেব অশ্রুসিক্ত নয়নে, সস্নেহে বাম হস্তে তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া শিরশ্চুম্বন করিলেন। করুণা-কোমল-কণ্ঠে বলিলেন, “নিরু, কেউ জানুক না জানুক তুমি জান—আমি তোমায় পুত্রাধিক স্নেহ করি। বৈমাত্রেয় ভাই বলে নয়, শিক্ষাদাতা শাসনকর্ত্তা বলে নয়, আমি পিতার দায়িত্ব নিয়ে তোমায় প্রশ্ন করছি, নিরঞ্জন—”

সহসা অর্দ্ধ-সমাপ্ত বাক্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া চিত্তরঞ্জনদেব সংশয়-

উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের পানে চাহিলেন। প্রশ্ন তাঁহার কণ্ঠে বাধিয়া গেল।

নিরঞ্জন বুঝিল সে প্রশ্ন কি? ঘৃণার হাসি হাসিয়া, স্থির নির্জীব দৃষ্টি তুলিয়া ভ্রাতার পানে চাহিল। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আপনার স্নেহ জীবনের কোন মুহূর্ত্তে বিস্মৃত হবার নয়, তার মর্য্যাদা চিরদিন স্মরণ রাখব; কিন্তু আপনার পিতৃ-রক্তে যে জন্মগ্রহণ করেছে, আপনার উন্নত শিক্ষায় যে জীবনে প্রথম দীক্ষিত হয়েছে, তার দ্বারা কোন নীচ কলুষিত কাজ কখনও সংঘটিত হয় নাই, কখনও হওয়া সম্ভবপর নয়, এটা স্থির বিশ্বাসে জান্‌বেন।"

চিত্তরঞ্জন সজোরে তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বিগলিত কণ্ঠে বলিলেন, "জানি ভাই, তোমায় অবিশ্বাস করি না, তবে ভুল দেবতারও আছে। ভ্রান্তির হাতে মহাদেবও নিস্তার পান নাই, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।"

সহসা হাত টানিয়া লইয়া ক্ষিপ্র-উত্তেজিতভাবে নিরঞ্জন বলিল, "তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন, তবে শুনুন্—আমি অস্বীকার কর্‌ব না, সত্যই আমি ভ্রান্ত! এ ভুলের মূল আমার—নীরব মুগ্ধতা মাত্র! জ্বালাময়ী তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষার সরব আস্ফালন ঝঙ্কার এর কাছে পঙ্গু, অন্ধ, অক্ষম! এ পরকৃত বঞ্চনার ঈর্ষিত-বিক্ষোভ নয়—এ আত্মকৃত লাঞ্ছনার অস্বস্তি অভিশাপ!"

নিরঞ্জনের দুই চক্ষু দিয়া দর্ দর্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। স্তব্ধ নির্ব্বাক চিত্তরঞ্জন চমৎকৃত—হতবুদ্ধি! নিরঞ্জন দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া স্খলিত চরণে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতে সহকর্ম্মীসঙ্গীগণের কাহাকেও কিছু না বলিয়া, বিমর্ষম্লান চিত্তরঞ্জনের নিকট বিদায় লইয়া নিরঞ্জন গান্ধার চলিয়া গেল। পাছে মোহন্ত মহারাজ তাহাকে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার উৎসব দেখিয়া যাইতে অনুরোধ করেন বলিয়া ভয়ে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। চিত্তরঞ্জনকে বলিয়া গেল, মোহন্ত মহারাজকে ক্ষমা করিতে বলিবেন, আমি ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর মন্মথনাথ মায়াকে সঙ্গে লইয়া এলাহাবাদে ফিরিলেন। তাঁহার আত্মীয়-অভিভাবক সংস্রবহীন ক্ষুদ্র বাসাবাড়ীতে পাচক ও ভৃত্য ছাড়া আর কেহই ছিল না। মায়াকে বধূ-জীবনের দুর্ভোগ-পোহাইতে হইল না, সে একেবারে গৃহিণীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইল।

নিঃসম্বল দরিদ্র-সন্তান মন্মথনাথের অনেক কাজ; পত্নীর সম্বন্ধে অত্যধিক আগ্রহ ঔৎসুক্য প্রদর্শনের অবকাশ ও দুশ্চেষ্টা তাঁহাকে অন্নচিন্তার পশ্চাতে বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। আইন-আদালত, পুঁথি-নথি, দলিল-দস্তাবেজ লইয়া তাঁহাকে প্রাতঃকাল হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খাটিতে হইত, বৃথা সময় নষ্ট করিলে তাঁহার মত অবস্থার লোকের অনাহার অনিবার্য্য। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবন-সংগ্রাম-রত মানুষের পক্ষে—নাট্যোক্ত নায়কের প্রেমিক জীবনোচিত লীলা-রঙ্গের বাঁধা-গৎ স্মরণ রাখা সম্ভবপর নহে, কাজেই মন্মথনাথের সে সব চিন্তা আদৌ ছিল না। বে-খরচায় পরামর্শগ্রাহী মক্কেলগণ সকাল সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে ভিড় জমাইত, শ্রমশীল মন্মথনাথ বিনা-আপত্তিতে যথাসাধ্য সদ্ব্যবহারে সকলকে সন্তুষ্ট করিতেন। বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের গুণে তাঁহার প্রসার-প্রতিপত্তিও বেশ জমিয়াছিল, নূতন উকীলের ভাগ্যে অধুনাতন কালে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে—তাঁহার ভাগ্যেও তাই ঘটিয়াছিল, যশের তুলনায় অর্থাগম হয় নাই।

সংসার খরচ বাদে মন্মথনাথের আয়ের কিছুই প্রায় উদ্বৃত্ত থাকিত

না। যে মাসে যৎকিঞ্চিৎ বাঁচিত, ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া আইন পুস্তক কিনিয়া ফেলিতেন। তাঁহার জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু অন্যায় লোভ ছিল না ; সৎপথে থাকিয়া, আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া, তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা যতই অল্প হউক—নিজের পক্ষে যথেষ্ট মনে করিতেন।

সুন্দরী এবং বয়স্থা বধূ ঘরে আনার পর, তাঁহার কর্ত্তব্যে অমনোযোগিতার জন্য বন্ধুবান্ধবের দল যে অবশ্যম্ভাবী ধারণা পোষণ করিয়াছিল, তাহা সুনিশ্চয় ব্যর্থ করিয়া মন্মথনাথ যখন অত্যধিক মনোযোগে কর্ত্তব্যের উপর নবোদ্যমে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, তখন সকলেই সত্য সত্য বিস্মিত হইয়াছিল। অবশ্য মন্মথনাথ যে নির্ব্বিকল্প জিতেন্দ্রিয় উদাসীন, বৈরাগী, তাহা নহে, তবে গৃহিণীর অপেক্ষা গৃহ-খরচের চিন্তাই তাঁহার পক্ষে প্রবল ছিল এবং বাহিরের কাজকর্ম্মের অবকাশে যখন মমতা-করুণ হৃদয়ে সঙ্গহীনা গৃহিণীর প্রতি মনোযোগী হইতেন, তখন দেখিতেন—কর্ম্ম-নিপুণা গৃহিণীও, কর্ত্তা অপেক্ষা কর্ত্তার গৃহের আসবাব পত্রের ব্যবস্থা ও যত্নে সবিশেষ ব্যস্ত-মনোযোগী। প্রথম প্রথম হাসিয়া বিদ্রূপ করিতেন, কিন্তু গৃহিণী লজ্জা-কুণ্ঠিত হাস্যে নিরুত্তরে নিজের কাজে ব্যস্ত বিব্রত হইয়া পড়িত। কখনও বা তাহার বিমর্ষ ম্লান মুখের পানে চাহিয়া মন্মথনাথের মন বিগলিত হইয়া যাইত। দিদিমা এখানে আসিবেন না, ভাবিতেন মায়াকে তাঁহার কাছে দিন কয়েকের জন্য পাঠাইয়া দিব, কোন দিন বা সহৃদয়ভাবে সে প্রস্তাবও তাহার কাছে উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু মায়া নিরুৎসাহভাবে নীরব থাকিত। বারম্বার প্রশ্ন-পৃষ্ট হইয়া কোন সময় শুষ্ক ম্লান মুখে উত্তর দিত, "না।"

মন্মথনাথ বিস্মিত হইতেন। ব্যথিতচিত্তে মনে করিতেন বুঝি দুঃখিনী দিদিমার দারিদ্র্য-স্মৃতি স্মরণ করিয়া, মায়া সেখানে গিয়া ভার বৃদ্ধি করিতে অনিচ্ছুক। লজ্জিত হইয়া গোপনে কেবলরামের সহিত পত্রযোগে পরামর্শ করিয়া দিদিমাকে অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, কিন্তু দৃঢ় আপত্তিতে দিদিমা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু ও সামর্থ্য থাকিতে তিনি কাহারও সাহায্য-প্রত্যাশী নহেন, তবে মন্মথনাথের যত্ন তাহার আনন্দের বিষয়, অসময়ে তিনি যেন দিদিমার সংবাদ লন, ইহাই কামনা। এখন কাহারও নিকট সাহায্য লইলে হৃষীকেশের অপমান করা হইবে।

অসময়ের অপেক্ষায় ধৈর্য্য ধরিয়া থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া মন্মথনাথ নিরস্ত হইয়াছেন। কিন্তু অসময় আসিবার পূর্ব্বেই, একদিন দ্বাদশীর প্রভাতে জপাহ্নিক শেষ করিয়া, পূজার আসনে বসিয়া ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবার জন্য মাথা নোয়াইয়া—দিদিমা আর মাথা তুলিলেন না, চিরদিনের জন্য ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিয়া হৃষীকেশ মন্মথনাথকে সংবাদ দিলেন, শ্রাদ্ধের সময় মায়াকে লইয়া বোম্বাই যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সাশ্রুনয়না মায়া সে প্রস্তাবে অকস্মাৎ ব্যাকুলভাবে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ওগো না, না, সেখানে ফিরে যেতে আর বোল না।"

মন্মথনাথ দুঃখিত হইলেন। দিদিমার মৃত্যুর পর সেখানে মায়ার যাওয়ার অনিচ্ছা স্বাভাবিক বুঝিয়া, হৃষীকেশের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিলেন। কার্য্য ব্যস্ততার অনুরোধ জানাইয়া—সৌজন্যের সহিত ক্ষমা

চাহিয়া হৃষীকেশকে পত্র লিখিলেন এবং দিদিমার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য "যৎকিঞ্চিৎ" পাঠাইলেন।

তার পর কয়েক মাস কাটিয়াছে। শোক-বেগ সামলাইয়া লইয়া মায়া আবার সংসারের কাজে ভিড়িয়াছে, মন্মথনাথ বাহিরের কর্ম্ম কোলাহলে মিশিয়াছেন। সংসারের খুটিনাটি কাজকর্ম্ম লইয়া মায়া অষ্টপ্রহর ব্যস্ত থাকে, তাহার উপর পাড়া-প্রতিবেশী দীন-দুঃখীগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকার আছে—অনুরোধ এড়াইতে পারা যায় না। পড়াশুনায় আর ঝোঁক নাই, সে সব উৎসাহ ফুরাইয়া গিয়াছে। তবে সময় বিশেষে, দুঃসহ অস্বস্তির হাতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পুঁথী-পত্র নাড়া-চাড়া করিত মাত্র।

সে দিন রবিবার, আদলত বন্ধ, অন্য কাজও তেমন কিছু ছিল না। মন্মথনাথ ঘরে ছিলেন, কেদারার উপর আড় হইয়া শুইয়া একখানা বই পড়িতেছিলেন। বর্ষা-দ্বিপ্রহরে বাহিরের সমস্ত আকাশটা মেঘাচ্ছন্নতায় বিমর্ষ ম্লান হইয়া ঝিমাইতেছিল, সকাল হইতে অনেক বেলা পর্য্যন্ত টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িয়াছে—এখন বৃষ্টি ধরিয়াছে বটে, কিন্তু আকাশময় ফিকা-ছাই-বর্ণের মেঘস্তূপ জমা হইয়া রহিয়াছে, বোধহয় শীঘ্রই আবার বৃষ্টি আসিবে। বর্ষা-সজল বায়ু থাকিয়া থাকিয়া হু হু শব্দে হুঙ্কার দিয়া ছুটিতেছিল।

ধীর-কোমল পাদক্ষেপে মায়া কক্ষে ঢুকিয়া—সন্তর্পণ-চকিত নয়নে অধ্যয়নরত মন্মথনাথের পানে চাহিয়া, নীরবে দৃষ্টি ফিরাইল। টেবিলের কাছে আসিয়া হাতের সেলাইটা রাখিয়া দিল, অন্য খানিকটা নূতন কাপড় ও কাঁচি লইয়া বিছানার কাছে সরিয়া আসিয়া বালিশের

ওয়াড় মাপিয়া কাটিল। তারপর স্ঁচ স্তা লইয়া নীরবে প্রস্থানের উপক্রম করিল।

বইখানা মুড়িয়া কোলের উপর রাখিয়া, মন্মথনাথ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, "কোথা যাচ্ছ? এখনো কাজ শেষ হয়নি?"

এমন অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের আশা আদৌ ছিল না। চৌকাঠের সমীপবর্ত্তিনী মায়া ঈষৎ বিচলিত ভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল, ইতস্ততঃ করিয়া মৃদু স্বরে বলিল, "আমার কাজ সব শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ঠিকে-ঝি এখুনি কাজ করতে আস্‌বে, দেখি গে।"

"ওঃ, আচ্ছা যাও।" মন্মথনাথ পুস্তকখানা তুলিয়া পুনশ্চ পাঠে মনোযোগী হইলেন। মায়া ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিল, "কেন, দরকার আছে?"

মন্মথনাথ পুস্তকের উপর দৃষ্টি রাখিয়া অন্যমনে বলিলেন, "না দরকার এমন কিছু নয়"

মায়া নিশ্চিন্ত হইল। মন্মথনাথের আগ্রহান্বিত কণ্ঠস্বরে সে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবার বুঝিল তাহা আগ্রহ নহে! কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "বিশেষ যদি কিছু কাজ না থাকে, মাসকাবারি সংসার খরচটা আজ একবার দেখ্‌বে?"

পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া সস্মিত বদনে মন্মথনাথ বলিলেন, "চাল, ডাল, নুন, তেল, লঙ্কা, ফোঁড়নের হিসাব! মাসে মাসে প্রত্যেকবার কত দেখ্‌বো? ওটা তোমারি জিম্মায় থাক্।"

কুণ্ঠিত হইয়া মায়া বলিল, "তবু কম-বেশী পরিমাণটা—"

মাথা নাড়িয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "নিষ্প্রয়োজন। হরে-দরে এক

হাঁটু জলই দাঁড়ায় দেখি। এ মাসে একখানাও বই কিন্‌তে পার্‌লুম না, দরজির দেনাটা শোধ কর্‌তে সব শেষ হয়ে গেল।

মন্মথনাথ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মায়া স্তব্ধ হইয়া ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। হাতের বইখানা টেবিলের উপর রাখিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "এক এক সময় 'দিক্' ধরে যায়, ভাবি অনিশ্চিত উপার্জ্জনের আশা ছেড়ে অল্প স্বল্প মাইনেতে —যাই হোক একটা স্কুলমাষ্টারী কি কিছু চাকরী নিয়ে নিশ্চিন্ত হই। দেখ না, এ মাসের প্রথম ক'দিন বেশ চলেছিল, কিন্তু শেষের দিকে এই ক'দিন ত চুপ্ চাপ্ বসে আছি, কাজকর্ম্ম নেই, মন ভারি খারাপ হয়ে যায়।"

মায়া চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মন্মথনাথ বলিলেন, "আর কিছু নয়, সংসার খরচের জন্য দেনা কর্‌তে হলেই ত ভাবনার কথা। বিশেষ আমার মত অবস্থার লোকের পক্ষে—যাকে শুধু ব্যবসার মুখ চেয়ে গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় করতে হয়, তার পক্ষে আমার মত দুঃসাহস প্রকাশ করা বড়ই অন্যায় কাজ।"

দারিদ্র্য ও অভাবের আশঙ্কায় চিন্তা-তপ্ত স্বামীকে কিছু সান্ত্বনা বা সময়োচিত আশ্বাস দিবার জন্য—ভিতরে ভিতরে মায়ার মন অতিষ্ঠ-ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু কোন কথা বলিতে তাহার শক্তি জুটিল না। বেদনাঙ্কিত বিমর্ষ দৃষ্টিতে চাহিয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

অর্থাভাব দুশ্চিন্তার মাঝে, নিরুপায় মায়ার যে কোনই সদুত্তর দিবার ক্ষমতা নাই, তাহা মন্মথনাথের স্মরণ হইল। টেবিলের উপরকার

পুস্তকরাশির পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে ডাকিলেন, "মায়া।"

মায়া শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কেন?"

মন্মথনাথ বলিলেন, "তোমায় কি এখনি যেতে হবে?"

ইতস্ততঃ করিয়া মায়া বলিল, "একটু পরে গেলেও বোধ হয় চল্‌বে, ঝি এখনো আসেনি।"

মন্মথনথে বলিলেন, "তবে একটু ব'স না।"

মায়া দ্বিরুক্তি না করিয়া ফিরিয়া আসিয়া শয্যার উপর বসিল। মন্মথনাথ টেবিলের উপর হইতে একখানি বই তুলিয়া লইয়া, মায়ার নিকটে আসিয়া বসিলেন। সূচে সুতা পরাইতে পরাইতে মায়া মৃদুস্বরে বলিল, "কাল অত রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে যে সব কাগজপত্র দেখ্‌ছিলে সে সব কাগজ কার?"

বিষাদের হাসি হাসিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "শ্রীশবাবুর।"

মায়া বলিল, "তিনি ত প্রায়ই তোমার কাছে ওরকম কাগজ পাঠান।"

মন্মথনাথ বলিলেন, "শুধু তিনি কেন, আরও অনেকে পাঠান। ওগুলি আমার ব্যাগারের সৌভাগ্য—কর্ম্মহীন সময়, তাতে তবু অন্যমনস্কভাবে কাটে, কিন্তু এরকম অলসজীবন ভাল লাগ্‌ছে না, কি করি বল দেখি মায়া?"

মায়া নিবিষ্টচিত্তে সেলাই করিতে লাগিল, কোন উত্তর দিল না। মন্মথনাথ পুস্তকের পাতা উল্টাইতে-উল্টাইতে বিষণ্ণ-গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, "অনিশ্চিতের ওপর নির্ভর করে, কোন কাজে এগোতে নেই। তোমায় বিয়ে করে বড় অন্যায় করেছি, নয় মায়া?"

ত্রস্ত-চমকিত দৃষ্টি তুলিয়া মায়া বলিল, "কেন ?"

মন্মথনাথ বলিলেন, "নূতন জীবনে আপনার ক্ষমতার ওপর অনেক বিশ্বাস রেখেছিলাম, কিন্তু এখন দিনে দিনে নিরুৎসাহ হচ্ছি। তোমায় হয় ত কখনো সুখী করতে পারব না মায়া।"

মায়া আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। মৃদু অবজ্ঞার হাসি তাহার অধর-প্রান্তে ফুটিয়া উঠিল, কোমল-কণ্ঠে বলিল, "শুধু পয়সায় ?"

মন্মথনাথ বলিলেন, "নয় কেন মায়া, অবস্থার অসচ্ছলতা সমস্ত উচ্চচিন্তাকে আহত করে—" কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মন্মথনাথ অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। গম্ভীরভাবে গুম্ফ মর্দ্দন করিতে করিতে চিন্তাকুল বদনে কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

মায়া উত্তর দিবার মত কিছু খুঁজিয়া পাইল না, হেঁট হইয়া নিজের কাজ করিতে লাগিল। নীচে হইতে ঝি ডাকিল, মায়া সেলাইয়ের সরঞ্জাম লইয়া উঠিয়া পড়িবার উপক্রম করিল, কিন্তু তখনই কি ভাবিয়া আবার সেগুলা রাখিল; নীচে গিয়া ঝিকে আবশ্যকীয় কাজের উপদেশ দিয়া অবিলম্বে ফিরিয়া আসিল। দেখিল মন্মথনাথ তখনও গম্ভীর বদনে আনমনে কি ভাবিতেছেন। মনের ক্লিষ্টতা গোপন করিয়া মায়া প্রফুল্লমুখে আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিল। সেলাইটা হাতে তুলিয়া লইয়া আপন মনে বলিল, "ভগবানের ইচ্ছায় দুবেলা দু'মুঠা অন্ন জুটছে এই ঢের, বেশীর দরকার কি ? আর চিরদিনই কি এমনি যাবে ?"

ঈষৎ হাসিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস নাই, আমিও বেশীর আকাঙ্ক্ষা করি না, তবে যা অত্যাবশ্যক তা চাই বই কি! এই দেখ, ব্যবসার জন্যে আইনের বইগুলো বড়ই দরকারী, কিন্তু খরচে

কুলিয়ে উঠ্‌তে পার্‌ছি না, মাসে একখানা বই, তাও কিনতে পারছি না। তাই ভাব্‌ছি, ওকালতী ছেড়ে দিয়ে চাকরী করি।"

মন্মথনাথ সমসাময়িক নব্য উকীলগণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "এদের অবস্থা দেখে আরও ঘৃণা জন্মে গেছে, ওকালতীর ওপর নির্ভর করে আর সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।"

মায়া বলিল, "ধৈর্য্য ধরে আর কিছু দিন চেষ্টা কর, পরিশ্রমের পুরস্কার আছে বৈকি! ভগবান কি এমনই করবেন?"

ঈষৎ হাসিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "তোমার মত সরল বিশ্বাসে ভগবানের ওপর নির্ভর কর্ত্তে পার্‌লে খুবই নিশ্চিন্ত হতুম মায়া, কিন্তু বিয়ের পর থেকে—তোমার জন্যে ভাব্‌তে হচ্ছে। এখন আমার যে রকম অবস্থা, তাতে আজ যদি হঠাৎ মারা যাই, কি অসুখ হয়ে দু'মাস পড়ে থাকি—তা হলেই ত চক্ষু স্থির।"

মায়ার বুকের মধ্যে ব্যাকুলতার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিল, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে হতবুদ্ধির মত মন্মথনাথের পানে চাহিয়া রহিল! একটা বেদনাকুল আতঙ্কের দীপ্তি তাহার দৃষ্টিতে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল। মায়া কথা কহিতে পারিল না।

মন্মথনাথ অপ্রতিভ হইলেন। কাল্পনিক অবস্থা-ব্যবস্থার নির্দ্দয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, নির্ব্বোধ মায়াকে ভীত করিয়াছেন বলিয়া নিজের উপর ক্ষুব্ধ হইলেন। তাড়াতাড়ি সস্নেহে তাহার হাত দুইটি ধরিয়া নিকটে টানিয়া আনিয়া সহৃদয়ভাবে বলিলেন, "আমি কথার-কথা বল্‌ছি, কিন্তু পৃথিবীতে অসম্ভব ত কিছুই নেই। যাক্ এখন সে সব বাজে কথা,

একটু পড়াশুনার চর্চ্চা করা যাক্ এস, বাদলার দিনে কিছুই ভাল লাগে না, কি পড়ি বল দেখি।"

ক্ষীণ কণ্ঠে মায়া বলিল, "যা তোমার খুসী।"

ক্ষুণ্ণভাবে ভৎর্সনার স্বরে মন্মথনাথ বলিলেন, "তোমার মন বড় দুর্ব্বল মায়া, তুচ্ছ কথায় একেবারে মুস্‌ড়ে পড়। সামান্য ঘটনায় কি অমন দমে গেলে চলে, ছিঃ!"

মায়া মুখে হাসিল, কিন্তু দৃষ্টি তাহার অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, আত্মসম্বরণের জন্য তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। শয্যাপ্রান্তে একখানা বাঙ্গলা উপন্যাস পড়িয়াছিল, সেইখানা টানিয়া লইয়া, যথেচ্ছভাবে তাহার মাঝখানটা খুলিয়া, সেইদিকে দৃষ্টি স্থির বদ্ধ করিল। মন্মথনাথ তাহার স্কন্ধের উপর ঝুঁকিয়া বইখানা দেখিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "আনন্দ-মঠ পড়্ছ? একি শান্তি ও জীবানন্দের সাক্ষাৎ?"

মায়া সংক্ষেপ উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

মন্মথনাথ বলিলেন, "আচ্ছা বল দেখি আমি এইখানটায় লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে রেখেছি কেন?"

মায়া উদাসভাবে বলিল, "কি জানি কেন?"

মন্মথনাথ তাহার কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবার জন্য, প্রশ্নটা নানারকমে ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু মায়া সেলাইটা দৃষ্টি সম্মুখে তুলিয়া, অন্যমনস্ক, নিরুৎসাহভাবে, শুধু 'জানি না' 'বুঝি না' বলিয়া তাহা উড়াইয়া দিল। মায়াকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য মন্মথনাথ কৃত্রিম বিরক্তির সহিত বলিলেন, "মায়া শুন্‌ছ?"

ত্রস্ত-চঞ্চল দৃষ্টি তুলিয়া মায়া বলিল, "বল না শুন্‌ছি।"

উকীলি-জেরার ধরণে মন্মথনাথ বলিলেন, "শান্তির সঙ্গে দেখা হবার নামে জীবানন্দ সন্ন্যাসী হেসে উড়িয়ে দিলে—কিন্তু মামলা জিতে নিমাই যখন শান্তিকে আন্‌তে গেল, তখন জীবানন্দ বেচারা অমন করে বসে কাঁদলে কেন?"

সূত্রপ্রান্তে গ্রন্থি দিতে দিতে মায়া বলিল, "কি জানি।"

উৎসাহের লক্ষণ না দেখিয়া মন্মথনাথ অসহিষ্ণুভাবে তাহার সেলাই কাড়িয়া লইলেন, বলিলেন, "শুনছ?"

বিষণ্ণ-ম্লানভাবে হাসিয়া মায়া বলিল, "শুন্‌ছি বল।"

নিরুপায় মন্মথনাথ একতরফা ডিক্রির চেষ্টা ধরিলেন, বলিলেন, "এই কথা নিয়ে একদিন আমার সঙ্গে—শ্রীপতির তর্ক হয়েছিল। সে যা বলেছিল তা আর শুনে কাজ নাই, কিন্তু আমার যা মনে হয়েছিল, তার চুম্বকটা মার্জ্জিনে নোট করে রেখেছি। কি মনে হয়েছিল বল দেখি?"

মায়া বলিল, "বল্‌তে পারলুম না, তুমি বল।"

প্রশ্নোৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "জীবানন্দের মত লোকের পক্ষে এখানকার ব্যবস্থাটা খাপছাড়া হয়েছে বলে মনে হয় না?"

মায়া মৃদু স্বরে বলিল, "হতে পারে।"

মন্মথনাথ সকৌতুকে মায়ার মুখের পানে স্থির দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "হতে পারে! কেন-হতে পারে বল দেখি?"

মূঢ়ের মত মায়া উত্তর দিল, "তা জানি না।"

মন্মথনাথ হাসিয়া বলিলেন, "জান না, অথচ বল্‌ছ—বাঃ!"

অপ্রতিভ মায়া কুণ্ঠিত ভাবে বলিলেন, "আচ্ছা তুমি বুঝিয়ে দাও।"

মন্মথনাথ বলিল, "ভাল, সরে এস। ভাবুকের দৃষ্টি অবশ্য ফরমাসের মাপে তৈরী হয় না, কিন্তু যেমন করেই হক্‌, তার মধ্যে সামঞ্জস্যের সুর একটা থাকে। জীবানন্দকে গোড়া থেকে আরম্ভ করে এতদূর পর্য্যন্ত দেখ্‌লুম, সদানন্দ, বেপরোয়া, বেদরদী, আধপাগলা, ছেলেমানুষ, কেমন ত? কিন্তু এইখানে আমরা লোকটাকে হঠাৎ আশ্চর্য্য ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখ্‌লুম, নয় কি?"

মায়া এ সকল অনাবশ্যক তত্ত্ব লইয়া, কোনদিন মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিয়াছিল কি না, তাহা নিজেই স্মরণ করিতে পারিল না। তাহার সমশ্রেণীস্থ পাঁচজনে যেমন সময় কাটাইবার জন্য পুঁথী-পত্র লইয়া সখের মাথায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক নাড়াচাড়া করে, পড়িতে হয় তাই পড়ে—সেও বোধ হয় সেইরূপ ভাবে পড়িয়াছিল। কোন কিছু বোঝাবুঝির দুশ্চেষ্টা তাহার ছিল না, তাহার চেষ্টা-চর্চ্চার প্রাণ যে বহুদিন পূর্ব্বে ফুরাইয়া গিয়াছে। আভ্যন্তরিক উৎসাহ উদ্যমের আবেগে, একদিন সে জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য্য সুষমাপুষ্ট, সুবিমল আনন্দ-মাধুরী-স্নাত ওজস্বী-দীপ্তিগরিমার পানে, উৎসুক বিস্ময়ে চাহিয়া—অতর্কিতে মুগ্ধ-ভ্রমে আত্মবিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়াছিল, প্রাণাকুল ব্যগ্রতায় আত্মহারা উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছিল—সে মর্ম্মান্তিক বিক্ষোভ অনুতাপ যে ইহজীবনে ভুলিবার নয়! সরলা কিশোরীর মাধুর্য্য-কোমল হৃদয়ের অকুণ্ঠিত করুণা লইয়া যেদিন সে জগতের সম্মুখে শান্ত-নির্ম্মল দৃষ্টি তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেদিন আজ নাই! সম্ভ্রম-গৌরবের উন্নত মহিমায়

দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে। থতমত খাইয়া দৃষ্টি নামাইল, জড়িতস্বরে বলিল, “তাই বল্‌ছি।”

মন্মথনাথ বলিলেন, “ওগুলো তোল্‌বার দরকার নাই, ওযে গ্রন্থকর্ত্তার রচনা: আমি শুধু আমার রচনাটুকু তুলে দেব। ছাপার দাগ কি তোলা যায়, পাতাশুদ্ধ যে ছিঁড়ে যাবে?”

“ও!” মায়া অত্যন্ত নিরুৎসাহ ভাবে ধীরে ধীরে পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া মন্মথনাথ সহসা উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন, “তোমার কি ছেলেমানুষী বুদ্ধি মায়া!—এ দাগগুলা শুদ্ধ!”

নিঃশব্দে মায়ার দৃষ্টি অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই ছাপার হরফ, ইহাকে কিছুতেই উঠাইবার যো নাই—ইহা গ্রন্থকর্ত্তার রচনা! ইহা পাষাণের বুকে খোদাই করা চিত্রের মতই নিস্পন্দ নিশ্চল, পর্ব্বতের মতই অটুট্‌ সুদৃঢ়! ইহাকে সরাইবার, নড়াইবার উপায় নাই তবে ইহার পাশে—ঐ স্বহস্ত অঙ্কিত যাহা কিছু—তাহাকে নিজের চেষ্টায় ঘষিয়া-মাজিয়া বিলুপ্ত করিতে পারা যায়!

তাহাকে স্তব্ধ-নিরুত্তর দেখিয়া, মন্মথনাথ স্নেহ-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, “মায়া, কি ভাব্‌ছ?”

মায়া চকিত-নয়নে ফিরিয়া চাহিল। মাথা নাড়িয়া জানাইল, ‘কিছুই না।’

বাহিরে প্রবলবেগে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছিল, মন্মথনাথ তাঁহার অফিস-ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া আসিবার জন্য উঠিয়া গেলেন। মায়া কক্ষতলে ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িয়া মুক্তকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। তাহার সজীব

নের পশ্চাতে যে নির্জ্জীব হৃদয়টি অহরহ বিশ্বব্যাপী পরিতাপ নিষ্পেষণে ক্লিষ্ট-অবসন্ন হইয়া উঠিতেছে—এ যে তাহারই বেদনা-ব্যাকুল ক্রন্দন। হে জগদীশ্বর, হে জগৎ কবি—ক্ষুদ্র কীটাণুকীটের স্পর্দ্ধা-দুঃসাহস ক্ষমা কর! আজ তাহার সকল শক্তি লোপ পাইয়াছে, আজ সে মৃত্যু-বেদনাচ্ছন্ন, মরণাহত! তোমার রচনা যাহা কিছু তাহা সবই অব্যর্থ—সমস্তই অমোঘ অখণ্ডনীয়! কিন্তু তাহার আশে পাশে, আপনার দিক হইতে সে যাহা কিছু রচনা করিয়াছে—হে দীননাথ শক্তি দাও, সে সমস্ত একেবারে মুছিয়া ফেলিতে—ইহজন্মের মত একেবারে, ভুলিয়া যাইতে সাহস দাও। হে অন্তর্য্যামী, তুমি জান, কায়মনে আত্মত্যাগের সাধনায় সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, এবার তুমি তাহাকে আত্মজয়ের শক্তি দাও।

মায়া চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল। বাহিরের বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়াছিল, আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছিল। মায়া স্থির অপলক নয়নে, ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

একখানা বই হাতে করিয়া মন্মথনাথ ঘরে ঢুকিলেন, বলিলেন, "বাঃ, তুমি যে এখনো বসে আছ, আমি বাইরের ঘরের সার্শি বন্ধ করে দিচ্ছেই এতক্ষণ আইনের বই পড়ে সময় নষ্ট করলুম?"

তিনি আসিয়া মায়ার পাশে দাঁড়াইলেন। মায়ার দৃষ্টি-লক্ষ্যে আকাশ পানে চাহিয়া বলিলেন, "এক পশলা বৃষ্টিতে আকাশটা কেমন সুন্দর পরিষ্কার হয়ে গেল দেখ। সমস্ত দিনের পর এতক্ষণে পশ্চিমে সূর্য্য উঠ্‌ছে, বাঃ?"

মায়া শান্ত-স্বচ্ছ দৃষ্টি তুলিয়া, স্থির নয়নে মন্মথনাথের পানে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। মন্মথনাথ তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া স্নেহময় কণ্ঠে ডাকিলেন, "মায়া।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেড় বৎসরের পর নিরঞ্জন আজ আবার সুরাটের সুন্দর-মঠে ফিরিয়া আসিয়াছে। বৎসরাধিককাল হইল, চিত্তরঞ্জনদেবের মৃত্যু হইয়াছে, দেবরঞ্জন এখন জয়পুরে শিল্পবিদ্যালয়ে শিল্পবিদ্যা শিখিতেছে।

গান্ধার হইতে ফিরিয়া নিরঞ্জন, মহীশূর, রেওয়ার ও অন্যান্য স্থানে কাজ করিয়া বেড়াইয়াছে। অদ্ভুত অধ্যবসায় বলে সে এখন আর্য্যাবর্ত্তের ভাস্কর সমাজের প্রথম স্থানীয় একজন গৌরবশালী ভাস্কর, দেশ-বিদেশে তাহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নবীন ভাস্করের আশ্চর্য্য প্রতিভায়—খ্যাতি প্রতিষ্ঠাশালী প্রসিদ্ধ ভাস্করগণ মুগ্ধ বিস্মিত।

দ্বিপ্রহরে মহারাজ কাছারীতে কাজকর্ম্ম দেখিতেছিলেন, পথ-পর্য্যটন-শ্রান্ত নিরঞ্জন ধূলা পায়ে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তাহার কেশরাশি রুক্ষ বিশৃঙ্খল, মুখভাব শুষ্ক মলিন, আকৃতি ঠিক পূর্ব্বের মতই কৃশ, দীর্ঘ। মহারাজ তাহার দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন, স্বাগত প্রশ্নাদির পর, চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু জন্য দুঃখসূচক মন্তব্য ও সময়োচিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া, ভৃত্যের সহিত তাহাকে স্নানাহার ও বিশ্রামের জন্য বিদায় দিলেন। বৈকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন।

মঠে পরিচিত অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নিরঞ্জনের প্রশংসা খ্যাতি সকলেই শুনিয়াছিল, উৎসুক-আগ্রহে সকলে নিরঞ্জনকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। সকলেই একবাক্যে বলিল, নিরঞ্জনের যশঃ-সৌরভ-খ্যাতি

দূরদূরান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেজন্ত তাহারা সকলে বড়ই আনন্দিত। নিরঞ্জন ম্লানমুখে হাসিয়া বিনীত নমস্কার করিল।

নিরঞ্জনের চরিত্রের সম্ভ্রম সংযত শিষ্ট ব্যবহারগুণে সকলেই তাহার উপর প্রীত-সন্তুষ্ট ছিল, কেহ কখনও তাহার স্বভাবে অহঙ্কার ঔদ্ধত্যের নাম-গন্ধ খুঁজিয়া পাইত না। কিন্তু তবুও সে বহু জনাকীর্ণ লোক-সমাজের মধ্যে বাস করিয়াও এমন একটা অনাড়ম্বর সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্য-গণ্ডি নিজের চতুর্দ্দিকে সৃষ্টি করিয়াছিল যে, অতিবড় কৌতূহলী প্রাণীও সে গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তাহাকে ধরিতে পারিত না। যাহারা দূর হইতে তাহার সৌভাগ্য গৌরবের খ্যাতি শুনিয়া, কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইত—নিরঞ্জনের নিকটে দাঁড়াইয়া তাহারা তাহার আকৃতির নিষ্প্রভ ম্লানিমা ও প্রকৃতির মৌন-নিরীহতা ছাড়া আর কিছুই বিশেষ খুঁজিয়া পাইত না। সকলে আশ্চর্য্য বোধ করিত।

কয়দিন পূর্ব্বে সে জয়পুরে গিয়া দেবরঞ্জনকে দেখিয়া আসিয়াছে। শিল্পবিত্থালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট চিত্তরঞ্জনের যথেষ্ট সম্মান ছিল, উদীয়মান প্রতিভাশালী ভাস্কর নিরঞ্জনও সেখানে গিয়া এবার প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে। গুণগ্রাহী অধ্যক্ষ মহাশয় তাহার নৈপুণ্য, পাণ্ডিত্য ও একাগ্র অধ্যবসায় চেষ্টার পরিচয় পাইয়া প্রীত হইয়া অযাচিত আগ্রহে দেশ বিদেশের প্রসিদ্ধ ভাস্কর ও তাঁহার পরিচিত গণ্যমান্ত রাজা মহারাজা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নামে পরিচয় পত্র দান করিয়াছেন। নিরঞ্জনের হাতে এখন কাজকর্ম্ম তেমন কিছু নাই, সে দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্তে বাহির হইয়াছে।

বৈকালে মহারাজের অবসর সময়ে তাঁহার ভৃত্য আসিয়া নিরঞ্জনকে

ডাকিয়া লইয়া যাইবে কথা ছিল—কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও নিরঞ্জন ভৃত্যের দেখা পাইল না। নিশ্চেষ্টভাবে সময় কাটান অসাধ্য, নিরঞ্জন নির্জ্জন বিশ্রাম কক্ষে বসিয়া অধ্যক্ষ মহাশয় লিখিত পরিচয়-পত্রগুলি ভাল করিয়া পড়িতে আরম্ভ দিল।

কি প্রশংসা পরিচয়, কি সম্মান, সাত ছত্রের বেশী নিরঞ্জন পড়িতে পারিল না। মর্ম্মান্তিক আক্ষেপে, তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, দৃষ্টি অশ্রুপ্লুত হইল। ছিঃ, হতভাগ্যের অদৃষ্টে এত পরিতাপ, লাঞ্ছনাও ছিল! একি সম্মানের অর্ঘ্য? না না, এ যে ক্ষোভের ভ্রুকুটি পীড়ন! কেহ জানে না, জানে শুধু সে! তাহার শিল্প-সাধনা যে কতখানি প্রবঞ্চনা ধিক্কারে কলঙ্কিত, কতখানি অপরাধে অভিশপ্ত— তাহার পরিমাণ জানেন অন্তর্য্যামী! মানুষ শুধু তাহার বাহ্য সফলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বাহবা দিতেছে, কিন্তু হায় আভ্যন্তরিন্ অবস্থা!

পরিচয়-পত্রগুলা ফেলিয়া নিরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার ইচ্ছা হইল সে একবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, কিন্তু পারিল না। হায়, কোথায় আজ তাহার সেই পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের নিষ্কলঙ্ক, নিশ্চিন্ত, নির্ভয়, নগণ্য শিল্পীজীবন! সে জীবন তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তিহীন ছিল বটে, কিন্তু সে জীবন তাহার স্বর্গের অপেক্ষা অধিক শান্তিময় ছিল! নিজস্ব ভয় ভাবনার স্থান হৃদয়ে ছিল না, যাহা ছিল তাহা পরস্ব সুখদুঃখের চিন্তা, উদার সহানুভূতি, অকপট সহৃদয়তা। নিষ্ঠা, ভক্তি, প্রেমের আরাধ্য বিশ্বনাথের, বিশ্বের চিরন্তন বৈচিত্র্য-মাধুর্য্যের দীপ্তি তখন তাহার নবোন্মেষিত দৃষ্টিতে সন্তঃ প্রতিভাত হইয়াছিল। বিমল-

সুন্দর তরুণ জীবনকে অপূর্ব্ব বিস্ময় মুগ্ধতায় অফুরন্ত আনন্দোৎসাহে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, সে কি দিন!

কিন্তু তারপর? না, তারপর তাহার চিন্তাশক্তি লোপ পাইয়া যায়: কি প্রকাণ্ড ভ্রান্তির কুহকে সে জড়াইয়া পড়িয়াছে!

নিরঞ্জন অধীরভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল। হায় রে জীবনের শ্রদ্ধা, সংযম, সাধনা—শিল্পপূজা! কপটাচারী মানব-হৃদয়ের দুর্বিনীত অনুভূতি-বোধকে অভিশাপ দিলে, অভিসম্পাতের অবমাননা করা হয়, ধিক্! আর ততোধিক ধিক্কার, তাহার শিল্পী-জীবনকে! হতভাগ্য নিরঞ্জন, কুক্ষণে সৌন্দর্য্য-বৈচিত্র্যের বিশেষত্ব দেখিবার জন্য, বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াছিল। তাহার চক্ষে অগ্নি-ইন্দ্রজালে মহানেশার ঘোর জমিয়া গিয়াছে,: সে নেশা—বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার মাঝে, আত্মতৃপ্তি চাহে! সে বড় ভয়ানক! নিরঞ্জন কিছুতে তাহার হাতে নিষ্কৃতি পাইতেছে না, শত চেষ্টায় নয়—সহস্র যত্নে নয়—লক্ষ সাধনায় নয়! তাহার সব শ্রম পণ্ড হইয়া যাইতেছে।

উৎসাহিত পাদক্ষেপে হাস্যোৎফুল্লবদনে একব্যক্তি ঘরে ঢুকিয়া সাগ্রহে বলিল, "নমস্কার ভাস্কর—পুরাতন বন্ধুকে স্মরণ কর্‌তে পার?"

চিত্তের সমস্ত বিক্ষিপ্তগতি সবলে সংযত করিয়া নিরঞ্জন সোজা হইয়া দাঁড়াইল। ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "না—কে আপনি?"

আগন্তুক যুবক বিস্মিত হইয়া বলিল, "চিন্‌তে পার্‌লে না? আমি সহদেব, সুন্দর-মঠের দেওয়ান রঘুদেবের পুত্র।"

চমকিয়া নিরঞ্জন বলিল, "হাঁ হাঁ স্মরণ আছে, দুই বৎসর পূর্ব্বে আপনাকে দেখেছি, আপনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।"

ঈষৎ হাসিয়া যুবক বলিল, "হাঁ বন্ধু।"

দুইজনে সংক্ষিপ্ত কুশল প্রশ্নাদি হইল। যুবক তাহার শিল্প-প্রতিভার প্রশংসা গৌরবের খ্যাতি উল্লেখে আনন্দ প্রকাশ করিয়া নানা কথা বলিল। অন্যমনস্ক নিরঞ্জন বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, বাহিরের দিকে চাহিয়া নিস্তব্ধ রহিল।

ইতিমধ্যে নিরঞ্জনের পরিত্যক্ত পরিচয়-পত্রগুলির উপর কৌতূহলী যুবকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কথার মাঝখানে থামিয়া, সে সাগ্রহে সেইগুলি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল; অন্যমনা নিরঞ্জন চাহিয়া দেখিল না, কিছু বলিল না। যুবক পড়িতে পড়িতে সহসা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাঃ, বাঃ, আমরা অব্যবসায়ী, শিল্পবিদ্যার মর্ম্ম বুঝি না, কিন্তু যারা এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রস বিচারে নিপুণ—তারাও তরুণ ভাস্করের প্রতিভায় মুগ্ধ? আশ্চর্য্য, নিরঞ্জন তোমার অদ্ভুত শক্তি!"

বিস্মিত দৃষ্টি ফিরাইয়া নিরঞ্জন বলিল, "কি?"

বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া যুবক বলিল, "শিল্প কৌশলে তুমি অদ্ভুত ক্ষমতা লাভ করেছ।"

নিরঞ্জন উদাসভাবে হাসিল, ধীর কণ্ঠে বলিল, "হাঁ মহাশয়, অদ্ভুত ক্ষমতা। জন্মগত সংস্কার-মাহাত্ম্যে অনুভূতির মধ্যে তীব্র চেতনা বিদ্যমান—শিল্পকৌশলে বর্ব্বরতা প্রকাশ অসম্ভব যে। কিন্তু যদি শাণিত ছুরিকা সঞ্চালনের কৌশল অভ্যাস করতেম তা হ'লে আজ, পৃথিবীর সজীব আবেগমত্ত হৃদ্‌পিণ্ডগুলাকে রক্তমাংসে গড়া—বক্ষঃপঞ্জরের বেষ্টন-পীড়া থেকে মুক্তি দেওয়ায়, স্বাধীনতা দেওয়ায়, আমার আরও অদ্ভুত দক্ষতা দেখ্‌তেন।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া যুবক বলিল, "ভাস্কর, তোমার স্বভাব বড় অদ্ভুত! তোমার ভাষা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য!"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল, "নিশ্চয়!"

দ্বারের নিকটে জুতার শব্দ হইল, নিরঞ্জন চাহিয়া দেখিল মহারাজ আসিতেছেন। সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আপনার ভৃত্যের অপেক্ষায় আমি এতক্ষণ বসেছিলাম মহারাজ।"

ঈষৎ হাসিয়া মহারাজ বলিলেন, "কারুর অপেক্ষায় বসে থেকে অকারণ সময় নষ্ট করা নির্ব্বোধের কাজ, অনভিজ্ঞের দল, সাবধান!"

নিরঞ্জন হাসিল। সত্যই ত সে অত্যন্ত নির্ব্বোধ! উদ্দেশ্যহীন হৃদয়ে অজ্ঞাত প্রতীক্ষার পথ চাহিয়া—অকারণে কত সময় নষ্ট করিতেছে! বাধ্যতার তাড়নায় চোখ কাণ বুজিয়া কর্ত্তব্যপথে যাত্রা করিয়াছে, কিন্তু এ ভ্রমণে তাহার না আছে শান্তি, না আছে তৃপ্তি, না আছে আনন্দ। তবু ইহাই তাহার একমাত্র সম্বল।

মহারাজ তাঁহার যুক্তিযুক্ত কৌতুকের উত্তরে কোন একটা সরসবাক্য শুনিবার প্রত্যাশায় সহদেবের মুখপানে চাহিলেন। তাঁহার সরল পরিহাস-প্রবণ, মুক্ত সুন্দর হৃদয়ের নিকট যুবা, বৃদ্ধ, উচ্চ, নীচ কিছুরই দ্বিধা-বিচার ছিল না—সকলেই তাঁহার আনন্দ-সহচর! কিন্তু সহদেব তাঁহার কথার উত্তরে কিছু বলিল না, সে তখন অত্যন্ত মনোযোগের সহিত হস্তস্থ পরিচয়-পত্রগুলির ধূলা ঝাড়-ফুঁক করিয়া সযত্নে সেগুলিকে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া, একাগ্র দৃষ্টিতে তাহার অক্ষর মালার সসজ্জ বিন্যাস ভঙ্গী অবলোকন করিতেছিল। মুগ্ধ তন্ময়তায় সে নিজের কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল, একবার দৃষ্টি তুলিয়াও চাহিল না।

মহারাজ তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি ওগুলা? দেখ্‌তে পারি?"

সহদেব সসম্ভ্রমে, আনন্দ-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "অবশ্য! নিশ্চয় দেখ্‌তে পারেন, দেখুন মহারাজ কি সুন্দর প্রশংসা পত্র!"

মহারাজ তাহার হাত হইতে পরিচয় পত্রগুলা লইয়া নীরব গম্ভীর বদনে পাঠ করিলেন। তারপর নিরঞ্জনের দিকে চাহিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তোমায় স্নেহ কর্‌তে ভয় হয় নিরঞ্জন, তুমি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সম্মান-পাত্র।"

আহত চিত্তে নিরঞ্জন বলিল, "অদৃষ্টের বিদ্রূপ মহারাজ! উৎসন্ন যাক্‌—" তারপর হঠাৎ সে কথা উল্টাইয়া লইয়া ব্যস্তভাবে বলিল, "আপনি নির্ম্মল-মঠে সাধু-সম্ভাষণে যাবেন?"

গোপন-বিস্ময় নীরবে দমন করিয়া মহারাজ বলিলেন, "হাঁ তুমি যাবে ত, চল তা হ'লে।"

"চলুন।" নিরঞ্জন পাগড়ী উঠাইয়া লইয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "চলুন মহারাজ।"

মহারাজ তাহার নগ্ন-চরণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জুতা?"

সবিনয়ে নিরঞ্জন বলিল, "সাধু দর্শনে—"

বাধা দিয়া মহারাজ বলিলেন, "হলোই বা! পথ চিরদিনই কঙ্কর-প্রস্তরাকীর্ণ সুকঠিন পথ। বিনামার প্রয়োজন পথে ভ্রমণের জন্যই, দেবমন্দিরের দ্বারে গিয়ে জুতা ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।"

সহদেব সোচ্ছ্বাসে "ঠিক্ ঠিক্" বলিয়া নিরঞ্জনের পানে চাহিল।

নিরঞ্জন ম্লান হাসি হাসিয়া বিমর্ষ চিন্তাকুল বদনে, জুতা পরিতে লাগিল। সহদেব বলিল, "তুমি হাস্‌ছ ভাস্কর ?"

নিরঞ্জন উত্তর দিল, "নিজের দুঃখে! আসল হারিয়ে, নিশ্চিন্ত আরামে সুদের হিসাবে ব্যতিব্যস্ত থাকায় কোন লাভ আছে কি না, তাই ভাব্‌ছি।"

রহস্য ভাবিয়া সহদেব সকৌতুকে বলিল, "প্রয়োজনীয় চিন্তা! কিন্তু দাঃ, সত্যই ভুলে চল্লে. তোমার পত্রগুলা নিয়ে যাও।"

গমনোদ্যত নিরঞ্জনের সম্মুখে আসিয়া সহদেব তাহার বুকপকেটে পত্রগুলা রাখিয়া দিতে গেল, নিরঞ্জন বাধা দিয়া বলিল, "ওখানে নয়, পাশের পকেটে।"

আপত্তি-সূচক কণ্ঠে সহদেব বলিল, "আহা না, এগুলা দরকারী জিনিস, সাবধানে রাখা চাই—বুকপকেটে।"

হতাশ-করুণ কণ্ঠে নিরঞ্জন বলিয়া উঠিল, "ওটা ছেঁড়া বন্ধু ছেঁড়া, সম্পূর্ণই ছেঁড়া। ওখানে স্থান নাই, পাশের পকেটে রাখ।"

মহারাজ বিস্মিত নয়নে নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া রহিলেন। সহদেব অপ্রতিভ হইয়া যথানির্দ্দেশ মত কাজ করিল। নিরঞ্জন—মহারাজের পশ্চাতে নিঃশব্দে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, সহদেব অন্য কাজে চলিয়া গেল।

মহারাজ নীরবে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, সহসা কি যেন মনে পড়ায় ব্যগ্রভাবে বলিলেল, "নিরঞ্জন, আমার নূতন শিষ্য মদনকে দেখেছ ?"

নিরঞ্জন বলিল, "না মহারাজ, তিনি কোথায় থাকেন ?"

মহারাজ বলিলেন, "নির্ম্মল-মঠে ব্রহ্মচারী পণ্ডিতগণের সঙ্গ লাভে

তার বড় আগ্রহ, সে সেইখানেই থাকে। সে অল্পবয়স্ক, বিদ্যারাধনায় শাস্ত্রচর্চ্চায় তার বড় উৎসাহ। হাঁ, তার মানে সে আজও অবিবাহিত —তা ছাড়া সংসারে ত্রিকুলে তার কেউ নাই।"

প্রতিধ্বনির মত নিরঞ্জন বলিল, "কেউ নাই?"

মহারাজ বলিলেন, "না কেউ না। সে কলেজে লেখাপড়া শিখেছিল, এখন ছেড়ে দিয়েছে, সংস্কৃত চর্চ্চা করছে, তার মন কত সরল, চরিত্র বড় নির্ম্মল! কিন্তু তার হৃদয়-মন আজও অত্যন্ত অপুষ্ট—অপরিণত। তাকে বিশ্বাস করতে ভয় হয়, না হলে আমার বড় ইচ্ছা যে—" মহারাজ সহসা থামিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

নিরঞ্জন উৎসুক নয়নে চাহিয়া বলিল, "কি ইচ্ছা মহারাজ?"

চলিতে চলিতে মহারাজ বলিলেন, "তার মত শিক্ষান্বেষী—উন্নতচেতা, সাংসারিকতার প্রলোভন-স্পর্শমুক্ত কৌমার-ব্রহ্মচারী কোন বিশ্বাসী ব্যক্তিকে যদি পাই ত, আমাদের সম্প্রদায়ের—ন্যায়ানুমোদিত সংস্কার-কল্যাণ সাধনে উৎসর্গ করে দিই। তার উদ্যম-প্রফুল্ল তরুণ মুখখানির পানে চাইলেই আমার এই কথাটি মনে হয়, কিন্তু বলেছি তোমাকে, সে অনভিজ্ঞ, তাকে বিশ্বাস করতে আমার ভয় হয়।"

ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে নিরঞ্জন বলিল, "অনভিজ্ঞ অর্থাৎ কোন্ বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা আপনি চান?"

প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া মহারাজ বলিলেন, "তার হৃদয়-মনের শিক্ষণীয় যত কিছু বিষয় আছে, সে সমস্ত সম্বন্ধে যথাবশ্যক জ্ঞান, কিন্তু না নিরঞ্জন—কিছুদিন পরে তার শক্তির ওপর নির্ভর স্থাপন করা সহজ হ'তে পারে, কিন্তু এখন—না সে বড় অল্পবয়স্ক! শিক্ষা-সংসর্গে

তার স্বভাব উন্নত-মার্জ্জিত, বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ উত্তেজিত হয়েছে বটে, কিন্তু তার অন্য শিক্ষা—না অবিশ্বাস্য !”

“মহারাজ !” অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে কি বলিতে উদ্যত হইয়া, ক্ষণ মধ্যে কুন্ঠিত ভাবে নিরঞ্জন থামিল। মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “কি বল্‌তে চাও নিরঞ্জন বল।”

ইতস্ততঃ করিয়া অপরাধীর মত কুন্ঠিত ভাবে নিরঞ্জন বলিল. “স্পর্দ্ধা, দুঃসাহস ক্ষমা করুন মহারাজ। প্রয়োজনের আহ্বান শুনিলেই আমার চিত্ত উন্মুখ-আগ্রহে ছুটে যেতে চায়, নিজের মূঢ়-অযোগ্যতার কথা স্মরণ করে সে সংযত হতে জানে না।”

বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া মহারাজ বলিলেন, “অর্থাৎ ?” রুদ্ধকণ্ঠে নিরঞ্জন উত্তর দিল, “বামনের চন্দ্র আকিঞ্চন হাস্যাস্পদ মূঢ়তা সন্দেহ নাই, কিন্তু আকাঙ্ক্ষাটা সত্য মহারাজ !”

ব্যগ্র-অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে চাহিয়া মহারাজ বলিলেন, “শিল্পবিস্তার ওপর কি তোমার আর আগ্রহ নাই ?”

সজোরে নিরঞ্জন বলিল, “কিছু না মহারাজ কিছু না। আমার ঘৃণা জন্মে গেছে, ধিক্কার বোধ হয়েছে—বিতৃষ্ণায় জীবন জর্জ্জর হয়েছে।”

স্তম্ভিত স্বরে মহারাজ বলিলেন, “কেন নিরঞ্জন ?”

“জানিনে মহারাজ, অথবা যদিও কিছু জানি, তাও আপনাকে জানাতে অক্ষম বোধ হয় ! কিন্তু আপনি অবিশ্বাস করবেন না।” সহসা ফস্ করিয়া পকেট হইতে পত্রের গোছা টানিয়া বাহির করিয়া, চক্ষের নিমেষে নিরঞ্জন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। পথের ধূলায় ছিন্ন

পত্রাংশ ছড়াইয়া দিয়া অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "আবর্জ্জনা দূর হোক! সম্মানের রত্নপীড়ের নীচে, আপনাকে সমাধিস্থ করে নিশ্চিন্ত উল্লাসে, জগতের হাস্ত-কৌতুকে যোগদান করে বেশ সহজে দিন কাটাচ্ছি, কিন্তু শান্তি নাই মহারাজ, আমার কোথাও শান্তি নাই।"

সহসা মহারাজের বিস্ময়াহত দৃষ্টির উপর নিরঞ্জনের চক্ষু পড়িল। সে থতমত খাইয়া থামিল, আত্মসম্বরণ করিয়া কুণ্ঠা-নম্র মস্তকে বলিল, "মহারাজ, আমার প্রগল্‌ভ বর্ব্বরতা ক্ষমা করুন, বোধ হয় কোন রকম আকস্মিক উত্তেজনায়—"

বাধা দিয়া মহারাজ বলিলেন, "থাম, থাম নিরঞ্জন, আমায় ভেবে নিতে দাও।"

সংশয়-সঙ্কুচিত নিরঞ্জন আর কথা কহিতে পারিল না। নীরবে উভয়ে পথাতিবাহন করিয়া চলিলেন। নির্ম্মল-মঠ বেশী দূর নহে, শীঘ্রই তাহারা মঠের উদ্যান-বাটিকার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। চিন্তারত মহারাজ দ্বার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, নিরঞ্জনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নিরঞ্জন ও-প্রসঙ্গ এখন থাক। হাঁ আমি তোমায় মদনের কথা বল্‌ছিলেম, সে বুদ্ধিমান—তার উদ্দেশ্যও উচ্চ, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখেছি, তার স্বভাবটি সরল শিশুর ক্ষণস্থায়ী কৌতূহল চাঞ্চল্যে ভরা! ভাল কথা, অধিকারী-ভেদে সাধন-ভেদ, এ কথা তুমি মান কি?"

দৃঢ়স্বরে নিরঞ্জন বলিল, "মানি মহারাজ, খুব মানি, অনধিকারী অযোগ্যের পক্ষে—" ত্রস্তে অন্তরের সুপ্তোত্থিত আবেগ সজোরে দমন করিয়া নিরঞ্জন বলিল, "মহারাজ ক্ষমা করুন, আমি প্রশ্নের অযোগ্য।"

মহারাজ সে কথায় কান দিলেন না, আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "আমার যতদূর অনুমান, তাতে বল্‌তে পারি, মদনের অন্তরে ধর্ম্মপিপাসা জাগ্রহ হয়েছে, কিন্তু সে পিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য সংসার ত্যাগ করা যে তার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, এ কথা মান্‌তে পারিনে। 'যথার্থ-সন্ন্যাসীর' সাধন আর 'যথার্থ-সাংসারির' সাধন যে একই, কেবল বাহ্য-ক্রিয়ানুষ্ঠানগত পার্থক্য ছাড়া এর মধ্যে আর কোন দ্বন্দ্ব নাই, এ কথা বোধ হয় তুমি অস্বীকার কর না নিরঞ্জন?"

নিরঞ্জন দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। সে ত অস্বীকার কিছুই করে না, কিন্তু স্বীকার করিবার শক্তিই বা তাহার কই? সে না চেনে সংসারকে, না জানে সন্ন্যাসকে, অথচ—ভাগ্যহীন সে, উভয়ের মধ্যে অবস্থা-বৈষম্যের-দ্বন্দ্বে, তীব্র-নিষ্পীড়িত!

উভয়ে আসিয়া উদ্যান মধ্যস্থ লতামণ্ডপ নিকটবর্ত্তী হইলেন। লতামণ্ডপ মধ্যে দুই তিন ব্যক্তির কথোপকথন শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। মহারাজ বলিলেন, "চল, ঐখানে যাওয়া যাক, মদনের কথা শুন্‌তে পাচ্ছি।"

উভয়ে লতামণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহারাজকে দেখিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তিত্রয় সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিরঞ্জন দেখিল তাহাদের মধ্যে দুই ব্যক্তি বয়স্ক, দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া অনুমান হয়, অপর ব্যক্তি তরুণ যুবা, তাহার ওষ্ঠদেশে সদ্যঃ রোমাবলী রেখা প্রকটিত হইয়াছে। তাহার বেশভূষাও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতজনোচিত নহে, কলেজ ফেরতা নব্য-যুবকের ভব্য-সংস্করণ তাহাতে স্পষ্ট বিদ্যমান। নিরঞ্জন বুঝিল, এই ব্যক্তিই মদন। নিরঞ্জন ভাল করিয়া তাহার মুখপানে

চাহিল, মনে বড় প্রীতি অনুভব করিল। মহারাজ সত্যই বলিয়াছেন, এ মুখ অতি সরল, অতি পবিত্র—কোন নীচ-কুৎসিত ভাবের ছায়া তাহার অম্লান দীপ্তিকে এতটুকু মলিন করে নাই। কৈশোরের স্নিগ্ধ-লাবণ্য আজও তাহার মুখে-চোখে সহজ সুকুমার আনন্দে বিরাজ করিতেছে।

যথাবিধি স্বস্তি-উচ্চারণ, অভিবাদন-পর্ব্ব শেষ হইলে মহারাজ নিরঞ্জনের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ইনি-ই আপনাদের নির্ম্মল-মঠ নির্ম্মাতা ভাস্কর নিরঞ্জনদেব।" নিরঞ্জনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এই ছোকরা মদন, ভাল কথা নিরঞ্জন তোমায় বল্‌তে ভুলে গেছি, মদন সম্প্রতি মঙ্গল-মঠ থেকে বেড়িয়ে ফিরে এসেছে, সেখানে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে ওর খুব আলাপ হয়েছে, তিনি ওর উপর ভারি সন্তুষ্ট।"

অকস্মাৎ বহুদিন পরে নিরঞ্জনের বক্ষের মধ্যে কোন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন আবেগ সজোর-ধাক্কায় জাগিয়া তৃষ্ণাকুল দৃষ্টিতে তাকাইল। নিরঞ্জনের আত্মবিস্মৃতি ঘটিল, কয় মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া ধীরে স্খলিত কণ্ঠে বলিল, "নমস্কার বেদান্তবাগীশ মহাশয় শারীরিক কুশলে আছেন?"

প্রতিনমস্কার করিয়া, মদন বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

তারপর অসঙ্কোচে কৌতূহল-ব্যগ্র দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিয়া সসৌজন্যে বলিল, "আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। মঙ্গল-মঠ অবস্থান কালে মহাশয়ের যথেষ্ট সুযশ সুখ্যাতি শুনেছিলাম। আপনার ভাস্কর্য্য প্রতিভার গৌরব নিদর্শনও নানা দেশে দেখেছি, আপনি কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তি।"

শেষের কথা নিরঞ্জনের কানে ঢুকিল না। মঙ্গল-মঠের অতীত-স্মৃতি-মদিরা এক নিমেষে তাহার মনকে উগ্র মত্ততায় মাতাইয়া দিয়াছিল। একটা অজ্ঞাত-ব্যাকুলতার করুণ স্বর তাহার বুকের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইয়া ঘুরিতে লাগিল। বাক্যালাপের আবরণে নিজের বিচলিত ভাবটা, অপরিচিত ব্যক্তির দৃষ্টি হইতে গোপন করিবার জন্য নিরঞ্জন বলিল, "কেবলবাবু—বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র কেবলবাবু তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে? তিনি ভাল আছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ? তিনি চমৎকার লোক, আমার ওপর তাঁর অত্যন্ত অনুগ্রহ। আর মাসিমা—বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কন্যা—মহাশয় বোধ হয়—" মদন বাকী কথা অসমাপ্ত রাখিয়া কৌতূহল-উৎসুক নয়নে নিরঞ্জনের পানে চাহিল।

নিরঞ্জন দেখিল, মদন নিতান্তই স্বচ্ছ-সরল হৃদয় স্নেহময় শিশু! করুণাময়ী শান্তিদেবীর নামের পর নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিয়া সে যেরূপ আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে নিরঞ্জনের মন আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারিল না। বিনা আহ্বানেই নিরঞ্জন তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া দ্বিধাহীন চিত্তে, যেন কতকালের পরিচিতের মত আনন্দ-বিস্ফারিত নয়নে বলিল, "আপনি ত তা হলে পর নন, আমার ভ্রাতৃস্থানীয় আত্মজন। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কন্যা—আপনার মাসিমা—"

মদন সাগ্রহে নিরঞ্জনের হাত চাপিয়া ধরিয়া হর্ষোজ্জ্বল বদনে বলিল, "হাঁ শুনেছি, আপনি মাসিমার স্নেহাস্পদ পুত্র! আপনার সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বল্লেন। সম্প্রতি তাঁরা মহীশূরে বেড়াতে গেছ্লেন,

ভাগ্যক্রমে আমিও সঙ্গে ছিলাম, সেখানে আপনার শিল্পকার্য্য কতকগুলি দেবালয়ে দেখ্‌লুম। সকলেই ধন্য ধন্য সুখ্যাতি কর্‌ছেন!"

নিরঞ্জন বিমর্ষভাবে চুপ করিয়া রহিল। এ প্রশংসা আবার হঠাৎ যেন তাহাকে কশাঘাতের মত আহত করিল। মহারাজ স্নিগ্ধ-স্মিত হাস্যে বলিলেন, "মন্দ নয়, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে, আমরা অপরিচিত হয়ে ঠ'কে গেলুম। তোমরা ত চমৎকার জমিয়ে তুলেছ।"

মদন সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল, "আপনারই প্রাসাদাৎ মহারাজ!"

তারপর অন্যমনস্ক নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া—প্রশ্নের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া বলিল, "মঠের অধিকারী মহারাজ দেহরক্ষা করেছেন, তাঁর পুত্র দেবকীনন্দন এখন মঙ্গল-মঠের অধিকারী মহারাজ হয়েছেন, শুনেছেন?"

নিরঞ্জন তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি ফিরাইল, কিন্তু তাহার মুখভাব পর্য্যবেক্ষণে যে নিরঞ্জনের আগ্রহ আছে, তাহা বুঝাইল না। মদনের বাক্যের উত্তরে ধীরভাবে বলিল, "দেবকীনন্দন? কতদিন?"

"বৎসরাধিক কাল হবে, কিন্তু তিনি লোক ভাল নন, দুশ্চরিত্রতা, বিলাসিতায় তিনি অধঃপাতে গেছেন। মঠের সম্পত্তি সব উৎসন্ন যাবার যো' হয়েছে, তাঁর দেওয়ান-টেওয়ান সাঙ্গোপাঙ্গগুলিও সব সেই রকম জুটেছে। অত বড় মঠের মধ্যে এক মানুষ আছেন বেদান্তবাগীশ মহাশয়—তিনিও বিরক্ত-অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, ত্রাহি ত্রাহি কর্‌ছেন, কিন্তু তিনি কাজ ছাড়্‌লেই এখন মঠের সর্ব্বনাশ হবে। বেদান্তবাগীশ মহাশয় বিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ লোক, তিনি বল্‌ছেন, আমায় নিজের মান-অপমান সুখ-সুবিধার মুখ চেয়ে সরে দাঁড়ালে চল্‌বে না, মঙ্গল-মঠের

জন্য অনেক খেটেছি। বিপদের দিনে অর্ব্বাচীন অপদার্থগুলার হাতে মঙ্গল-মঠের সর্ব্বনাশের ভার দিয়ে আমি অকৃতজ্ঞের মত সরে পড়তে পারি না।"

উৎসাহের ঝোঁকে এক নিশ্বাসে এতগুলা কথা বলিয়া মদন উদ্‌গ্রীব হইয়া নিরঞ্জনের পানে চাহিল। নিরঞ্জন কিন্তু এত সংবাদের উত্তরে বলিবার মত মন্তব্য কিছুই খুঁজিয়া পাইল না, অন্যদিকে চাহিয়া উন্মনাভাবে কি যেন ভাবিতে লাগিল।

দ্রাবিড় পণ্ডিতদ্বয় পুঁথি হাতে লইয়া গম্ভীরভাবে বসিয়াছিলেন মহারাজ স্নিগ্ধ-কৌতুকোজ্জল দৃষ্টিতে মদনের মুখভাব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এইবার সস্নেহে হাসিয়া পার্শ্ববর্ত্তী পণ্ডিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পণ্ডিতজি, বালক মদন যে দীক্ষার উপযুক্ত, তার কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু নীলাচলে শ্যামানন্দ আচার্য্যের আশ্রম কি এর উপযুক্ত স্থান? না, এর সন্ন্যাস-সাধনার স্থান অরণ্য?"

পণ্ডিত সহাস্যে বলিলেন, "কি বল্‌ব মহারাজ? উনি ইংরেজি পড়ে তার্কিক হয়েছেন, এখনি তর্কের ঝড়ে আমাদের নাস্তানাবুদ করে তুল্‌বেন। কিন্তু অস্বীকার কর্‌তে পারি না মহারাজ, খুব বুদ্ধিমান লোক।"

মদন লজ্জিত হইল, ক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে মহারাজের পানে চাহিয়া বলিল, "মহারাজ আমার পক্ষে গুরু-করণের প্রয়োজনীয়তা কি—"

বাধা দিয়া মহারাজ বলিলেন, "হাঁ, অবশ্য আছে, কিন্তু বৎস জীবনের লঘু-করুণ শিক্ষাটা আগে সমাপ্ত করা চাই। তুমি ঝঞ্ঝাটের দুঃখে সংসারাশ্রমে বীতস্পৃহ হয়েছ, কিন্তু জান না, তোমার শিক্ষা-সাধনার জন্য

কত কর্ম্ম, কত জ্ঞান সেখানে সঞ্চিত আছে। মহৎ সাধন-ক্ষেত্র বলেই গার্হস্থ্যাশ্রমের অন্য নাম জ্যেষ্ঠাশ্রম!

মদন সবিনয়ে বলিল, "প্রকৃত গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন, খুব অল্প লোকের শক্তিতে সম্ভবে—বড় কষ্টসাধ্য ব্যাপার।"

মহারাজ বলিলেন, "কষ্টসাধ্য হ'তে পারে, কিন্তু অসাধ্য নয়। বাইরে আসক্ত, মুগ্ধ, ঘোর কর্ম্মী—অন্তরে অনাসক্ত, উদাসীন, নির্ব্বিকার! কর্ম্ম-সন্ন্যাস, জ্ঞান-সন্ন্যাস, এর সাধনা সকলের আগে চাই।"

মদন বলিল, "সে সংসারে থেকে ক'জন মানুষ পারে?"

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন, 'মানুষ' পদবাচ্য যে কয়জন সেই কয়জনই পারে। তুমি বালক চমকিত হোয়ো না, কিন্তু সন্ন্যাসী স্বার্থপর—আত্ম-চিন্তায় বিভোর! জগৎ-পিতার সুন্দর জগত সয়তানের কুৎসিত লীলা-নিকেতন ব'লে, তারা ঘৃণা ভরে দূরে চ'লে যায়। অবশ্য সেই 'যাওয়া' মিথ্যা হয় না, অসার্থক হয় না, তাদের অজ্ঞানের-মোহ চোখের ওপর যে দুর্ব্বলতার অন্ধকার ঘনিয়ে তোলে—যে অন্ধকারকে কাটিয়ে দেবার জন্য উগ্র অগ্নিজ্যোতিঃ সংস্পর্শের প্রয়োজন, কিন্তু তাদের দৃষ্টির অন্ধকার কাট্‌লে সকলের শেষে তারা দেখ্‌তে পায়—জগৎ, সয়তানের লীলা-নিকেতন নয়, সয়তান-স্রষ্টার কৌতুক-আনন্দের বিচিত্র সৌন্দর্য্যশালী বিহার-নিকেতন!"

মহারাজ থামিলেন। তাঁহার বাক্যমর্ম্মকে কি ভাবে গ্রহণ করিল বুঝা গেল না, সকলে নীরব রহিল।

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া মহারাজ পুনরায় বলিলেন, "কিন্তু সংসারীর

ধর্ম—ত্যাগে লাভ! সংসারীর কর্ম-সন্ন্যাস পরোপকার ব্রতে সার্থক, সংসারীর জ্ঞান-সন্ন্যাস বিশ্বহিতের আনন্দে পরিতৃপ্ত!"

নিরঞ্জনের চিত্তের কোন নিভৃত অংশস্থিত জমাট কঠিনতার বুকে হঠাৎ যেন প্রলয়ের তরঙ্গাঘাত বাজিল। চমকিয়া সে মহারাজের মুখপানে চাহিল, কি একটা ব্যাকুল প্রশ্ন তাহার বুকের মধ্যে ঠেলিয়া উঠিল, কিন্তু নিরঞ্জন কথা কহিতে পারিল না, শবের মত বিবর্ণ—ভাবহীন বদনে, নিষ্প্রভ-স্তিমিত নয়নে নির্ব্বাকভাবে সে শুধু চাহিয়া রহিল।

মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য আত্মোন্নতি-সাধন; বাহ্য-সন্ন্যাসেই যে সে সাধনা সিদ্ধি হবার একমাত্র উপায়, তার কোন মানে নাই। যদি সংসারে থেকে সে সাধনা সিদ্ধ হয় তবে সংসার ত্যাগের আড়ম্বর অনুষ্ঠানে কোন প্রয়োজন নাই। একটু থামিয়া, কি যেন ভাবিয়া লইয়া মহারাজ অপেক্ষাকৃত কোমল-কণ্ঠে বলিলেন, "বিসর্প, বিসূচিকা, বাতশ্লেষ্মা সবই ব্যাধি বটে, কিন্তু একজাতীয় ব্যাধি নয়, ও-সবের চিকিৎসা ব্যবস্থাও ভিন্ন বিধানানুসারে হওয়া কর্ত্তব্য। কিছু মনে ক'র না মদন, তোমার চিত্তভাবের গতি-প্রবণতা লক্ষ্য করে, আমি নিজের অভিজ্ঞতায় যতটুকু বুঝেছি, তাতে তোমায় এই পর্য্যন্ত পরামর্শ দিতে পারি যে সংসারই তোমার উপযুক্ত সাধন ক্ষেত্র। তোমার মধ্যে যে শক্তি বিদ্যমান আছে, সংসারের পথেই সে তোমাকে বাঞ্ছিত সফলতা দান করবে।"

নিরঞ্জন দুই হাতের মধ্যে নিজের উষ্ণ-তপ্ত বদন আচ্ছাদিত করিয়া নতশিরে বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, চারিদিকে যেন জটিল বিপ্লবের গোলমাল বাধিয়া গিয়াছে।

মহারাজের কথার উত্তরে দ্রাবিড় পণ্ডিতদ্বয়ের একজন বলিলেন, "তা ত বটেই, সংসারকে না জেনে, না চিনেই তাকে ফাঁকী দেবার জন্যে সন্ন্যাসী সাজা, নিতান্ত ভুল।"

দ্বিতীয় পণ্ডিত তাঁহার বাক্য সমর্থন করিয়া বলিলেন, "আর এটাও ঠিক যে, ভুক্ত-ভোগীর প্রতিজ্ঞা বরং টেকে, কিন্তু অভুক্তের সংযম একেবারেই অসম্ভব।

মদন ঈষৎ উত্তেজিতভাবে বলিল, "আমার পক্ষেও ওর ঠিক পাল্টা জবাব আছে পণ্ডিতজি। আমি বলছি, বরং অভুক্তের প্রতিজ্ঞা টেকে, কিন্তু ভুক্ত-ভোগীর টেকে না, কারণ তার পূর্ব্ব ভুক্ত-সংস্কার কার্য্যকালে—অর্থাৎ প্রলোভনের সম্মুখে, পরীক্ষাক্ষেত্রে তার সুপ্ত-প্রবৃত্তিকে আবার পূর্ব্ব অভ্যাসের মধ্যে সবেগে উদ্বোধিত করে তোলাই, জোরাল সম্ভবপর। এই ধরুন যে ব্যক্তি কখনও মদ খায় নি—"

পণ্ডিত বাধা দিয়া বলিলেন, "মদ্যের সম্বন্ধে একটা অদম্য কৌতূহল থাকা, তার পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ।"

বিরক্তভাবে মদন বলিল, "কৌতূহলমাত্রেই যে অদম্য তা কেমন করে বল্‌ব? তবে হাঁ, অনুভূতির উত্তেজনাকে প্রশ্রয় দেওয়া না-দেওয়া, সে ইচ্ছা-শক্তি সাপেক্ষ। আমি ইচ্ছা-শক্তির প্রাধান্য সকলের ওপর মানি, বিবেক-বিচার-প্রবুদ্ধ চিত্ত অজ্ঞাত কৌতূহলকে অবহেলায় জয় করিতে পারে, কিন্তু অভ্যস্ত সংস্কার—অর্থাৎ জানা শোনা ব্যাপার, এই মস্তিষ্কের প্রতি কোটরে কোটরে যার আস্বাদ-লালসা, পূর্ব্বানুভূতি ক্রমাগতই ঘুরে ঘুরে মূর্ত্তিমান হচ্ছে, সেটা আরো মারাত্মক নয় কি?"

পণ্ডিত বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "বিবেক-বিচার-প্রবুদ্ধ-চিত্ত কাকে বল! এই পুঁথিগত বিদ্যাড়ম্বরময়ী একজ্ঞারিতাকে?"

মদন ক্ষুব্ধভাবে বলিল, "বিবেক-বিচার-প্রবুদ্ধতা. কোন দ্বন্দ্ব সহযোগে উৎপন্ন হয়, জানেন কি? বিচারপূর্ব্বক বিষয় ভোগে!—নির্ব্বিচার উপভোগে নয়। যে তত্ত্ব জিজ্ঞাসু—যে প্রাণের আবেগে শিক্ষা-অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তি মহারাজের পায়ের তলার ঐ দূর্ব্বাটির মধ্য থেকেও তত্ত্বোপদেশ লাভ করতে পারে, মানেন কি?"

নিরঞ্জন করাচ্ছাদন খুলিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। সকল সংশয়ের দ্বন্দ্ব ছিঁড়িয়া, তাহার প্রাণে সহসা যেন আশ্বাসের অমর সান্ত্বনা আসিয়া পৌঁছিল! সে বিনাবাক্যে প্রস্থানোদ্যত হইল।

নিরঞ্জন লতামণ্ডপের বহির্ভাগে পদক্ষেপ করিয়াছে এমন সময় মহারাজ বলিলেন, "কোথা যাও নিরঞ্জন?" সহসা যেন তীব্র বিস্ময়াহত হইয়া, শঙ্কিত দৃষ্টিতে নিরঞ্জন ফিরিয়া দাঁড়াইল। ম্লানমুখে বলিল, "দেবদর্শনে মহারাজ।"

মহারাজ বলিলেন, "আমরাও যাব, চল।"

নিরুৎসাহ নিরঞ্জন ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "চলুন।" হায়রে পিছনের আহ্বান!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পরদিন নিরঞ্জন সুন্দর-মঠ হইতে গমনোদ্যোগ করিল, কিন্তু মহারাজ তাহাকে ছাড়িলেন না। অন্য সকলেও অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল, সে যখন দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছে তখন তাড়াতাড়ি চলিয়া যাওয়া কেন? নিরঞ্জন কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারিল না, অগত্যা থাকিয়া গেল।

কিন্তু কয়দিনের মধ্যেই সে স্পষ্ট বুঝিল থাকাটা ভাল হয় নাই; সকলের অজস্র যত্ন, আদর, আপ্যায়নের ভিড়ে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিবার যো' হইল, তাহার উপর চিত্তবিক্ষেপক উপদ্রবও যথেষ্ট ঘটিতে লাগিল। নির্ম্মল-মঠ নির্ম্মাতা নিরঞ্জন ভাস্কর আসিয়াছে শুনিয়া, সহরের অকর্ম্মা, সকর্ম্মা, বিস্তর কৌতূহলী ভদ্রলোক আলাপচারি করিবার জন্য তাহার নিশ্চিন্ত চিন্তার পথে অত্যন্ত উৎপাত জমাইয়া তুলিলেন।

শেষে অতিষ্ঠ নিরঞ্জন সকলের স্নেহবন্ধন কাটাইয়া, গোঁয়ারের মত যুক্তির জাল ছিঁড়িয়া কড়া-জেদের উপর, পলায়নের জন্য সঙ্কল্প স্থির করিল। এ অসহ্য কষ্টকর দুর্ভোগ!

কিন্তু এই অসহ্য দুর্ভোগের মাঝে তবু একটা স্নেহের নেশা তাহাকে অজ্ঞাতে প্রীতিমুগ্ধ করিয়া তুলিতেছিল—সে মদনানন্দ! প্রত্যহ বৈকালে মহারাজের সহিত নির্ম্মল-মঠে বেড়াইতে যাইবার সময় তাহার মন একটি উন্মুখ-আগ্রহে সচেতন হইয়া উঠিত। সারাদিনের নির্জ্জীব-যন্ত্রত্বের

যন্ত্রণা—সেই সময় যেন আরামের ভৃষ্ণায় প্রাণ পাইয়া বাঁচিয়া উঠিত। মদনকে দেখিলেই কেমন একটা গভীর স্নেহানন্দ তাহার মনকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিত। তর্ক, উপদেশ, শাস্ত্রালাপের মধ্যে, সে নির্ণিমেষ নয়নে নির্ব্বাকভাবে মদনের মুখপানে তাকাইয়া থাকিত। আহা, সংসার অনভিজ্ঞ তরুণ কচি প্রাণ! কি আগ্রহ, কত উৎসাহ, কত উদ্যম বুকে করিয়া সে সরল নির্ভীক হৃদয়ে মহৎ কর্ম্মের সন্ধানে যাত্রা করিয়াছে! কি নির্ম্মল উহার চিত্ত?

মদনের মুখপানে চাহিয়া তাহার স্নেহার্দ্র হৃদয় এক এক সময় অকারণ-উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া উঠিত, আহা, অবোধ শিশু! নিরঞ্জনের ইচ্ছা হইত দুই বাহু মেলিয়া সে মদনকে নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইয়া, গোপনে তাহাকে বলিয়া দেয়, সাবধান বন্ধু, দেখিও যেন হুঁচট খাইও না—সংসারের পথ বড় বন্ধুর!

নির্ম্মল-মঠে বাজে লোকের হট্টগোল নাই। উচ্চশ্রেণীর সাধু, সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারীগণ সেখানে থাকিতেন, বাকী অতিথি অভ্যাগতগণ নির্ম্মল-মঠে বেড়াইতে গিয়া, সন্ধ্যারতি দেখিয়া, সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিত। মহারাজ সমস্তদিন পূজা, অর্চ্চনা, আহুত, অনাহুত, অর্থী, প্রত্যর্থী, কত লোকের সহিত আলাপ আলোচনা ও বৈষয়িক কার্য্য ব্যবস্থা সম্পাদনের জন্ম ব্যস্ত থাকিতেন—বৈকালে তাঁহার অবসর। কাজেই সারাদিন নিরঞ্জন এদিক ওদিক ঘুরিয়া, সমাগত ভদ্রলোকগণের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া এবং নিজের পুঁথি পত্র ঘাঁটিয়া, নিরুৎসাহে অস্বস্তিতে সময় কাটাইতে বাধ্য হইত। কিন্তু এরূপে অলস-শ্রান্তিতে দিন যাপন, আর তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

নিরঞ্জনের নীরব স্নেহ আকর্ষণেই হউক, অথবা স্বাভাবিক কৌতূহল-প্রবণতা মাহাত্ম্যেই হউক, মদন ধীরে ধীরে নিরঞ্জনের প্রতি আকৃষ্ট মুগ্ধ হইতে লাগিল। নিরঞ্জনকে তর্কে ভিড়ান যায় না, আলাপে জমান যায় না—সে কোন বিষয়েই বেশী কথাবার্ত্তা কহে না, অথচ কোন কিছু ব্যাপারে তাহার অসন্তোষ অপ্রসন্নতা তেমন দেখা যায় না। সর্ব্বদাই সে নিস্তব্ধ, সকল সময়েই তাহার অধরে স্নিগ্ধ লাবণ্য প্রলেপের মত—বেদনা-নম্র ক্ষীণ হাস্য বিদ্যমান। মদন যতই তাহাকে দেখিত ততই তাহার ঔৎসুক্য বাড়িত। নিরঞ্জন এ কি অদ্ভুত মানুষ?

সেদিন শুক্লা দ্বাদশীর সন্ধ্যা; নিরঞ্জন, মদন ও নির্ম্মল-মঠের প্রধান পণ্ডিত বৃদ্ধ শঙ্করদেব, নির্ম্মল-মঠের অট্টালিকা সম্মুখস্থ প্রশস্ত মর্ম্মর চত্বরে বসিয়া নানা কথা কহিতেছিলেন। মহারাজ দ্বিতলে অন্য করজন পণ্ডিতের কাছে বসিয়া, নির্ম্মল-মঠে একটি ছাত্রাবাস খুলিবার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পরামর্শে ব্যাপৃত ছিলেন। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে মন্দিরে আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে।

নির্ম্মল-হীরকখণ্ডের স্বচ্ছোজ্জ্বল দীপ্তির মত জ্যোৎস্না ঠিকরাইয়া আসিয়া মাটীর বুকে পড়িয়া শান্তহাসি হাসিতেছিল। মঠের চতুর্দ্দিক সুদূরব্যাপী উদ্যান-বাটিকার শান্ত-নিস্তব্ধতা বড় মনোরম—বড় মধুর বোধ হইতেছিল। চাতালের একপাশে নিরঞ্জন পা ঝুলাইয়া, শ্লথবিন্যস্ত হস্তদ্বয় জানুর উপর রাখিয়াসম্মুখদিকে চাহিয়া নির্ব্বাকভাবে বসিয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় মদনকে বুঝাইতেছিলেন—যতিরাজ রামানুজাচার্য্য প্রণীত 'বেদান্ত-দীপিকার' সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও গূঢ়তম অর্থ।

কথায় কথায় পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "নীলাচলে শ্যামানন্দ আচার্য্য মহাশয় বেদান্তদীপিকার অদ্বিতীয় মর্ম্মার্থবিদ্। তাঁহার নিকট বেদান্ত-দীপিকা ও ঈশাবাস্যোপনিষদ্‌ভাষ্য আমি কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাঁহার পাণ্ডিত্য অতি চমৎকার, তিনি এখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন, বিদেশে গমনাগমন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু নির্ম্মল-মঠে তাঁহার মত ব্যক্তির অধিষ্ঠান একান্ত প্রার্থনীয়।"

মদন বলিল, "মহারাজ কি তাঁর কাছে পাঠাবার জন্যই উপযুক্ত ছাত্র খুঁজ্‌ছেন?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "খুঁজছেন বটে, কিন্তু সে রকম ছাত্র মেলা দুর্ঘট। সে সব কাজের উপযুক্ত, 'লাখে-এক' মানুষ, খুঁজলেই পাওয়া যায় না।"

অন্যমনস্ক নিরঞ্জন চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কি খুঁজলেই পাওয়া যায় না?"

পণ্ডিত বলিলেন, "সাধনার উপযুক্ত সাধক! যার শক্তি আছে, সে সাধনায় অনিচ্ছুক, যার সাধন-স্পৃহা আছে, সে শক্তিতে অক্ষম, এ রকম লোক যথেষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু যে দুকূল বজায় রেখে কাজ হাশিল করে, এমন শক্তিমান, একনিষ্ঠ, আত্ম-প্রত্যয়শীল সাধক কোথায় পাব।"

মদন সাগ্রহে বলিল, "গড়ে নিতে কি পারা যায় না?"

পণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, "যিনি ভাঙ্গাগড়ার কর্ত্তা তিনিই এর জবাব দিতে পারেন, আমি কি বল্‌ব বাবা?"

নিরঞ্জনের নয়নে একটা আশান্বিত উৎসাহের জ্যোতিঃ ফুটিয়া

উঠিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল, মদনের সেদিনকার সেই কথা, যে যথার্থ তত্ত্ব জিজ্ঞাসু সে তৃণের নিকটও উপদেশ লাভ করিতে পারে।

হঠাৎ নিরঞ্জন উঠিয়া চাতাল হইতে নামিয়া পড়িল। মঠের তোরণ দ্বারের নিকট গিয়া, চন্দ্রালোক উদ্ভাসিত ভিত্তিগাত্রে—উৎকীর্ণ শিল্প চিত্রগুলা, সংশয়-উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে মনে মনে কি যেন একটা কঠোর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিতে লাগিল।

মদন নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া আশ্চর্য্যভাবে বলিল, "ঐ একটি অদ্ভুত মানুষ দেখুন, কথাবার্ত্তা আলাপ আলোচনার মাঝখান থেকে হঠাৎ উনি অমনি করে উঠে চলে যান। আর একটা বিশেষত্ব লক্ষ্য করুন, কি আশ্চর্য্য ওঁর মুখের ভাব! নিঃশব্দে চলন্ত ছায়ার মত কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেখুন।"

পণ্ডিত মহাশয় নিরঞ্জনের দিকে চাহিলেন। ক্ষণেক কি ভাবিলেন, তারপর বিস্মৃতি-স্মরণে কৃতকার্য্যতার সাফল্যে, সহসা বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ নিরঞ্জন ভাস্কর ত? বটে, আজ মনে পড়েছে, মাসকতক আগে একজন প্রবীণ ভাস্কর নিশ্মল-মঠের গঠন-পারিপাট্য দেখবার জন্যে এসেছিল। লোকটা বিদ্বান এমন কিছু নয়, তবে রসজ্ঞ বটে, সে অনেক দেশ দেশান্তর ঘুরে অনেক দেখেছে শুনেছে, এখনও চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে দুটি শিষ্য ছিল, সব দেখে শুনে এসে শিষ্য দুটিকে তিনি অনেক কথা বুঝিয়ে দিলেন—তার মধ্যে একটি কথা আমার মনে আছে। আজ নিরঞ্জনের পানে চেয়ে সেই কথা হঠাৎ মনে পড়্‌ল।"

পণ্ডিতের মুখে নিজের নাম শুনিয়া, নিরঞ্জন ফিরিয়া চাহিল।

তিনি মদনের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন দেখিয়া নীরবে অগ্রসর হইয়া আসিল। পণ্ডিতের কথার উত্তরে মদন সাগ্রহে বলিল, "কি কথা ?"

পণ্ডিত মহাশয় নিজের সুপক্ক মস্তকের তুষার-শুভ্র কেশরাশির উপর হাত বুলাইয়া, ঈষৎ হাস্যের সহিত অন্য মনে উত্তর দিলেন, "তিনি এখানকার সবচেয়ে ভাল নক্সাগুলির উল্লেখ করে তাদের সূক্ষ্ম মর্ম্ম ব্যাখ্যার সময় বল্লেন, 'মানবীয় হৃদয় মনের আশা আকাঙ্ক্ষার সুর যেন এগুলিকে স্পর্শ করে নি, এদের কাছ থেকে সবাই যেন সসঙ্কোচে পিছু হেঁটে তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিতান্ত প্রয়োজনে যেখানেই সে রসের অবতারণা আবশ্যক হয়েছে, সেইখানেই শিল্পীর অকৃতকার্য্যতা ধরা পড়ে—বেশ বোঝা যায় রসভাব স্ফুটনোন্মুখ হয়ে—অকস্মাৎ ইঙ্গিতের অন্তরালে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। এর মধ্যে চমৎকার ভাবে ফুটেছে শুধু একটি ভাবের মহিমা।"

পণ্ডিত মহাশয় থামিলেন ! ধাড় ফিরাইয়া, উৎসুক অথচ সকরুণ নয়নে নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিয়া, সাগ্রহে কি যেন অন্বেষণ করিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনিতে শুনিতে নিরঞ্জন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, প্রবীন ভাস্করের মতামত তাহার অধরে—নির্দ্বন্দ্ব কৌতুকের স্মিতহাস্যরেখা অজ্ঞাতে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। তীক্ষ্ণদর্শী ভাস্করের দৃষ্টি শক্তিকে মনে মনে ধন্যবাদ দিয়া, সে নিজের স্পষ্ট প্রকাশিত, গোপন-মূঢ়তার কথাই ভাবিতেছিল।

পণ্ডিতমহাশয় তাহার মুখভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কি বুঝিলেন, জানি না—ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "তিনি বল্লেন, এই ওস্তাদ শিল্পী, ভাবুকের অগ্রগণ্য। বেশ বোঝা যায়, ইনি—তীব্র

নিষ্পীড়ণে উদ্দাম বাসনার রক্ত শোষণ করে, ভাবের তুলি রাঙিয়ে, পাথরের বুকে—প্রাণের স্পষ্ট বেদনাকে, জীবন্ত মূর্ত্তিতে এঁকেছেন। এ শিল্প, শুধু বিশ্বের রসগ্রাহী ভাবুকের বন্দ্যনীয়, তোমাদের মত ভোগাসক্ত জীবের চিত্ত বোধ হয় এর শিল্পে মুগ্ধ হবে না!"

নিঃশব্দে নিরঞ্জনের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল সে ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া গেল। অদ্ভুত, আশ্চর্য্য! পরিচিতের দল, তাহার কৃশ, ক্ষীণ বাহ্য আকৃতি ও খিন্ন ম্লান বাহ্য প্রকৃতিকে, কৃপাশ্রিত করুণার দৃষ্টিতে দেখে, তাহাকে নির্ব্বোধ প্রকৃতির শান্ত-নিরীহ ব্যক্তি বলিয়া জানে। কিন্তু ঐ একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি, তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহার হৃদয়ের গতি অনুসরণ করিয়া, স্বচ্ছন্দে তাহার অন্তঃ প্রকৃতির আকৃতিটা বুঝিয়া লইয়াছেন! বড় আশ্চর্য্য—বড় অদ্ভুত ব্যাপার!

কিন্তু হাঁ, অস্বীকার করিবার শক্তি নাই! তাহার বাহ্য-আকৃতির শক্তি-চাঞ্চল্য হরণ করিয়া তাহার বাহ্য প্রকৃতির স্ফূর্ত্তি-সজীবতা শোষণ করিয়া, সত্যই তাহার অভ্যন্তরে—তাহার অন্তঃ প্রকৃতির বুকের উপর জ্বালাময়ী প্রচণ্ডতা খরস্রোতে অবিশ্রাম বহিয়া যাইতেছে। সে যে কি ভয়ঙ্কর, কত নিদারুণ, তাহা জানেন শুধু অন্তর্য্যামী! হতভাগ্য নির্ব্বোধ, দুর্ব্বল সে—সেও তাহার সঠিক সংবাদ রাখিতে অসমর্থ, সত্য বলিতে সে ত নিশ্চয় কিছু জানে না!

জগৎ তাহাকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখে, কোন্ বুদ্ধিতে বিচার করিতে চায়, তাহা সে জানে না—জানিতে চাহেও না। কিন্তু আজ অযাচিত আহ্বানে, একজনের কণ্ঠস্বর তাহার কানে আসিয়া পৌছিয়াছে, অদ্ভুত হৃদয়বান্ সে ব্যক্তি!

নিরঞ্জন চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখিয়া মদন বলিল, "সকল রস আস্বাদনের শক্তি সকলের অনুভূতিতে নাই পণ্ডিত মহাশয়। এই চন্দ্রালোক, এ ত' যোগী ভোগী সকলের পক্ষেই স্নিগ্ধ আনন্দময়, কিন্তু এর দ্বারা যোগীর মনে যে রস, যে ভাবের সঞ্চার হয়, ভোগীর মনে ঠিক্ তার বিপরীত ভাব, রসের উদয় হয়। ধরুন এই গোপী ভাবে প্রেম সাধনা! এ সাধনা কারো চক্ষে স্বর্গ—কারো চক্ষে নরক!"

এ সকল তর্ক শুনিতে নিরঞ্জনের ভাল লাগিল না। এ সকল আলোচনা অন্যের কাছে যতই আবশ্যকীয় হউক, কিন্তু তাহার ক্লান্তি-পীড়িত হৃদয়ের কাছে আজ—এখন এ-সকল যে নিতান্তই অনাবশ্যক কোলাহল।

নিরঞ্জন ধীরে ধীরে সেখান হইতে ফিরিয়া চলিল। জ্যোৎস্নালোকে সুদূর-বিস্তৃত উদ্যানের শান্ত নির্জ্জনতা বড় তৃপ্তিময় বোধ হইল, লক্ষ্যহীন ভাবে চলিতে চলিতে নিরঞ্জন উদ্যান-প্রান্তে পুষ্করিণীর নিকট আসিয়া পড়িল।

পুষ্করিণীর পাড়ে উদ্যানের মালীর মৃৎকুটীর। কুটীরের দ্বার রুদ্ধ ছিল, দ্বারের ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে ক্ষীণ আলোকরশ্মি নির্গত হইতেছিল, বোধ হয় ভিতরে মানুষ আছে। কাছাকাছি হইয়া নিরঞ্জনের বোধ হইল যেন, কুটীরের ভিতর হইতে একটা অস্পষ্ট করুণ কাতরোক্তি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে!

বিস্ময় চকিত নিরঞ্জন দাওয়ার সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল। ভাল করিয়া কান পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু শব্দ বড় ক্ষীণ—বড় ক্লান্ত অস্পষ্ট বোধ হইল। নিরঞ্জন অনুসন্ধিৎসু নয়নে চারিদিক চাহিল,

কি কোথাও ত একটি প্রাণী নাই! অলক্ষিতে তাহার অধর প্রান্তে আপনা হইতে বিষাদের ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। হায়! এমন সুন্দর শান্ত নির্জ্জনতার বুকে এমন মনোরম জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্য প্রবাহের হৃদয় ভেদ করিয়া—একি ক্লিষ্ট কাতরতাময়ী বেদনা ধ্বনি! অথচ ইহা শুনিবার জন্য কেহ কোথাও নাই।

বিমূঢ়ের মত নিরঞ্জন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কুটীরে কে আছে কিছুই জানে না—কাহাকে ডাকিয়া কিছু সুধাইতে তাহার সাহস হইল না। অজ্ঞাতে দীর্ঘশ্বাস পড়িল! ওগো, একদিন সে দিন ছিল, যে দিন অমর নির্ভীকতা তাহার তরুণ বক্ষঃ অক্ষয় কবচে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। সেদিন তাহার হৃদয়ের মধ্যে চেতন স্পন্দন সজীব ছিল, জগতের প্রত্যেক সাড়া প্রত্যেক শব্দকে সেদিন সে স্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিত। সকল অভাব, সকল আহ্বানের উত্তরে, তাহার সুস্থ সচেতন অনুভূতি সাগ্রহে সাড়া দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিত; ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রয়োজনের মধ্যে আপনাকে সঁপিয়া দিয়া, সে আত্ম-সার্থকতার তৃপ্তিলাভে ধন্য হইত—কিন্তু আজ? আজ তাহার সেদিন গিয়াছে, আজ তাহার হৃদয় রিক্ত নিঃস্ব! আজ অভাব সম্মুখে আসিয়া হাত পাতিলে, সে ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। হৃদয়ের সুপ্তোত্থিত আগ্রহ, সে ক্ষিপ্র ব্যাকুলতার অলস ঔদাস্যের অন্তরালে ঠেলিয়া দিয়া নির্জ্জীবের মত চক্ষু ঢাকা দিয়া অন্ধকারে লুকাইয়া হাঁপ ছাড়িতে পারিলে স্বস্তি পায়! আজ সে এত দীন এত হীন হইয়াছে। সে আজ অযোগ্য! অযোগ্য! অযোগ্য! তাহার চতুর্দ্দিকে অযোগ্যতার অবসাদ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে কোন্ লজ্জায় মুখ তুলিয়া

চাহিবে! কোন্ উন্নত গৌরবের চরণে আত্মনির্ভর স্থাপন করিয়া সে অকপট সাহসে পৃথিবীকে ডাকিয়া বলিবে, "ওগো আমি তোমার কাজের যোগ্য!" না না, সে সব পারিবে, ওটুকু পারিবে না। সে আপনার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়া মনস্তাপে জর্জ্জরিত হইয়াছে, আর পৃথিবীর সহিত প্রবঞ্চনা করিতে পারিবে না।

সহসা কুটীরের দ্বার ঈষদুন্মুক্ত হইল। একজন অতি শীর্ণকায় বৃদ্ধ একটা ঘটি হাতে করিয়া হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে দেখিতে পাওয়া গেল। সে অত্যন্ত ক্লান্তভাবে ঘন ঘন হাঁপাইতেছে তাহার দৃষ্টি অস্বাভাবিক বিকলতাপূর্ণ! তাহার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, শ্লথ কম্পিত হস্তে দুয়ারটা টানিতেছে, কিন্তু সেটাকে খুলিতে পারিতেছে না। নিরঞ্জনকে দেখিয়া স্তিমিত ক্ষীণ দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া বৃদ্ধ ব্যাকুলভাবে বলিল, "কে, কেগো ওখানে, মহাবীর, বাপ্ আমার?"

নিরঞ্জন যেন আঘাতের মাঝে আনন্দ পাইল, আশ্বাস পাইল; তাড়াতাড়ি দাওয়ায় উঠিয়া বলিল, "না বাবা, আমি অন্য ব্যক্তি, তোমার—তোমার কোন সাহায্য, কিছু সাহায্য কর্‌তে পারি কি?"

কি বিনয়-নম্র অনুমতি প্রার্থনা! বৃদ্ধ বিহ্বল-নয়নে চাহিয়া বলিল, "তুমি, তুমি—কেগো?"

কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া নিরঞ্জন বলিল, "আমি বিদেশী অতিথি, সুন্দর-মঠের অতিথি—তুমি পীড়িত বোধ হয়, তোমার কি দরকার আছে, আমায় বল্‌বে?"

কি সকরুণ অনুনয়! কৃতজ্ঞ বিস্ময়ে বিচলিত বৃদ্ধ তাহাকে ভাল

করিয়া দেখিবার জন্য, সজোরে দুয়ারটা টানিয়া খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রুগ্ন দেহ সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না, বৃদ্ধ টলিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। নিরঞ্জন কুণ্ঠা দ্বিধা ভুলিল, তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া ক্ষিপ্র সতর্কতায় পতনোন্মুখ বৃদ্ধাকে জড়াইয়া ধরিয়া, ব্যগ্র সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "স্থির হও, স্থির হও—ব্যস্ত হ'য়ো না, কি চাই বল আমি দিচ্ছি।"

অর্দ্ধ সংজ্ঞাহীন বৃদ্ধ কথা কহিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছিল, জিহ্বা ভিতরে টানিতেছিল, অসাড় হাত দুইটা যথাসম্ভব ব্যগ্রতার সহিত সঞ্চালন করিয়া, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সে জলের ঘটিটা খুঁজিতে লাগিল। নিরঞ্জন প্রথমটা তাহার মনোভাব বুঝিতে পারে নাই, পরে ঘটির দিকে দৃষ্টি পড়াতে—ত্রস্তে সেটা তুলিয়া বৃদ্ধের মুখে জল দিতে গেল, কিন্তু হায় জল যে তাহাতে কিছুমাত্রও নাই! ব্যাকুল হইয়া নিরঞ্জন ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু দুর্ভাগ্য, কোথায় জল? তৈজসপত্র বিছানা মাদুর কাঠ-কুটরা, ভাঙ্গা বাক্স ইত্যাদি দীন গৃহস্থের সামান্য জীবনযাত্রার আয়োজন উপকরণে সমস্ত ঘর ঠাসা রহিয়াছে। সেখানে বোধ হয় সংসারের সকল আসবাবই সাজান আছে, নাই শুধু—একটু জল! আর একটা শূন্য জলপাত্র এক কোণে উপুড় করা রহিয়াছে—নিরঞ্জন প্রমাদ গণিল!

আর এক মুহূর্ত্তের বিলম্বে হয় ত বৃদ্ধ প্রাণ হারাইবে। দ্বিধাহীন হইয়া নিরঞ্জন চৌকাঠের কাছে মাটীর উপর বৃদ্ধের দেহ শোয়াইয়া দিয়া, জলের ঘটি লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পুষ্করিণীর দিকে ছুটিল। অবিলম্বে জল লইয়া ফিরিল, বৃদ্ধের মুখে চোখে জল সিঞ্চন করিতে করিতে, তাহার

আড়ষ্ট জিহ্বার জড়তা ঘুচিল। শ্রান্ত বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "ভাগ্যে তুমি এসেছিলে বাবা, ভাগ্যে দয়া করে এসেছিলে—আজ জলের জন্যে আর একটু হ'লে প্রাণ হারাতুম, তুমি আজ আমায় বাঁচালে।"

কৃতজ্ঞ সন্তোষে নিরঞ্জনের বুক ভরিয়া গেল। সে বৃদ্ধকে বাঁচাইয়াছে, না বৃদ্ধ তাহাকে বাঁচাইল!

সযত্নে বৃদ্ধকে তুলিয়া ছিন্ন মলিন কন্থারচিত শয্যার উপর শোয়াইয়া দিয়া নিরঞ্জন তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বাতাস করিতে লাগিল। কোন কথা বলিতে পারিল না, তাহার মনে পড়িতেছিল আর একটা রজনীর এমনই একটা ঘটনার কথা! সে ঘটনা এই সুন্দর-মঠে ঘটিয়াছিল! যন্ত্রণা-কাতর চিত্তরঞ্জনের পীড়িত কণ্ঠস্বর, প্রয়োজনের ব্যগ্র আহ্বান সে দিন দৈব-দুর্বিপাকে হতভাগ্য নিরঞ্জনের বধির কর্ণে স্থান পায় নাই, সেই ক্ষোভে তাহার সমস্ত প্রাণ উন্মাদ, অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। আজ এতদিনের পর সেই গ্লানি বিক্ষোভ মোচন করিবার জন্য করুণাময় কি সদয় হইয়া এই সান্ত্বনাটুকু লাভ করিবার সুযোগ দিলেন!

লোকহিত! লোকহিত! ওরে কোন মূর্খ জগতের উপকারের জন্য, নিঃস্বার্থ নিষ্কাম সাজিয়া লোকহিতব্রত পালনের আইন কানুন গড়িয়া—লক্ষ কথার আড়ম্বরে জাঁকাইয়া বিধিব্যবস্থার উপদেশ দেয়? মূর্খ নিরঞ্জন মিথ্যাই এত দিন নিজের অযোগ্যতাকে অভিশাপ দিয়া জগতের কাজ হইতে আপনাকে সুদূরে স্বতন্ত্র রাখিয়া সভয়ে সতর্ক হইয়া চলিয়াছে! ওরে মূর্খ দাম্ভিক, জগতের উপকার তুমি কর আর নাই কর, জগতের তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তুমি শুধু নিজের

দুর্ব্বুদ্ধিদোষে নিজের উপকারের শক্তি হারাইয়াছ, নিজের উন্নতি সাধনের পথে জড় নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছ। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ, কাহারও তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই! লোকহিত? ওরে নির্ব্বোধ, তাহার প্রকৃত অর্থ যে আত্মহিত—শুধু আত্মহিত! জড় দৃষ্টি লইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছ, ভিতরের সূক্ষ্ম অনুভব চেতনা, তাই জড়তায় স্তম্ভিত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে। যে ফুল একদিন বৃক্ষের শাখাগ্রে ফুটিয়া উঠে, শুধু তাহার দিকে চাহিয়া সেইদিনই তোমরা বিস্ময় আনন্দে 'বাহবা' দাও—কিন্তু মনে রাখিতে ভুলিয়া যাও—কোন গোপন অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া মাটির ভিতর হইতে রস শুষিয়া কে তাহার প্রাণশক্তি সংগ্রহ করিতেছে। যে সাফল্য একদিন পূর্ণ সৌন্দর্য্যে প্রকটিত হইয়াছে, কত দিনের কত যত্ন, কত চেষ্টা, কত আয়োজন—অবিশ্রাম তাহার পশ্চাতে খাটিয়াছে! জগতের উপকার? হায় ভ্রান্তি! জগত কি কাহারও উপকারের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া আছে, জগদীশ্বর তত নির্ব্বোধ নহেন, তিনি তোমার সাহায্য প্রত্যাশায় তাঁহার সৃষ্টি নির্ম্মাণ করেন নাই—তিনি দয়া করিয়া তাঁহার জগৎ তোমার সম্মুখে বিকশিত করিয়াছেন, তোমারই উপকারের জন্য, তোমারই সাহায্যের জন্য! তোমার আত্মোন্নতি সাধনার জন্য তিনি এখানে সহস্র, লক্ষ, কোটী উপকরণ সাজাইয়া রাখিয়াছেন। হৃদয়কে জাগ্রত করিতে চাও, প্রাণকে বলিষ্ঠ করিতে চাও, আত্মাকে আত্ম-মহিমা উপলব্ধি করাইতে চাও—নিজের রুগ্ন অবসাদ ঝাড়িয়া স্বাস্থ্যের জন্য, শক্তির জন্য—একাগ্র চেষ্টায় ব্যায়াম কর, তৃণের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান খুঁজিয়া

পাইবে। কিন্তু শুধু অলস ঔদাস্যের আশ্রয়ে নির্জ্জীবের মত যদি থাক, স্বয়ং ব্রহ্মা আসিলেও তোমার ব্রহ্মজ্ঞান দান করিতে সমর্থ হইবেন না।

ক্লান্ত বৃদ্ধ চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। নিরঞ্জন নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিল। ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে একটি মাত্র ক্ষুদ্রতম বাতায়ন, তাহাও রুদ্ধ: সমস্ত গৃহ বিবিধ উপকরণে আবর্জ্জনাপূর্ণ, তাহাতে আলোকের তাপ, রোগীর নিশ্বাস, গৃহ মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যের হাওয়া যেন এতটুকুও ছিল না, কিন্তু নিরঞ্জনের তাহাতে ভ্রুক্ষেপ নাই! এতক্ষণ সে বাহিরের মুক্ত চন্দ্রালোকে শান্তি স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে বৃথাই ঘুরিতেছিল। কোথাও বাঞ্ছিত তৃপ্তি খুঁজিয়া পায় নাই, এতক্ষণে এইখানে আসিয়া এই অসহায় অসুস্থের সেবায় আপনাকে অকপট আগ্রহে নিবেদন করিয়া দিয়া, এইবার সে স্বস্তি পাইল। এই ক্ষুদ্র আনন্দ স্পর্শের মাঝে সে যেন জড়তা হইতে মুক্তিলাভ করিল তাহার সমস্ত হৃদয় মন ছাপাইয়া চঞ্চল উদ্যম স্রোত জাগিয়া উঠিল। মুগ্ধ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া নিরঞ্জন ভাবিতে লাগিল, এক মুহূর্ত্তের আশীর্ব্বাদে, অভিশাপে, যে জীবন মৃত্যু আবির্ভূত হয়, ইহা কি আজ নাস্তিকের মত অস্বীকার করিবে? যে রূপকে আজ অন্তরে প্রত্যক্ষ চেতনায় উপলব্ধি করিতেছে, ইহা কি আজ রূপক কল্পনা বলিয়া অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিবে? ইহা কি সত্যই শুধু অলীক ভাবাতিশয্য মাত্র?

হউক—পৃথিবীতে যাহা কিছু ভাল ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহা ত ভাবাতিশয্যেরই ফলে! অভাবের অত্যাচারে যাহা ঘটিয়াছে তাহা জড়ত্ব, মূঢ়ত্ব, পঙ্গুত্ব মাত্র! এ ভাবোন্মাদনা যতই অসার হউক, কিন্তু

সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে, ইহার মধ্যে কিছুও সারকে খুঁজিয়া পায় কি না!

যাক্, মানুষের রসনা-সৃষ্ট সমস্ত তর্ক দ্বন্দ্বের কোলাহল, স্থূলত্বের বিচার বিশ্লেষণের পশ্চাতে একান্তভাবে পরিসমাপ্ত হউক। নিরঞ্জন এবার তাহার গণ্ডি কাটিয়া আপনাকে বাহির করিয়া লইবে। প্রকৃতিকে আপনার পথে স্বচ্ছন্দ স্রোতে মুক্ত হইয়া ছুটিতে দিবে।

জড়ভোগের বিরুদ্ধে তাহার হৃদয় মন চিরদিন বিদ্রোহী হইয়া আছে—তাই ত পার্থিব বাসনা যখনই তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিতে আসে, তখনই তাহার অন্তরাত্মা জলাতঙ্ক রোগীর মত আতঙ্কে উন্মাদ হইয়া উঠে। পৃথিবীর ভোগাসক্ত মানব প্রকৃতির সহিত তাহার প্রকৃতির যোগ নাই—মিথ্যাই জবরদস্তি করিয়া মাথা ঠুকিয়া মরিতেছে! পৃথিবী বিপুল আয়োজন সাজাইয়া তাহার ক্ষুধিত প্রকৃতিকে স্নেহ-কোমল আহ্বানে বারে বারে ডাকিতেছে, কিন্তু সে মূঢ় অভিমানে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া নিজের তৃষ্ণা পীড়িত হৃদয়কে কেবলই নির্দ্দয় শাস্তি দিতেছে। তাহার ক্ষুধার যোগ্য খাদ্য যথেষ্ট আছে, কিন্তু হতভাগ্য সে শুধু গ্রহণের যোগ্যতা হারাইয়াছে।

মুক্ত দ্বার পথে দুই ব্যক্তি কক্ষে ঢুকিল। নিরঞ্জন চাহিয়া দেখিল, উদ্যানের মালী ও স্থানীয় চিকিৎসক। অনুমানে বুঝিল মালী চিকিৎসককে ডাকিতে গিয়াছিল এবং ইহাও আপন মনে সিদ্ধান্ত করিয়া লইল যে, পীড়িত ব্যক্তি মালীর আত্মীয়, সম্ভবতঃ পিতা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সে কোন প্রশ্ন কাহাকেও সুধাইল না, নির্ব্বাক্

ঔদাস্যে একবার শুধু আগন্তুকদ্বয়ের দিকে চাহিয়া, ঠিক পূর্ব্বের মতই অচঞ্চলভাবে নিজের কাজে নিযুক্ত রহিল।

মালী নিরঞ্জনকে মহারাজের সহিত যাওয়া আসা করিতে অনেকবার দেখিয়াছে, সুতরাং চিনিতে পারিল। কুণ্ঠিত বিস্ময়ের সহিত নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনি এখানে এ কি কষ্ট করছেন মহাশয়, কতক্ষণ এসেছেন?"

নিরঞ্জন কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। বৃদ্ধ চক্ষুরুন্মিলন করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "মহাবীর এসেছে? আজ বড় কষ্ট পেয়েছি বাপ, ঘটিতে জল ছিল না, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে নিজেই পুকুরে যাব বলে উঠেছিলাম, কিন্তু দুয়ার পর্য্যন্ত গিয়ে, আর পারি নি। ভাগ্যে এই ভদ্রলোক এসে পড়েছিলেন—এঁর কৃপাতেই আজ প্রাণ পেয়েছি বাপ্।"

মালী অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "বাবা, ইনি যে মোহন্ত মহারাজের পার্শ্বচর।"

ব্যাকুল বিনয়ে বৃদ্ধ সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "আপনি মহারাজের পার্শ্বচর, আমি ত জানি না, না জেনে আপনাকে কত কষ্ট দিয়েছি, কত অপরাধ করেছি—আমায় ক্ষমা করুন।"

এই কৃতজ্ঞতার অভিবাদন নিরঞ্জনের কাছে কর্কশ অত্যাচারের মত বোধ হইল; অসহ্য বাড়াবাড়ি মনে হইল! কিন্তু ইহাকে খর্ব্ব করিবার উপায়ও সে খুঁজিয়া পাইল না, তাহার বাক্‌শক্তি যেন রোধ হইয়াছিল। অসহিষ্ণুভাবে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার ইচ্ছা হইল, রোগীর সেবা শুশ্রূষা ফেলিয়া নির্দ্দয়ের মত পলাইয়া গিয়া কৃতজ্ঞতার উৎপীড়ন

হইতে আত্মরক্ষা করে, কিন্তু তাহাও পারিল না, নিশ্চলভাবে রোগীর শিয়রে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৈদ্য রোগীকে পরীক্ষা করিয়া প্রসন্নমুখে বলিলেন, "কোন আশঙ্কা নেই, ব্যাধির এ প্রকোপ বৃদ্ধি আরোগ্যলাভের পূর্ব্ব লক্ষণ—আজ এখনই জ্বর ত্যাগ হবে, রাত্রে সুনিদ্রায় ইনি সুস্থ হবেন। তুমি ঔষধ খাওয়াও, আমি মহারাজকে সংবাদ দিয়ে যাচ্ছি।"

বৈদ্য বিদায় লইলেন। পুত্র পিতার শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হইল, নিরঞ্জন দেখিল—সেখানে তাহার কাজ আর নাই। সেও নিঃশব্দে বৈদ্যের পশ্চাতে প্রস্থান করিল। গমনের সময় একটা মৌখিক বিদায় সম্ভাষণও জ্ঞাপন করিল না, পাছে কৃতজ্ঞ পিতা পুত্রের নিকট হইতে আবার দুই কথা শুনিতে হয়।

বৈদ্য মোহন্ত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য নির্ম্মল-মঠে গেলেন। প্রত্যেক অধীনস্থ ব্যক্তির পীড়ার সংবাদ প্রত্যহ যথাযথ বিবরণসহ মহারাজকে জানাইতে হইত, বৈদ্য মহারাজের বেতনভোগী।

বাহিরের মুক্ত জ্যোৎস্নালোক আসিয়া, নিরঞ্জন দেহ মনের উপর এবং অপূর্ব্ব স্বাচ্ছন্দ্যের হিল্লোল স্পর্শ অনুভব করিল, কিন্তু তাহার ক্ষুণ্ণ হৃদয় তবুও ঐ বদ্ধ গৃহের রুদ্ধ বাতাসের জন্য বেদনার নিশ্বাস ফেলিল। কিন্তু থাক্, শুধু আয়োজনের দিকে তাকাইয়া প্রহর গণিয়া লাভ কি? তাহার প্রয়োজন কোথায় এবং তাহার পরিমাণ কতটুকু তাহাই এখন দ্রষ্টব্য।

নিরঞ্জনের চরণগতি অজ্ঞাতে মৃদুতর হইয়া আসিল। কার্য্যব্যস্ত বৈদ্য স্বাভাবিক দ্রুতগমনে চলিয়াছিলেন সুতরাং শীঘ্রই তিনি দূরে অগ্রসর

হইয়া পড়িলেন। নিরঞ্জন একটা শাখাবহুল বটগাছের তলায় অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া পড়িল, ঊর্দ্ধে জ্যোৎস্নাহসিত নীলাকাশের পানে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া মুগ্ধ প্রাণে একটু হাসিল—মরি মরি কি স্নিগ্ধ মনোরম শোভা! ওগো মুক্ত সুন্দর হৃদয় বিশ্বভাবুকগণ, তোমাদের অনুভূতির চরণে প্রণাম! মিলন অভিসারের উপযুক্ত শুভলগ্ন ত ইহাই!

হাঁ—এই মুক্ত-সুন্দর আকাশের পানে চাহিয়া, একবার সকল দ্বিধা-সংকোচ মুক্ত হইয়া নিরঞ্জন প্রাণকে বাঞ্ছিত অভিসারের পথে ছুটিতে দিউক। রুদ্ধ হৃদয়ের গোপনদ্বার মুক্ত করিয়া মন ও বুদ্ধিকে বিশ্বস্তভাবে গ্রহণ করিয়া মিলনের উৎসব আরম্ভ করুক। অকপট সরলতার প্রকৃতি ও পুরুষকারের গোপন-দ্বন্দ্বকে মীমাংসার পথে বোঝাপড়া হইতে দিউক। আজ অকুণ্ঠিতভাবে জানিয়া লউক, প্রবলা প্রকৃতি কোন নিগূঢ় অভিমানে এমন ক্ষুব্ধ বিদ্রোহী হইয়া আছেন, কেন তিনি আত্মার পৌরুষ উদ্যমকে বারে বারে এমন প্রতিহত করিতেছেন? কেন তিনি সখ্যের স্থলে—নির্ম্মল বিদ্বেষে শুধু শত্রুতাকে জাগাইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার এ অপ্রীতির মূল কি?

মূল? মূল শুধু একটু ভুল মাত্র! সেই সামান্য ভুলের উপরই এই বিরাট বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

হাঁ একটা কথা! আপনাকে খর্ব্ব করিয়া একটা সত্য মনে প্রাণে স্বীকার করিয়া লইতে নিরঞ্জন চিরদিন ভয় করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু আজ একবার অকপট সাহসে নির্ভীক হইয়া হৃদ্‌পিণ্ডের কঠিন মূঢ়তার বুকে শেল হানিয়া—উচ্ছ্বসিত রক্ত-কণিকা লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুক, কোন জাতীয় রোগ-বীজাণু তাহাতে অবস্থান করিতেছে? যে দৌর্ব্বল্য

বেদনার স্মৃতি ক্রমাগতই তাহার হৃদয়কে নিষ্পীড়িত করিতেছে, সে বেদনা কি—শুধু জড় ভোগ তৃষ্ণার ব্যর্থ হাহাকারে সৃষ্ট!

সে ভালবাসিয়াছিল! হাঁ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছে ভালবাসিয়াছিল, আজিও ভালবাসিতেছে! কিন্তু সে ভালবাসা পার্থিব লালসার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে অবরুদ্ধ নহে। সে ভালবাসার স্থান তাহার ঊর্দ্ধে—বহু ঊর্দ্ধে!

বাহ্য সৌন্দর্য্য তাহার শিল্পীনেত্র মুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু সে মুগ্ধতার মাঝে এতটুকুও কামনার বিকার ছিল না! সে সৌন্দর্য্য তাহার সম্মুখে আরাধ্য দেবতার রূপের প্রতিবিম্বরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিয়াছিল, সাধন-উৎসাহ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল! সেখানে সে যাহা লাভ করিয়াছিল, তাহা শুধু অনাবিল আনন্দ!

তারপর সেই সৌন্দর্য্যের অন্তরালে, যে উন্নত মাধুর্য্যময়ী তরুণ নারীহৃদয়টি বিরাজ করিতেছে, তাহার আশ্চর্য্য প্রাণময় সত্তা যখন সে অনুভব করিল—তাঁহার অন্তরতম সত্তাকে যখন সে অতর্কিতে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিল, তখন বিস্ময়ে, বেদনায়, সম্ভ্রমে, শ্রদ্ধায় তাহার অন্তর অভিভূত হইয়া পড়িল। ভক্তির আবেগে, পূজার আকাঙ্ক্ষায়, নিজের তরুণ হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রম প্রীতির অর্ঘ্য—সেই কোমল সুন্দর হৃদয়ের চরণে, নীরবে উৎসর্গ করিল। সে নিবেদনের মাঝে লৌকিক সঙ্কোচ ছিল না, প্রত্যাখ্যানের শঙ্কা ছিল না—প্রসাদলাভে আকাঙ্ক্ষা ছিল না, সে পূজা শুধু পূজাতেই তৃপ্ত! কিন্তু তারপর?

কিন্তু তাহাতে নিজের দিক হইতে যতই তুচ্ছ লাভ ও যতই বৃহৎ ক্ষতি থাক্, তাহাতে নিরঞ্জনের বেশী দুঃখ নাই। কিন্তু তাহার দুঃখ

সেইখানেই অপরিসীম—যেখানে তাহার পূজ্যের হৃদয়ের গোপন বেদনা······উঃ থাক্, সে চিন্তার স্থান তাহার সহিষ্ণুতা-সীমার বহির্ভাগে।

অধীরভাবে উঠিয়া নিরঞ্জন দ্রুত পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, অনেকক্ষণ পরে ঈষৎ সংযত হইয়া নিশ্বাস ফেলিল—যাক্ যাহা হইয়া গিয়াছে। তাহার দুঃসহস্মৃতি বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হউক, এখন যাহা হওয়া কর্ত্তব্য তাহার চিন্তাই শ্রেয়।

লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে অন্যমনস্ক নিরঞ্জন কখন যে নিম্মল-মঠের দ্বারের কাছে আসিয়া পৌছিল তাহা তাহার স্মরণ ছিল না, সহসা দেখিল মঠের দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মহারাজা স্বয়ং তাহাকে ডাকিতেছেন! সচেতন হইয়া নিরঞ্জন উত্তর দিল। মহারাজ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমি ভেবেছিলুম তুমি তর্কের ভিড়ে জমে আছ, তা নয়, একলা বেড়াচ্ছিলে?

কুণ্ঠিত হইয়া নিরঞ্জন বলিল, "ওঁরা ওখানে বসে কথা কইছেন।"

মহারাজ হাসিয়া বলিলেন, "তর্ক চল্‌ছে বুঝি? এস একটু লঘু আনন্দ উপভোগ করা যাক্।"

অন্যদিন এ আহ্বান নিরঞ্জনের অন্তরের কাছে অপ্রীতিকর না হইলেও বিশেষ প্রীতিকর হইত না, কিন্তু আজ তাহার চিত্ত এ প্রস্তাবে সহসা প্রসন্ন আগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিল। সে ব্যগ্রভাবে বলিল, "চলুন।"

উভয়ে আসিয়া পাষাণ চত্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মদন তখন সত্য সত্যই প্রবল উত্তেজনার সহিত বক্তৃতা করিতেছিল। মহারাজ

নিঃশব্দে আসিয়া পণ্ডিতের পার্শ্বে বসিলেন। মদনের কাছে স্থান নির্দেশ করিয়া নিরঞ্জনকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

মহারাজকে দেখিয়া মদন চুপ করিল। মহারাজ পরিহাস-কোমল-কণ্ঠে বলিলেন, "সমালোচনা শ্রবণের অধিকার থেকে আমার মত বৃদ্ধকে বঞ্চিত রাখা, বড় সহৃদয়তার লক্ষণ নয়, মদন আলাপ থামালে কেন?"

মদন বিনীতভাবে বলিল, "এটা আলাপ নয় মহারাজ, কলহ!"

মহারাজ বলিলেন, "ব্যক্তিগত নাকি?"

মদন বলিল, "না মহারাজ, সাম্প্রদায়িক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা!"

মহারাজ বলিলেন, "তবে ত ওটায় কান দিতে আমিও বাধ্য। সত্য কথা বল্‌তে কুণ্ঠিত হোয়ো না মদন, এ সব আলোচনাক্ষেত্রে আমাকে তোমার সমশ্রেণীস্থ সুহৃদ বলে মনে করো।"

পণ্ডিত বলিলেন, "মদনানন্দ যুক্তিযুক্ত প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, পূজ্যপাদ বল্লভাচার্য্যদেব প্রবর্ত্তিত শুদ্ধাদ্বৈত মতবাদ যে এখন সাম্প্রদায়িক বিধি নির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান জড়ত্বে পর্য্যবসিত হয়েছে, উন্নত সাধনতত্ত্বকে আচ্ছন্ন করে যে এখন পরিতাপজনক কুৎসিত পঙ্কিলতার স্রোত বেয়ে চলেছে, সেই সকল ব্যাপার উল্লেখে উনি আক্ষেপ করছেন।"

মদন বলিল, "মহারাজ বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম অনুধাবন করবার অবকাশ এখনও পাই নি, তবে আশেপাশে যতটুকু দৃষ্টিপাত করেছি, তাতে দেখেছি বাংলা দেশে শ্রীচৈতন্যের পার্ষদগণ থেকে আরম্ভ করে, আমাদের গুরুকুলের সকলেই এক বাক্যে আমাদের সতর্ক করে গেছেন, যে বৈষ্ণব নিন্দা মহাপাপ, মহারাজ আমিও এ বাক্যের সম্পূর্ণ অনুমোদন

করি। আমি বৈষ্ণবধর্ম্মকে নিজে ভালবাসি বলে শুধু নয়—এ ধর্ম্ম আমার পিতা পিতামহের উপাস্য সাধন প্রণালী বলে, একে আমি সমস্ত প্রাণের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু মহারাজ আপনি বলুন ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে মানুষ যখন আত্মশ্লাঘা দম্ভে স্ফীত.হয়ে নির্ব্বিচারে অন্যায় ব্যভিচার স্রোত চালাতে সুরু করে, তখন হৃদয়ে কতখানি আঘাত লাগে? ধর্ম্মের নামে মানুষ নৈতিক অবনতির পথে স্বচ্ছন্দে চলেছে, এর চেয়ে বড় মনস্তাপ আর কি আছে? আমি যাকে আরাধ্য বলে শ্রদ্ধাসম্মান করি, তার অপমান—আমার অপরাধের ভয়ে কুণ্ঠিত হয়ে কোন্ মুখে নীরবে সহ্য করি বলুন?"

মহারাজ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "সহ্য করা উচিত নয়, মদন আমিও জোরের সঙ্গে স্বীকার করছি!"

উৎসাহিত হইয়া মদন বলিল, "তাই বলুন মহারাজ! প্রাণহীন আড়ম্বর অনুষ্ঠানে এখন আমাদের যথার্থ সাধনপ্রণালী আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। জানি তত্ত্বজ্ঞ সত্য সাধক যে, সম্প্রদায়ের মধ্যে—একেবারে নাই তা নয়, কিন্তু তাঁদের দ্বারা সম্প্রদায়িক উন্নতিসাধনের চেষ্টা বৃথা। তাঁরা আত্মোন্নতি সাধনার প্রতিকূল বলে, কর্ম্মবিপ্লবে ভিড়তে রাজী নন্। কিন্তু স্থিতি, সত্ত্বগুণ সম্ভব হলেও সৃষ্টিটা রজঃগুণ প্রধান্য ব্যতীত হওয়া অসম্ভব! মহারাজ আমার স্পর্দ্ধা মার্জ্জনা করুন, আপনার মত যথার্থ শক্তিশালী, উন্নত, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরুগণের চরণে কোটী প্রণাম, তাঁদের কথা নিয়ে আলোচনা করবার সাধ্য আমার নেই, কিন্তু সম্প্রদায়ের অন্যান্য গুরুকুল—যতদূর দেখেছি মহারাজ, সকলেই শাস্ত্র জ্ঞানহীন, বিলাসী, স্বেচ্ছাচারী, স্বার্থপর! স্বার্থের অনুরোধে তাঁরা অজ্ঞান শিষ্য

সম্প্রদায়কে—বিশেষতঃ স্ত্রীজাতীয়া শিষ্যাগণের দ্বারা ধর্ম্মের নামে, ইষ্ট সাধনের নামে—রাসলীলা প্রভৃতি যে সব আপত্তিজনক * অনুষ্ঠান প্রকাশ্যে সমাধা করাচ্ছেন, তা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। গুরু ততক্ষণই গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকেন—যতক্ষণ তিনি পার্থিব লঘুত্বের উর্দ্ধে নিজের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। জানি মহারাজ, আমি নির্ব্বোধের মত অপরাধী বাক্য উচ্চারণ কর্‌লুম, কিন্তু ক্ষমা কর্‌বেন—এর মধ্যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কিছুমাত্র নাই, আমি অকুণ্ঠিত সরলতায় শুধু মনের বেদনা ব্যক্ত কর্‌ছি।"

মদন চুপ করিল। কেহই কোন কথা কহিতে পারিলেন না। মহারাজ চিন্তা-গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বদনে উর্দ্ধ দৃষ্টিতে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া মদন আবার বলিল, "অজ্ঞান কুসংস্কারাচ্ছন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মূল ধর্ম্ম সাধন প্রণালীর যথাযথ মর্ম্ম রহস্য উদ্ঘাটন, সত্যজ্ঞান প্রচার ভিন্ন এই উপধর্ম্ম—এই অনাচার অনুষ্ঠান স্রোত কিছুতেই রোধ হবে না। আমাদের এই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উন্নতির চেষ্টা কর্‌তে গেলে আগে—গুরু সম্প্রদায়ের সংস্কার প্রার্থনীয়! আমি বিদ্বেষ

---

* 'বল্লভাচার্য্য বহুকাল বৃন্দাবন সন্নিহিত গোকুলে বাস করিয়াছিলেন তজ্জন্য এই সম্প্রদায়ের গুরুদিগকে "গোকুলিয়া গোঁসাঁই" বলে। তিনি অবশ্য সদুদ্দেশ্যেই সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার তিরোভাবের পর, কালের প্রভাবে উহা ভিন্ন আকার হইয়াছে। গোকুলিয়া গোঁসাইরা শিষ্যাদিগের নিকট আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া পরিচয় দেন এবং তাহাদিগকে গোপীভাবে সেবা করিতে বলেন অল্পশিক্ষিত শিষ্যারা ও অশিক্ষিত শিষ্যরা নিতান্ত বর্ব্বরের ন্যায় তাহাদের আদেশ প্রতিপালন করে।'

"রামানুজ চরিত" ১০৮ পৃঃ (পরিশিষ্ট) ৺শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত।

চাই না, বিদ্রোহিতা চাই না। আমি পরিপূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে চাই— গুরুকুলের সংস্কার! জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাসী এমন একজন ত্যাগী একনিষ্ঠ কর্ম্মসাধক চাই, যিনি সম্প্রদায়ের মঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করতে পারেন। এমন একজন সাধক পেলে, তার জীবনের মহিমায় আর দশজনের মনুষ্যত্ব আপনি উদ্বোধিত হয়ে উঠবে—পাষাণের মধ্যে চেতনা আপনি স্পন্দিত হয়ে উঠ্‌বে, তখন কারুর জন্যে কাউকে ভাব্‌তে হবে না।"

অকস্মাৎ নিরঞ্জন লাফাইয়া উঠিল। জীবনে এত বড় প্রচণ্ড চমক সে আর কখনও বোধ করে নাই। তাহার সর্ব্বশরীরে উন্মাদ তড়িৎ ঝঞ্ঝনা বহিয়া যাইতে লাগিল, বিহ্বল বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে মদনের মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

নিরঞ্জন হঠাৎ কেন এমনভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল তাহা মহারাজ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু মঠে ফিরিবার সময় হইয়াছে, তাহা মনে পড়িল। গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আর একটু বোস নিরঞ্জন, কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনে যেতে হবে—এখনো বেশী রাত হয় নি।"

নিরঞ্জন যন্ত্রচালিতের মত বসিয়া পড়িল। পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, "মদনানন্দ, ইতিপূর্ব্বে নাস্তিক, কুতর্কীগণের মুখে এ সকল বিষয়ে কুৎসা আলোচনা শুনে শুনে বড়ই বিরক্ত হয়েছিলাম, সম্প্রদায়ের ভাল মন্দ চিন্তায় কখনও মাথা খাটাই নি, তাই তোমার কথায় কোন সদুত্তর দিতে পার্‌ছি না। কিন্তু এটা নিশ্চয় বুঝ্‌ছি যে, তুমি যে দিক থেকে তর্ক যুক্তি উত্থাপন কর্‌ছ সেটা সম্পূর্ণই অন্যদিক, আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।"

ক্ষণেক থামিয়া পণ্ডিত পুনশ্চ মৃদুস্বরে বলিলেন, "আমাদের আশা আছে যে ভগবানের ইচ্ছায় একদিন সমস্ত জঘন্য প্রথা, সম্প্রদায় থেকে নিশ্চয়ই দূরীভূত হবে।"

মদন বলিল, "আমাদেরও আশা আছে যে একদিন সমস্ত পাপ, সমস্ত কুসংস্কার—শুধু এ সম্প্রদায় থেকে কেন, পৃথিবীর সকল জাতি, সকল ধর্ম্ম, সকল সম্প্রদায়, সকল মনুষ্য থেকে দূরীকৃত হবে। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছাটা সকলের ওপর—সেটাকে আমরা সাফল্যের অঙ্কে মূর্ত্তিমান বলে অনুভব করি। এ দিকে তার জন্যে নীচে থেকে আমাদের চেষ্টা শক্তিকে যে কাজে খাটান দরকার, সেটা আমরা মনে রাখ্‌তে ভুলে যাই। ভগবানের ইচ্ছার ওপর আংশিকভাবে অন্ধ নির্ভর স্থাপন করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা মানে—তাঁর সমুদয় শক্তিকে অগ্রাহ্য করা। তাঁর কিছু না কিছু শক্তি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে চেতন পুরুষকার রূপে অবস্থান কর্‌ছেন। আমরা যদি তার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার না করি, তাহ'লে তার জন্যে আমাদের প্রত্যব্যয়ের অপরাধী হতে হয় না কি?"

মহারাজ ধীর গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "হয়, বৈ কি মদন, নিশ্চয় হতে হয়।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মদন বলিল, "আপনার কথা ভুলি নি মহারাজ, আপনি এই নির্ম্মল-মঠ থেকে একটা মহৎ কর্ম্মানুষ্ঠানের সূত্রপাত করেছেন ; সেই জন্যই বড় আশায় আপনার মুখ পানে চেয়ে আছি। কিন্তু সত্য জ্ঞানকে শুধু নির্ম্মল-মঠ, সুন্দর-মঠের সীমায় আবদ্ধ রাখ্‌লে চল্‌বে না, একে চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে! অনাসক্ত কর্ম্মীর কর্ম্ম, জ্ঞান, বিশ্বহিতেই তৃপ্ত, সার্থক, ও সম্পূর্ণ।"

মহারাজ উঠিয়া মদনকে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন, মদন নীরবে তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। স্নিগ্ধকণ্ঠে মহারাজ বলিলেন, "আজ বিদায়, তোমায় বরাবর বলেছি, আজও আশীর্ব্বাদের সঙ্গে অনুরোধ কর্‌ছি মদন, তোমার এ মস্তিষ্ক, কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথ দিয়ে সংসারধর্ম্মে খাটাতে হবে। তোমার মত গৃহস্থ-সন্ন্যাসীদের সাহায্য-সমবায় ব্যতীত কোন মঙ্গল প্রতিষ্ঠান সার্থক হবে না। কাল এ সম্বন্ধে তোমায় অন্যান্য পরামর্শ দেব—আজ আর কোন কথা নয়, যাও মঠে গিয়ে বিশ্রাম কর।"

মহারাজ প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া মদন ও পণ্ডিতমহাশয় অন্য দিনের মত তাঁহাকে উদ্যানবাটিকার দ্বার পর্য্যন্ত পহুঁছাইয়া দিয়া আসিবার জন্য উঠিলেন কিন্তু মহারাজ বাধা দিয়া বলিলেন, "না আপনারা মঠে যান।"

অগত্যা তাঁহারা প্রস্থান করিলেন। মহারাজ মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী নিরঞ্জনকে আহ্বান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু নিরঞ্জনের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন, নিরঞ্জন বক্ষবদ্ধ হস্তে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া—ঊর্দ্ধমুখে স্থির নিষ্পলক নয়নে সম্মুখস্থ প্রাসাদশীর্ষ অবলোকন করিতেছে। তাহার সুদীর্ঘ ঋজু সুন্দর অবয়ব, স্থির নিশ্চল—যেন সম্পূর্ণ নিস্পন্দ।

মহারাজ নিঃশব্দে তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। ধীর কণ্ঠে ডাকিলেন, "নিরঞ্জন।"

"মহারাজ।" দৃষ্টি নামাইয়া শান্ত বদনে নিরঞ্জন তাঁহার পানে চাহিল।

মহারাজ বলিলেন, "কি দেখ্‌ছ নিরঞ্জন?"

কোমলকণ্ঠে নিরঞ্জন উত্তর দিল, "দেখ্‌ছি মহারাজ, একদিন এই প্রাসাদের প্রত্যেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে, সযত্নে এর সমুদয় মূর্ত্তিটা গড়ে তুলেছি। আজ প্রয়োজনের আদেশ পেলে, একে অকুণ্ঠিতচিত্তে নিজের হাতে ধ্বংস কর্‌তে পারি কি না?"

মহারাজ স্তব্ধ দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না।

কয় মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া নিরঞ্জন সহসা ঈষৎ বেগের সহিত বলিয়া উঠিল, "না মহারাজ, এ গুরুভার পাষাণ সৃষ্টি যতই সুন্দর হোক্‌, যতই মনোরম হোক্—কিন্তু এ বড় কঠিন! এর নিষ্ঠুরতা চাপে পৃথিবীর বুক অনেকখানি নিপীড়িত হয়ে উঠেছে, আজ তাই চেয়ে দেখছি, এর প্রত্যেক পাথরখানি খুলে, লোহার হাতুড়ীর ঘায়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে—পৃথিবীর প্রত্যেক অণু পরমাণুর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারি যদি, এর অস্তিত্বটা নিঃশেষে লোপ কর্‌তে পারি যদি—তা হ'লে বোধ হয় পৃথিবী হাল্কা হয়ে স্বস্তি পায়।"

নিশ্বাস ফেলিয়া মহারাজ বলিলেন, "নিরঞ্জন, মঠে ফের্‌বার সময় হয়েছে।"

নিরঞ্জন ত্রস্ত হইয়া বলিল, "চলুন মহারাজ।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমস্ত পথ নিরঞ্জন দীর্ঘ দ্রুত পাদক্ষেপে, অত্যন্ত ব্যস্ত, উদ্বিগ্নভাবে চলিল: মহারাজ চিরদিন দ্রুতগমন অভ্যস্ত, কিন্তু তবুও তিনি আজ নিরঞ্জনের অস্বাভাবিক গমনের সহিত পারিয়া উঠিতেছিলেন না, কেবলই পিছাইয়া পড়িতেছিলেন। বার বার তিনি সবিস্ময় দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের মুখভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাঁহার কেবলই মনে হইতেছিল—নিরঞ্জনের সেই স্নিগ্ধ-শ্রী মণ্ডিত সুকোমল মুখে, একটা অনুতাপবিদ্ধ বিবর্ণ উদ্বেগের ছায়া ক্রমশঃ ঘনাইয়া উঠিতেছে। মহারাজের বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল, তিনি ক্রমাগত ভাবিতেছিলেন, এতদিন ধরিয়া পরীক্ষা করিয়াও কি তিনি এই অদ্ভুত যুবকের প্রকৃতি বুঝিতে ভুল করিয়াছেন!

সমস্ত পথ নিরঞ্জন একটাও কথা কহিল না, মহারাজও ইচ্ছা করিয়া নীরব রহিলেন। মাথার চুলগুলার ভিতর সজোরে অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিয়া, যথেচ্ছভাবে সেগুলাকে বিশৃঙ্খল এলোমেলো করিয়া—নিরঞ্জন অধীর চরণে পথাতিবাহন করিয়া চলিল। মহারাজের সহিত পাশাপাশি চলিতে চলিতে, অজ্ঞাতে সে যে বেশী অগ্রসর হইয়া যাইতেছে, মহারাজ যে ক্লান্তভাবে পিছাইয়া পড়িতেছেন—তাহাতে সে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিল না।

তাঁহারা মঠে ফিরিলেন। বিস্তর অধিবাসীসঙ্কুল মঠে—একসঙ্গে সকলে আহারে বসিলে পাচকগণের পরিবেশনের সুবিধা হইত না, সেই জন্য ভোজনার্থীগণ তিনদলে বিভক্ত হইয়া আহারস্থানে যাইত। নিরঞ্জন

প্রত্যহ শেষদলের সহিত আহার করিতে যাইত। কিন্তু আজ মঠে প্রবেশ করিবামাত্র, প্রথমদলের আহারের আহ্বান শুনিয়া—চিন্তা-অপ্রকৃতিস্থ নিরঞ্জন বিনাবাক্যে তাহাদের সহিত মিশিয়া আহারস্থানে চলিয়া গেল।

প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে মহারাজ স্বয়ং আহারস্থানে উপস্থিত হইয়া সকলের আহার কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। নিরঞ্জন অসময়ে আহার করিতে আসিয়াছে দেখিয়া তিনি অধিকতর বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না।

প্রথম দল উঠিয়া গেল। মহারাজ অন্য দুই দলের আহার সমাধা করাইয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট আহার দুগ্ধ ও ফল প্রভৃতি গ্রহণ করিলেন। প্রত্যহ সকলের শয়ন বিশ্রামের ব্যবস্থা দেখিয়া তবে নিজে শয়ন করিতে যাইতেন, আজিও দেখিতে গেলেন। মঠের সকলেই প্রায় তখন শয়ন করিয়াছিল, দিবানিদ্রাসেবী দুই চারিজন শুধু তখনও জাগিয়া বসিয়া ভজন গান বা শ্লোকাদি আবৃত্তি করিতেছিল। মহারাজ নিরঞ্জনের শয্যা অন্বেষণ করিলেন, দেখিলেন সে নাই।

আজ নিরঞ্জনের জন্য মহারাজ সত্যসত্যই কিছু বেশীমাত্রায় উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাই শয্যায় তাহাকে না দেখিয়া তাড়াতাড়ি ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শুনিলেন সে ছাদের উপর আছে, কিন্তু মহারাজ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, নিজেই ছাদের উপর তাহাকে দেখিতে চলিলেন।

গ্রীষ্মকাল; প্রশস্ত ছাদের উপর মুক্ত চন্দ্রালোকে মঠের অধিবাসী-গণের অনেকেই আসিয়া শয়ন করিয়াছিল, সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

মহারাজ নিঃশব্দে সকলের ঘুমন্ত মুখ পরীক্ষা করিলেন—নিরঞ্জন তাহাদের ভিতর নাই। নিদ্রিত ব্যক্তিগণকে অতিক্রম করিয়া সংশয়ান্বিত চিত্তে মহারাজ ছাদের শেষপ্রান্ত খুঁজিতে অগ্রসর হইলেন, দেখিলেন ছাদের শেষপ্রান্তে নির্জ্জন স্থানে আলিসার ধারে পা ঝুলাইয়া নিরঞ্জন বসিয়া আছে, তাহার কাছে কেহ নাই।

পাছে হঠাৎ সে চমকিত বা বিচলিত হয় বলিয়া মহারাজ আর অগ্রসর হইলেন না। দূর হইতে মৃদু কাশিয়া ডাকিলেন, "নিরঞ্জন দেব।"

দৃষ্টি ফিরাইয়া নিরঞ্জন ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর দিল, "আজ্ঞে।"

নিরঞ্জন উঠিতে উদ্যত দেখিয়া মহারাজ তাহাকে নিষেধ করিয়া নিজে আসিয়া তাহার পাশে বসিলেন, ধীরভাবে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে নিরঞ্জন।"

নিরঞ্জন বলিল, "স্বচ্ছন্দে অনুমতি করুন মহারাজ।"

মহারাজ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর মৃদু-কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু সে জীবিত থাকৃতে, পরামর্শ, প্রয়োজনে, আমাকেই অভিভাবক বলে মনে কর্‌ত—এ কথা বোধহয় তোমার স্মরণ আছে?"

নিরঞ্জন বলিল, "যথেষ্ট আছে মহারাজ।"

কণ্ঠস্বর আরও স্নিগ্ধ-কোমল করিয়া মহারাজ বলিলেন, "আজ সেই দায়িত্বজ্ঞান স্মরণ করে, তোমার সঙ্গে যদি সাংসারিক বিষয়ের কিছু আলোচনা করি, তা হ'লে সেটা বোধহয় অসঙ্গত হবে না?"

নিরঞ্জন উত্তর দিল, "কিছুমাত্র না মহারাজ।"

মহারাজ ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিলেন, "তোমার বয়স হয়েছে, আর কালক্ষেপ করা উচিত নয়, এবার বিবাহ ক'রে সংসার-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।"

ব্যথিতভাবে হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "বুঝেছি মহারাজ, আমার স্বভাবের উদ্ভ্রান্ত বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করে আপনি সন্দিগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু মার্জ্জনা করুন, আপনাদের মত শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদগণকে মনঃক্ষুণ্ণ করতে বাধ্য হওয়াই বোধহয় আমার প্রাক্তন ফল; জীবনে নির্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হয়ে অনেক কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করেছি, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী হয়ে—এত বড় অকর্ত্তব্যে জ্ঞানতঃ অগ্রসর হ'তে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।"

নিরঞ্জন এরূপভাবে স্পষ্ট বাক্যে অস্বীকার করিবে মহারাজ তাহা প্রত্যাশা করেন নাই। বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কেন নিরঞ্জন, বিবাহের প্রতি তোমার এত বিদ্বেষ কেন? নারীজাতিকে তুমি কি শ্রদ্ধা কর না?"

রুগ্ন স্নায়ুতন্ত্রীতে অকস্মাৎ প্রচণ্ড আঘাত বাজিলে সমস্ত স্নায়ুকেন্দ্র যেমন তীব্র বেদনায় উগ্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে, নিরঞ্জনের অবস্থাও ঠিক্ তাই হইল। তীর-বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দৃপ্ত স্বরে বলিল, "শ্রদ্ধা!—শুধু মৌখিক ভাষায় আমি কেমন করে আপনাকে বুঝাব মহারাজ। পূজ্যের প্রতি পূজকের প্রাণভরা শ্রদ্ধার পরিমাণ কতখানি?" নিরঞ্জনের কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল, আত্মসম্বরণের জন্য তাড়াতাড়ি সে এ-দিকে ও-দিকে পায়চারি করিতে লাগিল, কথা কহিতে পারিল না।

কিয়ৎকাল পরে অপেক্ষাকৃত সংযত হইয়া সে মহারাজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। শান্তভাবে বলিল, "না মহারাজ, বিবাহের প্রতি

আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই, আমিও আপনার মত আন্তরিকতার সঙ্গে বল্‌ছি, যোগ্যতা থাকলে বিবাহ ক'রে গার্হ্যস্থাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রত্যেক যুবকের অবশ্য কর্ত্তব্য—কিন্তু আমার মত হতভাগ্যের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব বহন আমার অপ্রকৃতিস্থ প্রকৃতিতে অসম্ভব।"

চমৎকৃত মহারাজ চুপ করিয়া রহিলেন। এ সন্দেহ—বহুপূর্ব্বেই তাঁহার মনে উদিত হইয়াছিল, কিন্তু নিরঞ্জনের মত সচ্চরিত্র সুশীল যুবকের সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ ধারণা তিনি মনে পোষণ করিতে পারেন নাই। তবে এটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কি একটা প্রচণ্ড বেদনা তাহার বলিষ্ঠ শ্রমকুশলী প্রকৃতির মধ্যে—অহরহঃ প্রচ্ছন্ন কাতরতায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। তাহার উদ্যমশীল, উন্নত সংযমনিষ্ঠ হৃদয়কে কি একটা দুরন্ত আবেগ-প্রাবল্য—নিরন্তর তীব্র আলস্য-অবসাদে নিপীড়িত করিতেছে। মহারাজ ইহার কারণ কিছু খুঁজিয়া পান নাই, তিনি সময় সময় আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেন মানুষের প্রকৃতির মধ্যে যে কত অদ্ভুত বৈচিত্র্যের সমাবেশ থাক্‌তে পারে—তরুণ শিল্পীর ভাবুক প্রকৃতি তাহার জাজ্বল্যমান উদাহরণ। সেই জন্য তিনি সরলভাবে চিরদিন নিরঞ্জনের অসতর্ক কথাবার্ত্তা ও অদ্ভুত বিশেষত্বপূর্ণ আচার ব্যবহারের ত্রুটি—স্নিগ্ধ স্নেহময় দৃষ্টিতে দেখিয়া হাসিয়া উড়াইতেন, কচিৎ মন সংশয়ান্বিত হইয়া উঠিলে তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। কিন্তু আজ তিনি বিস্ময়ে চমকিত হইয়াছেন।

চিন্তাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া নিরঞ্জন ক্ষণেক নীরব রহিল। তারপর বলিল, "না মহারাজ, আমি শঙ্করাচার্য্য নই, কিন্তু আমি তবুও—চিরদিন

যথেষ্ট শ্রদ্ধা, সম্ভ্রমের সহিত, দূর হ'তে নারীজাতিকে প্রণাম করে আস্‌ছি, এইটুকু জেনে আপনি দয়া করে ক্ষান্ত হোন, এর ওপর কোন তর্ক, কোন প্রশ্ন উত্থাপন করবেন না।"

মহারাজ বলিলেন, "নিরঞ্জন, অতিবাহিত জীবনে উদ্দেশ্যহীনভাবে আশঙ্কা যথেষ্ট।"

পরিতপ্ত বেদনার বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "আশঙ্কা, কি বলেন মহারাজ, আমার জীবন সত্যই লক্ষ্যহীন। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় করতে সিদ্ধকাম হবঁ বলে—'মমায়ত্ত হি পৌরুষম্' মন্ত্র সম্বল করে শিল্পতত্ত্বের ওপর ঝুঁকেছিলাম, কিন্তু এখন দিনে দিনে বুঝতে পারছি, বাইরের দিকেই সাফল্য লাভ করেছি কিন্তু অন্তরের পক্ষে সে শুধু শাস্তিদায়ক পীড়া হয়ে উঠেছে। শিল্পতত্ত্বের ওপর শ্রদ্ধা থাকলেও আর আগ্রহ নাই মহারাজ, উৎসাহ নাই। আন্তরিক উদ্যম নিষ্ঠাহীন হৃদয় নিয়ে, শুধু ব্যবসায়ের অনুরোধে—ঐ উন্নত-সুন্দর শিল্পচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হ'তে আর ইচ্ছা নাই। স্পষ্ট বুঝছি এ-যাত্রা—আমার ইষ্ট-দেবতার চরণে আত্ম-নিবেদনের যাত্রা নয়, এ শুধু উপদেবতার চরণে আত্ম-বলিদানের অভিযান। না মহারাজ, আত্মোন্নতি সাধনার নামে—এমন আত্মপ্রতারণার গ্লানি অসহ্য!" নিরঞ্জন সজোরে অধর দংশন করিয়া থামিল, তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

মহারাজ ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। আত্মসম্বরণ করিয়া নিরঞ্জন আবার বলিতে লাগিল, "আমার চারিদিকে মায়ার ইন্দ্রজাল আজ আত্মকৃত অভিশাপের বোঝা স্তূপাকার হয়ে উঠেছে। তারই জমাট আবেগে আমার প্রকৃতির মধ্যে দুঃসহ জড়-পঙ্গুত্ব এসে

পড়েছে। আমি কিছুতেই গণ্ডি কেটে আপনাকে ভিতর থেকে মুক্তি দিতে পারছি না, অতৃপ্তির চরণে অনর্থক প্রাণের অর্ঘ্য ঢেলে দিয়ে যাচ্ছি। কাজেই নিষ্ফলতার ক্ষোভে অলক্ষিতে আমার অন্তর ক্ষিপ্ত উদ্ভ্রান্ত হয়ে উঠছে! আজ আপনাদের সম্প্রদায়গত সাধন সমস্তার নিগূঢ় সংবাদ উপলব্ধি করেছি, আমি স্তম্ভিত হয়েছি,। মহারাজ আজ বোধ হচ্ছে, আমারও অন্তরের মধ্যে ঐ রকম গুরু শিষ্যের সম্বন্ধে বৈষম্যে—অনর্থ সাধনের ব্যাধি উদ্ভূত হয়েছে! মহারাজ আমি দৃষ্টি স্বাস্থ্য হারিয়েছি, আমার নির্দ্দিষ্ট পথ খুঁজে পাচ্ছি না, আমার জীবন মন অবসন্ন হয়ে পড়েছে. আজ বুঝতে পারছি, বৈষয়িক গৌরব আড়ম্বরে বহিরাংশটা আবৃত করে, আমার লক্ষ্যহীন জীবন—বয়ে চলেছে শুধু এক অন্ধ একজায়িতার পথে।"

মহারাজ অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নিরঞ্জন তোমার গুরু-করণ হয়েছি কি?"

অনুতপ্তকণ্ঠে নিরঞ্জন উত্তর দিল, "হয় নি বললে প্রত্যবায়ের ভাগী হতে হবে মহারাজ! জীবনের কোন সময়ে হয়ত অন্তর-গুরুর কাছে অজ্ঞাতভাবে দীক্ষা পেয়েছি। তারপর—জানিনে কখন নিজের মূঢ় চপলতায় শিষ্যত্ব গ্রহণের শক্তি হারিয়ে ফেলেছি, তাই আমার অন্তরতম প্রদেশে—নিত্যসত্য সম্বন্ধের মধ্যে এক উৎকট দুঃসহনীয়তা এসে পড়েছে। মার্জ্জনা করুন মহারাজ, আর আমি আপনাকে নিজের অবস্থা বোঝাতে পারব না!"

মহারাজ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। নিরঞ্জন ছাদের চতুর্দ্দিকে চক্র দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া আবার মহারাজের কাছে দাঁড়াইয়া

বলিল, "মহারাজ মঙ্গল কর্ম্মানুষ্ঠানে সত্য সত্য চিত্তশুদ্ধি হয় কি? আজ আপনার কাছে আমি এ প্রশ্নের নিশ্চিত উত্তর জান্‌তে চাই।"

ধীর—স্থির স্বরে মহারাজ উত্তর দিলেন, "হয়, যদি পূর্ণ সাত্বিকভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান পালন কর্‌তে পারা যায়।" নিরঞ্জন মহারাজের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, "তবে মহারাজ এবার আপনি কৃপা করুন। আমায় হাতে ধরে পথ নির্দ্দেশ করে দিন, আপনার সম্প্রদায়ের কল্যানের জন্য আমায় উৎসর্গ করে দিন। আমি সেইখানে মহৎ কর্ম্মক্ষেত্রে সাধনার হোমানলে প্রাণের বিরাট জঞ্জালস্তূপ পুড়িয়ে ফেলে মুক্ত হই।"

মহারাজ শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "আত্মোন্নতি সাধনার ক্ষেত্রে কোন কর্ম্ম ক্ষুদ্র নাই, কোন কর্ম্ম বৃহৎ নাই নিরঞ্জন। অনুষ্ঠেয় ব্রতের পক্ষে ক্ষুদ্র দুর্ব্বাঙ্কুরটিও মহৎ প্রয়োজনীয় বস্তু! আত্মোন্নতি সাধনার ক্ষেত্রে যিনি দাঁড়াবেন, তিনি যেমন তৃপ্ত আনন্দে দেবতার চরণে পুষ্পচন্দন অর্পণ কর্‌বেন, প্রয়োজনের অনুরোধে তেমনি শ্রদ্ধা-নিষ্ঠ হৃদয়ে, পতিত, ঘৃণিত, হতভাগ্য আর্ত্তজীবের মলমূত্র পরিষ্কারেও প্রফুল্ল আনন্দে আত্মনিয়োগ কর্‌বেন তবে তাঁর ব্রত উদযাপন হবে, সাধন সার্থক হবে। ভাল, তোমার মানসিক গতিপ্রবণতা আপাততঃ কোন্ দিকে?"

"আপাততঃ!" বেদনাহত কণ্ঠে নিরঞ্জন উত্তর দিল, "অতীতের মর্ম্ম-বিদারক ইতিহাস অন্ধকারেই থাক্ মহারাজ, 'আপাততঃ', এর সংবাদই শিরোধার্য্য! মহারাজ, নারী সমাজের সংস্রব পরিত্যক্ত হলেও—নারীজাতির মহৎ সম্মান আমার কাছে চিরদিন বন্দনীয়! তাই নারী সমাজের অপমান, অবনতির সংবাদ আমার হৃদয়ের কাছে আজ

একটা তীব্র বেদনা বহন করে এনেছে। কিন্তু আমার সাহস স্পর্দ্ধা নাই মহারাজ, নিজের শক্তিকে বিশ্বাস করতে ভয় হয়, কিন্তু তবুও—তবুও মহারাজ মুক্তকণ্ঠে বলছি, আমার এ আকাঙ্ক্ষা, তীব্র অকপট! এখন আপনি যদি আশীর্ব্বাদ করেন—আপনি যদি অনুমতি করেন—"

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া, নিরঞ্জন উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে মহারাজের মুখপানে তাকাইল। মহারাজ ওষ্ঠের উপর অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া খানিকক্ষণ কি ভাবিলেন, তারপর বলিলেন, "দয়াশক্তির অযথা অপব্যবহারের নাম অহমিকার দম্ভ! আমি তোমায় যথেষ্ট স্নেহ করি নিরঞ্জন, কিন্তু স্নেহের মুখ চেয়ে পরামর্শ দিলে, অনেক সময় অবিচার করা হয়। অনুমতি, বিবেচনা সাপেক্ষ। আমি সমস্ত অন্তরের সঙ্গে আশীর্ব্বাদ করছি, ভগবান তোমার মঙ্গলেচ্ছা সিদ্ধির সহায় হোন, আমার মতামত যথাসম্ভব বিবেচনার পর কাল তোমায় জানাব।"

মহারাজ নিরঞ্জনকে সঙ্গে করিয়া ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া, তাহাকে শয়ন কক্ষে পৌছাইয়া দিয়া নিজে বিশ্রাম করিতে গেলেন।

অতি প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর নিরঞ্জন সবেমাত্র শয্যাত্যাগ করিতেছে, এমন সময় মহারাজ আসিয়া কক্ষে ঢুকিলেন। নিরঞ্জন প্রণাম করিল, মহারাজ তাহার স্পর্শে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি চিরদিনই সীমাবদ্ধ। জানিনে মঙ্গলময়ের কি ইচ্ছা, কিন্তু আমি যথাসাধ্য বিবেচনা করে দেখলাম, এ ক্ষেত্রে তোমার মত উদ্যমশীল কর্ম্মঠ ব্যক্তির আগ্রহে বাধা দেওয়া সমীচীন নয়, তা ছাড়া আমি যতদূর বুঝেছি, তাতে বোধহয় তোমার দ্বারা সংসার

ধর্ম্ম পালন অপেক্ষা অন্য ধর্ম্ম সাধন ব্যাপারে শ্রেয় লাভের আশা অধিক। তুমি আপাততঃ নীলাচলে শ্যামানন্দ আচার্য্যের আশ্রমে গিয়ে বিধি নির্দ্দিষ্ট পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করে শাস্ত্রচর্চ্চা প্রভৃতির দ্বারা চিত্তোন্নতি সাধন কর, তার পর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হোয়ো। আজ দীক্ষার পক্ষে প্রশস্ত দিন আছে নিরঞ্জন, আমি সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করতে বলেছি। তুমি স্নান করে এস, আমি আজই তোমায় দীক্ষা দেব।"

প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞ দীন কণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল, "আপনি আশীর্ব্বাদ করুন মহারাজ, আমি যেন দীক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত হতে পারি।"

মহারাজ তাহার মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করছি, যেন তোমার শেষ রক্ষা হয়।"

দীক্ষা শেষে, পরদিন মহারাজকে প্রণাম করিয়া অন্যান্য সাধুপণ্ডিত-গণের সস্নেহ আশীর্ব্বাদের মধ্যে বিদায় গ্রহণ করিয়া, নিরঞ্জন নীলাচল যাত্রা করিল। সকলে বিস্মিত হইলেন, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আশ্চর্য্য হইল মদন। কিন্তু মহারাজ তাহাকেও ছাড়িলেন না, তাহার দীক্ষালাভ আগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "তুমি আগে কলেজে গিয়ে আইন বিদ্যা অধ্যয়ন করে এস, পরে তোমার দীক্ষার ব্যবস্থা হবে।" ক্ষুণ্ণ চিত্তে মদন মহারাজের আদেশ পালনে প্রতিশ্রুত হইয়া পর দিন নির্ম্মল-মঠ ত্যাগ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দেওয়ালের গায়ে প্রজ্জ্বলিত 'সেজের' সুরঞ্জিত কাঁচাবরণের ভিতর হইতে স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটা নির্গত হইতেছিল; সমস্ত গৃহের দৃশ্য সেই রঙএর আবেশে মধুরোজ্জ্বল মাধুরী-স্নাত দেখাইতেছে। একটা চারিপাঁচ মাসের ফুল্ল মল্লিকা-শুভ্র সুন্দর শিশু ঘরের মেঝের সতরঞ্চির উপর শুইয়া—অব্যক্ত হর্ষোচ্ছ্বাসে অর্থহীন শব্দে, হস্ত পদ আস্ফালন করিয়া আলোকের দিকে চাহিয়া চাহিয়া খেলা করিতেছিল। শিশুর পাশে বসিয়া, তাহার পিতা মন্মথনাথ তাহার চিবুকে মৃদু মন্দ তর্জ্জনী আঘাত করিয়া সস্নেহে আদর করিতেছিলেন। ঘরে আর কেহ ছিল না।

মন্মথনাথের আর্থিক অবস্থা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছায় এখন তাঁহাকে সংসার খরচের অসচ্ছলতার জন্য ভাবিতে হয় না, প্রয়োজনীয় আইন-পুস্তক ইচ্ছামত না কিনিতে পারায় আক্ষেপ করিতে হয় না। এখন তাঁহার অনেকগুলি আলমারী পুস্তকে ভরিয়া গিয়াছে। যদিচ আড়ম্বরের বাহুল্য ছিল না, তথাপি সচ্ছলভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী, গৃহের একান্ত আবশ্যকীয় আসবাবপত্রগুলা হইতে দৈন্যের মলিন চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে লোপ হইয়া গিয়াছে। দরিদ্রের মুখ চাহিয়া দয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ জন্য চতুর্দ্দিকে তাঁহার যথোচিত সুনাম বিঘোষিত হইয়াছে। তরুণ ব্যবহারজীবির ভবিষ্যত আশা সম্বন্ধে বার-লাইব্রেরীর শামলাধারী

সভ্যবৃন্দ এখন নিঃসন্দেহে নিজেদের আনুমানিক ভরসা বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া থাকেন।

অল্পদিন হইল, স্বর্গের সৌরভ-প্রীতি বহন করিয়া তাঁহাদের গৃহে ঐ সুন্দর-কোমল শিশুটি আবির্ভূত হইয়াছে। শিশুর মুখপানে চাহিয়া পিতা আনন্দে উৎসাহিত, মাতা স্নেহে আত্মবিস্মৃতা! দাম্পত্যের দায়িত্ব এখন স্বামী স্ত্রীর নিকট উজ্জ্বল চেতনায় সজীব সুন্দর, সংসার এখন তাঁহাদের চক্ষে আনন্দ লীলা-নিকেতন! বড় সুখে দিন কাটিতেছে।

কিন্তু অন্যত্র দুঃখ দুর্ঘটনার অসদ্ভাব ছিল না। বোম্বাইয়ের— বৎসরে শোচনীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। অকালে সন্তান প্রসব করিয়া হৃষীকেশের গুণবতী পত্নী শিশুসহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। শোককাতর হৃষীকেশ যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া একমাত্র কন্যা মমতাকে যোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিয়া, কর্ম্মে অবসর লইয়া কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর বোম্বাই ফিরিতে হইল না, একদিন হঠাৎ বিসূচিকা রোগে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

তারপর সম্প্রতি বেদান্তবাগীশ মহাশয় দেহরক্ষা করিয়াছেন। কেবলরাম অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া এখন তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার বিবাহ হইয়াছে। শান্তিদেবী বোম্বাইয়ে কেবলরামের নিকট রহিয়াছেন। আজ তাঁহার নিকট হইতে পত্র আসিয়াছে, মন্মথনাথ সেই পত্র হাতে লইয়া, আজ অসময়ে মায়ার অপেক্ষায় গৃহে বসিয়া-ছিলেন—বৈঠকখানায় যান নাই।

তখন গ্রীষ্মকাল অবসান প্রায়। দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়া, ক্লান্তিহারী মৃদুমন্দ নৈশ সমীরণ কক্ষ মধ্যে ভাসিয়া আসিতেছিল, বাহিরে কৃষ্ণা চতুর্থীর সান্ধ্য জ্যোৎস্না কিরণ বিভাসিত নীলাকাশে অগণ্য নক্ষত্র হাসিতেছিল। নিদাঘ দিবসের খরতাপ-ক্লেশ-পীড়ন-মুক্তা প্রকৃতির শোভা এখন স্নিগ্ধ আনন্দময়ী।

মন্মথনাথ বসিয়া শিশুকে আদর করিতেছেন, অল্পক্ষণ পরে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধপাত্র হাতে করিয়া, মায়া দ্বারদেশে আসিয়া দেখা দিল। গৃহে ঢুকিতে উদ্যত হইয়া মায়া একবার থামিল, স্নিগ্ধ দীপালোক উদ্ভাসিত কক্ষ দৃশ্য—তাহার চক্ষে, অপূর্ব্ব নয়নাভিরাম, চমৎকার প্রীতি সুন্দর বোধ হইল। মায়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে একবার চাহিল—প্রস্ফুট যুঁথিকা স্তবক তুল্য ক্ষুদ্র শিশুর পানে—একবার চাহিল প্রসন্ন মহিমা-স্নাত-মূর্ত্তি স্বামীর পানে।

দ্বার-প্রান্তবর্ত্তিনী মাতার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই শিশু পায়ের ভরে উত্তরার্দ্ধ উপর দিকে ঠেলিয়া, সজোরে হাত পা ছুঁড়িয়া, অসহিষ্ণুতা জ্ঞাপক মৃদুমন্দ ক্রন্দন আরম্ভ করিল। ঘাড় ফিরাইয়া মন্মথনাথ পিছনে দ্বারের দিকে চাহিয়া, মায়াকে দেখিয়া হাসিলেন। শিশুকে লক্ষ্য করিয়া কৃত্রিম কোপে বলিলেন, "এই-ও ছুঁচো, এতক্ষণের পর এই বুঝি কৃতজ্ঞতা হ'ল! এই দিকে চা'—ওদিকে নয়।" তিনি শিশুর চিবুক ধরিয়া, মুখখানা টানিয়া নিজের দিকে ফিরাইলেন, তার পর হেঁট হইয়া সস্নেহে তাহার ললাট চুম্বন করিলেন।

শিশু কিন্তু সে উৎকোচে ভুলিল না, সে আবার মাতার পানে দৃষ্টি ফিরাইবার চেষ্টা করিল। মায়া স্নেহ-কোমল হাস্য-রঞ্জিত বদনে অগ্রসর

লইয়া আসিয়া দুধের বাটি নামাইয়া তাহার কাছে বসিল। শিশুর উদরে হস্তার্পণ করিয়া ঈষৎ নাড়া দিয়া বলিল, "কান্না কেন? বড় খিদে পেয়েছে বুঝি?"

মন্মথনাথ মায়ার হাত টানিয়া লইয়া বলিলেন, "বুঝ্‌তে ভুল করছ মায়া, ও কান্নাটা খিদের দৌরাত্ম্যে নয়, ওটা সম্পূর্ণ দুষ্টু বুদ্ধির লক্ষণ; থাম, আস্কারা দিয়ে কোলে তুলো না, একবার কাঁদতে দাও, এখনি দেখ্‌বে আপনি ঠাণ্ডা হবে।"

মায়া শিশুর মুখ পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। শিশু ব্যগ্রভাবে হস্ত-পদ সঞ্চালন করিয়া, মাতার কোলে উঠিবার জন্য খানিকক্ষণ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল, তারপর ভুলিয়া গেল, আলোর দিকে চাহিয়া, আপন মনে খেলা করিতে লাগিল।

ঝিনুকে দুধ লইয়া বাটিতে ঢালিয়া জুড়াইতে জুড়াইতে মায়া বলিল, "তুমি যে বড় অসময়ে ঘরে এসে বসে আছ?"

মন্মথনাথ বলিলেন, "তোমায় দেখ্‌ব বলে।"

মুখ নত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মায়া বলিল, "ও কথাটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

মন্মথনাথ মায়ার হাতে একখানি চিঠি দিয়া বলিলেন, "তবে নাও, শান্তি দিদি তোমায় আশীর্ব্বাদের সঙ্গে ঠাট্টা করে চিঠি লিখেছেন, তুমি নমুর বিয়ের সময় ওজর করে যাওয়ার প্রস্তাব কাটিয়েছিলে, বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের শ্রাদ্ধের সময় হঠাৎ শরীর খারাপ বলে যেতে অক্ষম হয়েছিলে, তাই 'কান্ টান্‌লেই মাথা আসে' প্রবাদের উল্লেখ করে বলেছেন এবার তুমি কি ওজর করে যাওয়া নাকচ কর্‌বে তিনি তাই ভাব্‌ছেন।"

"কেন ?" মায়া বিস্মিত হইয়া স্বামীর পানে চাহিল।

"এবার একটা বড় মামলা পেয়েছি, বম্বে কোর্টে গিয়ে দিনকতক গলা বাজি করতে হবে।"

"তোমায়! কবে ?"

"দিন দশেকের মধ্যে বেরুতে হবে। মাদ্রাজ থেকে একজন ব্যারিষ্টার আসবে, আর এলাহাবাদ থেকে উকীল শ্রীশ বাবুর জুনিয়ার হয়ে আমাকে যেতে হবে। দৈনিক ফিস্ ওঁকে আড়াই শো' দেবে আমায় পঁচাত্তর।"

বোম্বাই যাওয়ার নাম শুনিয়া মায়া ভিতরে যেন একটু দমিয়া গিয়াছিল। মুখে কষ্ট-সৃজিত হাসি টানিয়া লঘু কৌতুকের স্বরে বলিল, "ওঃ মোটা পাওনা।"

হাসিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "দেখ্‌ছ কি ? তোমার বরাত জোর খুব ? মামলা চল্‌বেও অনেক দিন, মঙ্গলমঠের গদি নিয়ে ঝগড়া বেধেছে।"

অধিকতর বিস্ময়ে মায়া বলিল, "মঙ্গলমঠের গদি নিয়ে! কার সঙ্গে ?—"

মন্মথনাথ বলিলেন, "মঠের অধিকারী দেবকীনন্দন মাসখানেক হল হঠাৎ মারা গেছেন। কুসংসর্গে মিশে দুশ্চরিত্রতা আমোদে মেতে তিনি বিস্তর দেনা রেখে গেছেন, সেই সব নিয়েই ত এক গোলমাল বেধেছে. তার ওপর দেবকীনন্দন অপুত্রক অবস্থায় মারা গেছেন, তাঁর একটি ছোট নাবালিকা মেয়ে আছে। সুরাটের সুন্দর-মঠের মোহন্ত মহারাজ মঙ্গল-মঠের অধিকারীদের মন্ত্রগুরু, সুতরাং বর্ত্তমানে তিনিই মঠের

অভিভাবক, তিনি বলছেন্ দেবকীনন্দনের ঐ মেয়েটিকে যোগ্যপাত্রে অর্পণ করে সেই জামাইকে মঠের গদি দেওয়া হোক। এ দিকে মঙ্গল-মঠের দেওয়ান দেবলচাঁদ, মৃত অধিকারী মহারাজের দূর সম্পর্কীয় ভাগিনেয়—তিনি বলছেন অপুত্রক অধিকারী মহারাজের অবর্ত্তমানে, ঐ মঠের গদি আইনানুসারে তাঁরই প্রাপ্য, এই নিয়ে মামলা। দেবলচাঁদ 'মোরিয়া' হয়ে লেগেছে, মঠের তহবীল ভেঙ্গে শুনছি নাকি বোম্বে কোর্টের সমস্ত বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টারদের হাত করেছে, সেইজন্য সুরাটের মোহন্ত মহারাজ অন্য জায়গা থেকে উকীল ব্যারিষ্টার নিয়ে যাচ্ছেন।"

মন্মথনাথের সব কথা মায়ার কানে ঢুকিল কি না ঈশ্বর জানেন, সে কিন্তু কোন উত্তর দিল না, উন্মনা ভাবে শুধু ঝিনুক বাটি লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিল।

মন্মথনাথ বলিলেন, "থাক্, আমাদের যথালাভ; কেবলবাবুর যত্নে আর এখানে আমাদের শ্রীশবাবুর অনুগ্রহে, এবার আমার ভাগ্যলক্ষ্মী বোধ হয় প্রসন্ন হ'লেন। এত বড় মামলায় হাত লাগাবার সৌভাগ্য এর আগে আর হয় নি, এতদিন যত্র আয় তত্র ব্যয় হয়েছে, এবার দেখা যাক্, কিছু গুছিয়ে ফেলতে পারি কিনা। হ্যাঁ ভাল কথা—সহাস্যে মন্মথনাথ বলিলেন, "শান্তি দিদিকে তোমার যাওয়ার কথা কি লিখ্‌ব বল?"

মায়া কোন উত্তর দিল না। শিশু শুভ্র কোমল কচি হাত দুটিতে নিজের পা টানিয়া ধরিয়া সাগ্রহে পদাঙ্গুলি চুষিতেছিল, মায়া একাগ্র মনোযোগে তাহাই দেখিতে লাগিল।

উত্তর প্রত্যাশায় ক্ষণেক নীরব থাকিয়া মন্মথনাথ সবিদ্রূপে বলিলেন, "ভাল যা হোক, চমৎকার নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলের খেলা দেখ্‌ছ, আর আমি ভদ্রলোক যে কাজের কথা নিয়ে হাঁ করে বসে আছি—তার খোঁজ নাই !"

চমকিয়া দৃষ্টি তুলিয়া মায়া অস্বাভাবিক বিষণ্ণ বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "কি বল্‌ছ ?"

"তোমার যাওয়ার কথা—" সহসা মন্মথনাথ স্তব্ধ হইলেন। মায়ার গম্ভীর মলিন মুখ পানে চাহিয়া তিনি বিস্ময়ের সহিত বেদনা অনুভব করিলেন। তাঁহার স্মরণ হইল, বোম্বাই যাইতে চির অসম্মতা মায়াকে আজ এরূপ স্থলে বোম্বাই যাওয়ার কথা লইয়া বিদ্রূপ করাটা সমীচীন হয় নাই, সেখানকার উপর্য্যুপরি সংঘটিত শোক-দুর্ঘটনার স্মৃতি নিশ্চয়ই মায়ার মনকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কোন ভুল নাই।

কণ্ঠস্বর নামাইয়া মন্মথনাথ মৃদু ভাবে বলিলেন, "মন খারাপ কর'না মায়া, ঈশ্বরাধীন কাজ মানুষকে নিঃশব্দে মাথা পেতে নিয়ে চল্‌তে হয় যা হয়ে বয়ে গেছে, তার স্মৃতি-পীড়ন মনকে ভুলে যেতে দাও।"

মায়ার মুখ পাংশু বিবর্ণ হইয়া গেল। মুহূর্ত্তের জন্ত বোধ হইল সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে, পরক্ষণে সহসা ব্যগ্রভাবে মায়া শিশুকে তুলিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। তারপর বিস্ময় নির্ব্বাক মন্মথনাথের মুখ পানে চাহিয়া স্থির কণ্ঠে বলিল, "আমার মনে কর্‌বার ত আর কিছু নাই, দরকার হয়—তোমরা যদি বল আমি নিশ্চয় সেখানে যাব।"

মন্মথনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এ প্রসঙ্গে এইখানেই নিরস্ত হওয়া

উচিত বুঝিয়া, অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন, "শান্তি দিদিকে পত্র লিখে, আমি এখনই শ্রীশবাবুর বাসায় যাব, মাম্‌লার কথাবার্ত্তা শেষ করে ফির্‌তে বোধহয় রাত হবে, ঠাকুরকে বোলো আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে যেন তারা হাঁড়ি হেঁসেল তুলে খেয়ে দেয়ে যায়।"

মন্মথনাথ চলিয়া গেলেন। মায়া শিশুর মুখ পানে চাহিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় শুব্ধ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। শিশু স্তন্যপান করিতে করিতে জঠরানল নিবৃত্তির আরাম অনুভব করিয়া, মার কোলে ঘুমাইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। মায়া পূর্ব্বের মতই জড়-অচেতন ভাবে বসিয়া রহিল, শিশু যে তাহার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহা স্মরণ ছিল না। সে কেবলই ভাবিতেছিল, এত দিনের পর সত্যই আবার বোম্বাই যাইতে হইবে? সেই মহা অমঙ্গলের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের ক্ষেত্র, কিশোর হৃদয়ের সেই মহা শোক সমাধির জীবন্ত শ্মশান মঙ্গল-মঠে এতদিনের পর আবার ফিরিয়া গিয়া দাঁড়াইতে হইবে?

ঝি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "মা, শিরীশবাবুর বাড়ী থেকে মেয়েরা এসেছেন, নীচে দাঁড়িয়ে আছেন।"

মায়ার স্বপ্নঘোর ছুটিয়া গেল। তাড়াতাড়ি শিশুকে দোল্‌নায় শোওয়াইয়া দিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

এখানকার প্রতিবেশী বাঙ্গালী পরিবারগুলির সহিত ইতিমধ্যে তাহাদের যথাসম্ভব আলাপ পরিচয় হইয়া গিয়াছে, ক্রিয়া কলাপে নিমন্ত্রণ

আমন্ত্রণও যথাবিহিত বিধানে প্রচলিত হইত। বিশেষতঃ কার্য্য সম্পর্কে শ্রীশবাবু উকীলের বাড়ীর সহিত তাহাদের পরিচয় কিছু বেশী হইয়াছে। মায়া নীচে আসিয়া দেখিল, শ্রীশবাবুর দুই পুত্রবধূ ও বিধবা কন্যা মালতী ঠাকুরাণী আসিয়াছেন, সঙ্গে শ্রীশবাবুর দশম বর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্র শান্তিচরণ ও মালতী ঠাকুরাণীর পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্র নন্দলাল এবং বাড়ীর সরকারী ঠান্‌দিদি—বয়স্কা গৃহিণী বলিয়াই হউক, অথবা দলের প্রধান পদে অভিষিক্ত হইয়া-ই হউক আসিয়াছেন। মায়া সসৌজন্য প্রণাম নমস্কারের পর তাঁহাদের বসিতে আসন দিল, কিন্তু ঠান্‌দিদি হাসিয়া বলিলেন, "আসন রাখ নাত্‌বৌ, বস্‌তে আসি নি ভাই, বেড়াতে এসেছি, নাতি আমাদের ওখানে আটক পড়েছে, ফিরে আস্‌তে অনেক দেরী হবে, খবর পেয়ে তোকে চুপি চুপি বের করে নিয়ে যেতে এসেছি, ছেলে ঘুমিয়েছে ?"

ঠান্‌দিদির রসিকতায় মায়া হাসিল, বলিল, "ছেলে ঘুমিয়েছে ঠান্‌দিদি, আপনারা কোথায় বেড়াতে যাবেন রাত্রে ?"

ঠান্‌দিদি একটা অনির্দ্দিষ্ট স্থানের নামোল্লেখ করিয়া আবার রহস্য ফাঁদিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু আগ্রহ অধীর বালক নন্দলালের বাজে সময় নষ্ট করিতে ধৈর্য্যে কুলাইল না, সে অগ্রসর হইয়া বলিল, "শীগ্‌গী বেরিয়ে পড়ুন মামিমা, আমরা মঠের ধারে দাদাবাবুর নূতন বাগানে বেড়াতে—"

ব্যস !—দলকে-দল একযোগে হাঁ হাঁ করিয়া উৎসাহিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন যে, জ্যোৎস্না রাত্রে নির্জ্জন মাঠের ধারে বাগানে, অসঙ্কোচ আনন্দে পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইবার জন্য সখের সঙ্কল্প আঁটিয়া অল্প বয়স্কা

বধূ দুইটি ননদের সহিত যোগ-সাজস করিয়া স্নেহময়ী ঠান্‌দিদির কাছে আব্‌দার্‌ ধরিয়া—তাঁহার দ্বারা শাশুড়ীর অনুমতি আদায় করিয়া লইয়াছে। এখন সঙ্কল্প সিদ্ধির পথে ছেলে দুইটিকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছে, সঙ্গে গাড়ী পাল্‌কীর হাঙ্গাম নাই—শুধু সতর্কতার বিনাশ নাই বলিয়া, দুইজন দ্বারবান্‌কে আনা হইয়াছে। তাহারা বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।

মায়া অবাক হইয়া তাহাদের উৎসাহপ্রখর আনন্দ-চঞ্চল প্রফুল্ল সুন্দর মুখগুলির শোভা দেখিতে লাগিল। সংসার-জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়াও ঐ বৃদ্ধা ঠান্‌দিদির কি সরল স্নেহ কোমলতা! তিনিও এই অল্প বয়স্কের দলে মিশিয়া ইহাদের আমোদ-প্রিয়তা চরিতার্থ করিবার জন্য কৌতুক উদ্যমে যোগদান করিতে দ্বিধা করেন নাই? আশ্চর্য্য ব্যাপার!—ইহাকেই বুঝি বলে, পরার্থে আত্মনিয়োগ!

মালতীদেবী প্রসন্ন-স্মিত বদনে বলিলেন, "বৌ-ঠাক্‌রুণ, ভেবো না, নন্দকে পাঠিয়ে চুপি চুপি মন্মথবাবুর মত আনিয়েছি।"

মাতার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে নন্দলাল সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ মামিমা, মন্মথবাবু ব'লে দিয়েছেন, চব্বিশ ঘণ্টা একলাটি বাড়ীতে থেকে মন খারাপ হয়ে যায়, ঠান্‌দিদি অনুগ্রহ করে বেড়াতে নিয়ে যাবেন এ ত খুব আনন্দের কথা। খোকাকে ঝিয়ের কাছে রেখে তোমার মামিমাকে যেতে বোলো।"

এত লোকের সমক্ষে স্বামীর এই সদয় সহানুভূতিপূর্ণ আগ্রহ মায়াকে বাহিরে লজ্জিত করিল—অন্তরে পীড়া দিল। "চাদর নিয়ে আসি—" বলিয়া মায়া তাড়াতাড়ি ঘরে চলিয়া গেল।

দোল্‌নায় শিশু ঘুমাইতেছিল, সন্তর্পণে তাহাকে চুম্বন করিয়া বিষণ্ণ নিশ্বাস ফেলিয়া মায়া চাদর গায়ে জড়াইয়া বাহিরে আসিল। ঠাকুরকে যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিয়া, ঝিকে খোকার জন্য বারম্বার সতর্ক করিয়া—সঙ্গিনীদের সহিত মিলিত হইয়া, মায়া বেড়াইতে চলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সকলে উৎসাহিত পাদক্ষেপে চলিতে আরম্ভ করিল। অদূরে আর একটি বাটী হইতে একজন প্রতিবেশিনী রমণীকে ডাকিয়া লওয়া হইল, রমণী তাহার বালিকা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন, যাত্রীদল বেশ পুষ্ট হইল।

বালকবালিকা তিনটি সকলের আগে চলিল, তারপর বধূদ্বয়, তারপর মায়া, মালতীদেবী ও বর্ষিয়সী প্রতিবেশিনী মহাশয়া এবং ঠান্‌দিদি। দ্বারবান দুইজন লাঠি কক্ষতলে চাপিয়া, করতলে 'খৈনী' মর্দ্দন করিতে করিতে, দূরে থাকিয়া 'মাইজী লোক্‌কা' চরণগতির সহিত তাল রাখিয়া অলস-মন্থর চরণে চলিল।

সদর রাস্তা দিয়া চলিলে পাছে পরিচিত কাহারও চোখে পড়িতে হয় বলিয়া, সকলে গলিপথ ধরিয়া গন্তব্য স্থানোদ্দেশে চলিল। তারপর গলিপথ অতিক্রম করিয়া তাহারা নির্জ্জন মাঠের পথে পড়িল। গ্রীষ্মাতিশয্যে ক্লিষ্ট রমণীগণ এবার মুখের ঢাকা খুলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, অনেকগুলি নীরব রসনা এবার মুক্ত-সঙ্কোচে সরবে ঝঙ্কৃত হইতে আরম্ভ করিল।

বধূদ্বয় অস্ফুট স্বরে কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছিল। প্রতিবেশিনী মহাশয়া পাড়ার অন্য কোন ধনী গৃহিনীর অপ্রীতিকর ব্যবহার উল্লেখে, মহা উদ্যমে সমালোচনা স্রোতে রসনা খুলিয়া দিয়া বৃদ্ধা ঠান্‌দিদির ও মালতীদেবীর কান ও মন অধিকার করিয়া লইলেন। মায়া অন্যমনস্ক

ভাবে জ্যোৎস্না উজ্জ্বল প্রান্তরের সুদূর বিস্তৃত শোভা, এবং অনন্ত উন্মুক্ত আকাশের আনন্দ মোহনরূপ, বিস্ময়-স্তব্ধ নয়নে দেখিতে দেখিতে চলিল। তাহার মনে হইল—অসীম ঔদার্য্যের জীবন্ত মূর্ত্তি যেন আজ এইখানে পরিস্ফুট দেখিতেছে! চারিদিকেই মুক্তির আনন্দ!

মাঠের সঙ্কীর্ণ 'আল' পথে চলিতে চলিতে, বৃদ্ধা ঠান্‌দিদি সামান্য একটা 'হুঁচট্' খাইলেন। অগ্রগামী নন্দলাল সবিদ্রূপে বলিল, "দেখো ঠান্‌দি, এমন সখের শোভাযাত্রা যেন খুন জখম বাধিয়ে মাটী কোরো না!"

সকলে হাসিল। ঠান্‌দিদি নিজের পদস্খলনের ত্রুটি নন্দলালের মাতার স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া বলিলেন, "তোর মা, তোর মামীদের নিয়ে যে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত ছুটেছে—আমি বুড়ো মানুষ হোঁচোট্ খাব না কেন বল?"

নন্দলালের মাতা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "চল্‌তে যখন হবে ঠান্‌দি, তখন ঘোড়দৌড়ের ছুট্‌টাই ভাল।"

নন্দলাল তাড়াতাড়ি পিছাইয়া আসিয়া বলিল, "ভাল ঠান্‌দি, মায়েরা এগিয়ে যাক, আমি তোমার ডাইনে যুড়ি হয়ে, মামাবাবুর ঘোড়ার মত ছুল্‌কী চালে যাচ্ছি চল, আর তোমায় হোঁচট্ খেতে দেব না।"

মামীরা খুব হাসিতে লাগিলেন, মাতাও হাসি চাপিতে পারিলেন না। কৃত্রিম বিরক্তির সহিত পুত্রের স্কন্ধে মৃদু চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "যা যা এগিয়ে যা, ঠান্‌দিদির সঙ্গে বাক্‌চাতুরী কর্‌তে লজ্জা হয় না?"

নন্দলাল অগ্রসর হইল, হাস্য পরিহাসের মাত্রা ক্রমশঃ চড়িয়া উঠিল। স্থান ও কাল মাহাত্ম্যে স্ফূর্ত্তির মুক্ত উচ্ছ্বাসে সকলের মনই যেন কাণায় কাণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল—সঙ্কোচের এত বড় মুক্তির মাঝে, জ্যোৎস্নার এমন মুগ্ধ মহান্ সৌন্দর্য্য, অজ্ঞাতে সকলের হৃদয়, চঞ্চল-আনন্দে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। অল্পবয়স্কগণের কেহই লঘু চাপল্য প্রকাশে নিরস্ত হইতে পারিল না।

নীরব রহিল শুধু মায়া। আশ্চর্য্য স্তম্ভিত স্বরে তাহার কানে ক্রমাগতই বালক নন্দলালের সেই বিদ্রূপ ধ্বনিত হইতে লাগিল, "সখের শোভাযাত্রা যেন খুন জখমে না মাটী হয়।"

মায়ার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ আতঙ্কে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। হায়, জীবনের পথে, এমনই সুন্দর জ্যোৎস্নাভরা শান্তির আলোকে, তরুণ উৎসাহ ভরা হৃদয়ের বড় আনন্দের শোভাযাত্রার মাঝে, সেও না অমনি অতর্কিতে একটা প্রচণ্ড হুঁচট্ খাইয়া, উৎসাহ-প্রোজ্জ্বল শোভাযাত্রাকে—নীরব ভীষণতায়, তীব্র বেদনার রক্তে অনুরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছে। মুক্ত-স্বচ্ছল, যাত্রার প্রাণশক্তি, আড়ষ্ট যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিয়াছে। হাঁ হাঁ, সেত তাহারই জীবনের জলন্ত সত্য ব্যাপার! আজ এই মুক্ত উদারতার বক্ষে দাঁড়াইয়া, দৃষ্টিগ্রাহ্য বিরাট বাস্তবের দিকে তাকাইয়া—সে কি অকপট প্রাণে বলিতে পারে, 'না গো সে কিছুই নয়, শুধু কাল্পনিক স্বপ্ন মাত্র।' না অসম্ভব, অত বড় মিথ্যা উচ্চারণ করা অসম্ভব! ভয়ের তাড়নায় সে যাত্রার পথে প্রাণপণে স্বাচ্ছন্দ্য বেগে ছুটিয়াছে বটে—কিন্তু সে স্বচ্ছন্দতা সহজ নহে, স্বাভাবিক নহে, তাহার প্রাণশক্তি গোপন আঘাতে খঞ্জ হইয়া আছে। আজিও

সে আঘাতের বেদনা, তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধিয়া আছে, মজ্জায় মজ্জায় জাগিয়া আছে—তাহাকে অস্বীকার করিবার যো' কি ?

মায়ার হৃদয়াভ্যন্তরে আকুল বিহ্বলতা হায় হায় করিয়া উঠিল। ওগো, অকপট নির্ভীকতায় সকল দিকে চাহিয়া—সত্যকে খুঁজিয়া বুঝিয়া দেখিতে তাহার সাহস হয় না, শক্তি হয় না—নির্ম্মম বেদনায় তাহার বুক ভাঙ্গিয়া পড়ে। হায় হতভাগ্য অধম, অমন উদার মহিমাময় স্বামী তাহার মাথার উপর—এমন প্রফুল্ল আনন্দময় শিশু তাহার বুকের মাঝে, তবুও—ধিক্! কবে কোথায় পায়ের নীচে একটা কাঁটা ফুটিয়াছিল, তাহার বেদনা সে—এত সুখ সৌভাগ্যের মধ্যেও ভুলিতে পারিতেছে না? ইহাকে কি বলিবে? আত্মপরায়ণতা নহে কি? হাঁ একরূপ তাহা বৈ কি? সকলের মুখ চাহিয়া আপনাকে একেবারে ভুলিয়া যাইবে, ইহাই তাহার একান্ত আকিঞ্চন। কিন্তু অপরাধ-সন্তপ্ত আত্মা, নিজের দৈন্য যে কিছুতে ভুলিতে চাহে না—একি নিদারুণ অভিশাপ! ঐ অগ্র-পশ্চাতের সহযাত্রিদলের সুস্থ সহজ হৃদয়ানন্দ ধারা, চিত্তোচ্ছ্বাস সংঘর্ষ, তাই তাহার চিত্তকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছে, হৃদয়কে স্পর্শ করিতে অক্ষম হইতেছে।

শ্রদ্ধার আধার স্বামীর পায়ের নীচে মাথা লুটাইয়া, হৃদয়ের অমূল্য মাণিক বড় আদরের ধন পুত্রের মুখে স্নেহোন্মাদ চুমা খাইয়া, সে ত প্রত্যেক নিমেষে আপনাকে হারাইয়া ফেলে—প্রত্যেক মুহূর্ত্তে বিভোর আনন্দে স্বর্গলাভ করে। কিন্তু হায়, সে স্বর্গে তাহার অকুণ্ঠিত গৌরবের শান্তি কৈ? অতীতের স্মৃতি যে তাহার বুকের মাঝে ক্রুদ্ধ কালসর্পের মত বিষদন্ত ফুটাইয়া জড় নিশ্চল ভাবে বসিয়াছে। প্রতিকূল ঘটনার

এতটুকু ইঙ্গিত, এতটুকু নিশ্বাস স্পর্শ বাজিলেই যে সে আজিও ক্ষুপ্ত-আক্রোশে গর্জ্জিয়া উঠিতে চায়। হায় দুর্ভাগ্য! নিষ্কৃতির সাধনতীর্থে বাস করিয়াও, অভিশপ্ত সাধক প্রাণপণ আকিঞ্চনেও দুষ্কৃতি পীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতেছে না।

মায়া সজোরে নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার নিঃশাস-শব্দ অগ্রবর্ত্তিনী মালতী দেবীর কানে পৌঁছিল কি না ঠিক বলা যায় না। তিনি সেই সময় মুখ ফিরাইয়া মায়ার পানে তাকাইয়া বলিলেন, "বৌঠান্ এবার আমাদের ছেড়ে কিছুদিনের মত তাহ'লে ভাইদের বাড়ী চল্‌লে?"

বিস্ময়-উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি তুলিয়া মায়া বলিল, "ভাইদের বাড়ী কোথা?"

"বোম্বায়ে মন্মথবাবুর সঙ্গে যাচ্ছ ত?"

"ওঃ—কিন্তু আমার যাওয়ার ঠিক নাই। আপনি এর মধ্যে কার কাছে শুন্‌লেন?"

"বাবা সন্ধ্যাবেলা জল খেতে এসে গল্প কর্‌ছিলেন। মঠের গদি নিয়ে বিরোধ মামলা বেধেছে, বল্‌লেন—শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াবে। বাবার সঙ্গে মন্মথবাবু যাবেন শুনেছ বোধ হয়, তাই বল্‌ছিলেন, "মন্মথ বৌমাকে নিয়ে যাবে, সেখানে বৌমার আত্মীয়েরা কে সব আছে।"

অস্ফুট ক্ষীণভাবে উত্তর দিয়া, মায়া সজোরে দন্তে রসনা চাপিয়া ধরিল। কে জানে অসতর্ক উচ্ছ্বাসে কোন্ মুহূর্ত্তে রসনায় কোন্ ভয়াবহ বাণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে, কে বলিতে পারে? আপনাকে বিশ্বাস করিতে ভরসা হয় না।

সকলে বাগানের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিলেন। দ্বারবানদের

ডাকাডাকিতে বাগানের মালী আসিয়া বেড়ার ফটক খুলিয়া দিল, সকলে বাগানে ঢুকিলেন।

ষাট বিঘা জমি জুড়িয়া প্রকাণ্ড উদ্যানক্ষেত্র। অল্পদিন পূর্ব্বে ইহা একজন কৃষি-ব্যবসায়ীর নিকট কেনা হইয়াছে, এখনও ইহাকে রীতিমত উদ্যানে পরিণত করা হয় নাই। পূর্ব্বাধিকারীর ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচয়-সাক্ষ্যস্বরূপ এখন বাগানের চতুর্দ্দিকে বেড়ার গায়ে অড়হর শুঁটির শুষ্ক লতা নির্লিপ্তভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে। স্থানে স্থানে কয় বিঘা জমিতে এখনও পল্‌তা লতা ও নানা জাতীয় শাকসব্জি বিরাজ করিতেছে, মাঝে মাঝে কলাঝাড় ও আম, জাম, আতা, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ কতকগুলা আছে। পশ্চিমে ছোট একটি ফুলবাগান ও একটা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ চাঁপা ফুলের গাছ, বাকী সমস্ত জমি সদ্য লাঙ্গল কর্ষিত অবস্থায়, বড় বড় ঢেলা ও উচ্চ নীচ গর্ত্তবিশিষ্ট কর্কশ অসমতল হইয়া রহিয়াছে।

ছেলেরা বাগানে ঢুকিয়া ফুল বাগানে 'চড়াও' করিল। ঠানদিদি দ্বারবানদের লইয়া সব্জি-বাগানে গ্রহণযোগ্য সামগ্রীর তত্ত্বাবধানে মনোযোগ দিলেন। বধূদ্বয় বাকী সকলকে লইয়া, কলমের গাছে কাঁচা আমের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিল। মায়া তাহাদের পিছু পিছু খানিকটা গেল, তারপর নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া ফুলবাগানের পাশে 'আলের' মাথায় দাঁড়াইয়া, লুব্ধ-চঞ্চল বালক বালিকা তিনটির পুষ্প সংগ্রহের উল্লাস-উৎসব দেখিতে লাগিল।

ফুলবাগানের সম্পদ বেশী ছিল না, সুতরাং লুণ্ঠনকারীগণ অল্পক্ষণেই নিরস্ত হইতে বাধ্য হইল। কিন্তু উদ্যমশীল নন্দলাল সহজে সন্তুষ্ট হইবার

পাত্র নহে, সে সঙ্গীগণের ভয়, বিস্ময় ও নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মালকোঁচা মারিয়া চাঁপাফুলের গাছে উঠিয়া, নির্ব্বিচারে কতকগুলা অস্ফুট প্রস্ফুট পুষ্প ছিঁড়িয়া নীচে নামিয়া আসিয়া, সঙ্গীদের সহিত ভাগ করিয়া লইতে বসিল।

ভাগ শেষ হইল। নিজের ভাগ হইতে দুইটি ফুটন্ত ফুল তুলিয়া লইয়া নন্দলাল মায়ার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মামিমা, আপনি এই দুটো নিন্।"

ম্লানভাবে হাসিয়া মায়া বলিল, "আমি ফুল নিয়ে কি কর্‌ব বাবা ?"

বালক অনুরোধ-মিশ্রিত জেদের সহিত বলিল, "নিন্ না, আমরা ত সবাই নিয়েছি।"

ইহার উপর তর্ক চলিতে পারে না—তাহারা সকলেই ফুল লইয়াছে, মায়াকেও লইতে হবে। সে গ্রহণের উদ্দেশ্য—খেলা করা, নষ্ট করা, বা যাহাই আমোদ করা হউক। মায়া আর আপত্তি করিল না, নীরবে হাত পাতিয়া ফুল লইল।

ছেলেরা অগ্রসর হইয়া 'পল্‌তা' ক্ষেত্রে ঢুকিল। মায়া উদ্দেশ্য-হীন গমনে তাহাদের পিছু পিছু গিয়া, 'পল্‌তাক্ষেত্রের' আশে পাশে লাঙ্গলকর্ষিত উগ্র-বন্ধুর ভূমির উপর অন্যমনস্কভাবে বিচরণ করিতে লাগিল।

সহসা একখানা বড় মেঘ আসিয়া চন্দ্রদেবকে ঢাকিয়া ফেলিল, জ্যোৎস্না ডুবিল—ভূমিলগ্ন লতান্তরালবর্ত্তী ফল খুঁজিয়া পাওয়া, এই জ্যোৎস্নাহীন ম্লান আলোকে অসম্ভব দেখিয়া, নন্দলাল ছুটিয়া গিয়া মালীর ঘর হইতে রেড়ির তৈলের ক্ষুদ্র কাঁচাবরণযুক্ত একটি ক্ষীণ

আলোক লইয়া আসিল। তারপর মহা উৎসাহে সকলে 'পটল' অন্বেষণে ব্যস্ত হইল।

চলিতে চলিতে মায়া একদিকে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িল। পিছনের সঙ্গীরা যে কতদূরে রহিয়াছে, তাহা চাহিয়া দেখিল না, তন্ময় অন্যমনস্কতার মাঝে হঠাৎ কিসের চমক খাইয়া, সে সচেতন হইল। স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, সম্মুখে কোন স্থান হইতে—মৃদু-মনোহর অতি সুমিষ্ট স্বরে, কুলু-কুলু ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে!

পরক্ষণে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখে, ঠিক পায়ের নীচে—প্রশস্ত সমতল পথ! মায়া স্তম্ভিত হইয়া গেল! এ কোন্ স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে! চারিদিকে চাহিল, ম্লান-জ্যোৎস্নালোকে দেখিল অতি নিকটেই উদ্যানপ্রান্তের বেড়া। বুঝিল, আপন মনে চলিতে চলিতে সে উদ্যানের অন্যতম প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে! এ পথ বাহিরে যাইবার পথ!

দূরস্থ—অজ্ঞাত স্রোত-প্রবাহের কলধ্বনিতে আবার মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। মায়ার মনে হইল, সে যেন কোন অচেনা আনন্দের ব্যগ্র বিনয়-ভরা অধীর-আহ্বান! তাহার বিস্ময়-বেগ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিল। ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল, দেখিল সম্মুখের নির্গম পথটি বেড়ার অবকাশমুক্ত হইয়া, বাহিরে—কোন অলক্ষ্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে।

কৌতূহলী মায়ার ইচ্ছা হইল, এই পথ ধরিয়া ঐ আগ্রহান্বিত আহ্বানের উদ্দেশে সে মুক্ত-আনন্দে ছুটিয়া যায়। কিন্তু ক্ষণপরে মনে

পড়িল, সে একাকিনী, স্ত্রীলোক—তাহাতে রাত্রিকাল, তাহার উপর দারুণ নির্জ্জনতা!

ভয়ের নামই বুঝি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয়ানক! মুহূর্ত্তে তীক্ষ্ণ ভীতি-শিহরণে মায়ার আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। পিছনে সঙ্গীদের দিকে চাহিতে গিয়া, অসাবধানে টলিয়া একটা গর্ত্তের মধ্যে পা পড়িল, মায়া ঢিল-ভাঙ্গা জমির উপর বসিয়া পড়িল। শঙ্কা-ব্যাকুল নয়নে ইতস্ততঃ চাহিল, দূরে—অনেক দূরে পল্‌তা ক্ষেত্রে বিচরণশীল বালকদের হাতের ক্ষীণ আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হইল। দ্রুত-কম্পিত হৃদ্‌পিণ্ড আশ্বাসের স্পর্শে কিছু স্বস্তি পাইল। সামলাইয়া মায়া ফিরিবার জন্য উঠিল, নিজের অকারণ উদ্বেগভীতির কথা স্মরণ করিয়া নিজেই হাসিল। না, গাছপালার অঙ্কে অদৃশ্যভাবে বিরাজমান অশরীরি উপদেবতাগণের অস্তিত্বে যত বড় বিশ্বস্ত প্রমাণ থাক, তাঁহাদিগকে বিশ্বাসের সহিত মানিতে হইবে বলিয়া যে ভয় করিয়াও চলিতে হইবে, এমন ত কোন কথা নাই! কিন্তু মাটীর বুকে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ভাবে সশরীরে যে দেবতাগণ বাস করেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও সংস্রব সতর্ক-সম্মানে, সভয়ে দূরে পরিহার করিয়া চলা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে! মায়া উঠিয়া অগ্রসর হইল।

চিন্তামগ্না মায়া ঢিল-ভাঙ্গা জমির উপর দিয়া প্রথমবারে যখন আসিয়াছিল, তখন ভ্রমণের কষ্ট বুঝিতে পারে নাই। ফিরিবার পথে, মানসিক উদ্বেগ-চাঞ্চল্যের জন্যই হউক, অথবা ব্যস্ত দ্রুত গমনের জন্যই হউক—পথের অসমতল কর্কশতা তীব্ররূপে হৃদয়ঙ্গম করিল। তখনও চন্দ্র মেঘাচ্ছন্ন; অস্পষ্ট-অন্ধকারে চলিতে চলিতে, সহসা একটা

নিম্নাভিমুখী বৃক্ষশাখার দৃঢ় অংশে সজোরে মস্তক আহত হইল, চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া মায়া নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল। ক্ষণপরে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সম্মুখের ক্ষীণ আলোক আর দেখিতে পাইল না। ভীত হইয়া চারিদিক চাহিল—না কোথাও আলোক নাই, কোথাও কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে না। বিস্তৃত বাগানের মধ্যে কে কোথায় কত দূরে কোন গাছপালার আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে, অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। মায়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল—বড় ভয় করিতে লাগিল।

অবসন্ন-স্খলিত চরণে অগ্রসর হইল, এক দুই তিন পদ—হাঁ—আঃ বাঁচা গেল, ঐ যে আলোকরশ্মি! সম্মুখে একঝাড় কলা গাছ আড়ালে পড়ায় এতক্ষণ উহা দেখা যাইতেছিল না, যাক্ খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়া গিয়াছে।

মায়া ডাকিয়া বলিল, "বাবা নন্দলাল।" হেঁট হইয়া ফল সংগ্রহে ব্যস্ত নন্দলাল মুখ তুলিয়া উত্তর দিল, "কেন মামি-মা।"

নিকটস্থ হইয়া ব্যগ্র মিনতির স্বরে মায়া বলিল, "এবার বাড়ী চল বাবা, আমার খোকা হয় ত উঠে কাঁদ্‌বে।"

"চলুন না, আমাদের ত সব হয়ে গেছে—" বলিয়া নন্দলাল পুনশ্চ হেঁট হইয়া আলোক ধরিয়া লতাপাতা উল্টাইয়া শেষ বারের মত ফলান্বেষণে মনোযোগী হইল। মায়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, সময়োপযোগী কোন-কিছু একটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবার চেষ্টায় বলিল, "কতগুলো পটল পেলে বাবা?"

নন্দলাল বলিল, "বেশী নয় মামি-মা,..পটলই নেই, তা পাব কোথা

শেষা-আবাদে চারা 'আজান' হয়েছিল, ফসল ত এবার ভাল হবে না, দেখুন না, এতক্ষণে উট্‌কে মোটে 'গোটা আষ্টেক' পেয়েছি।" ধর ত মামা আলোটা, এই ঝাড়টা একবার দেখে নি।"

মাতুলের হাতে আলোক দিয়া নন্দলাল আবার অনুসন্ধানতৎপর হইল। মাতুল আলো দেখাইতে দেখাইতে সাগ্রহে বলিল, "ঐ একটা—ঐ একটা।"

নন্দলাল পাতা উল্টাইয়া নির্দ্দিষ্ট বস্তুটা দেখিল, অবজ্ঞার স্বরে বলিল, "ওঃ, নেহাৎ ছোট!"

মায়া অন্য একটা স্থান দেখাইয়া বলিল, "এখানে কি একটা রয়েছে দেখ দেখি।"

আলোক লইয়া বালকদ্বয় সেই স্থানে ঝুঁকিয়া পড়িল। নন্দলাল হাসিয়া বলিল, "ওটা ফুল মামি-মা।"

মায়া উৎসুক হইয়া বলিল, "ফুল, পটলের ফুল! দেখি দেখি কেমন দেখতে?"

সবিস্ময়ে নন্দলাল বলিল, "আপনি পটলের ফুল কখনো দেখেন.নি নাকি? দেখুন না—ঐ যে।"

পুষ্পের উপর যথাসম্ভব আলোক-রশ্মি পতিত হইল। হঠাৎ মায়া দ্বিধাহীন আগ্রহে বলিয়া উঠিল, "ফুলটা ছিঁড়ে দাও না বাবা, ভাল করে দেখি, একটা নষ্ট হলে কি এসে যাবে?"

সজোরে ঘাড় নাড়িয়া নন্দলাল বলিল, "কিচ্ছু না।"

বালক একটানে ক্ষীণবৃন্ত পুষ্পটিকে জীবনাশ্রয়-স্থানচ্যুত করিয়া মায়ার হাতে তুলিয়া দিল। মায়া দেখিল, হরিদ্রাবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুণ্ড

শোভিত কতকগুলি শীর্ণ-দীর্ঘ শৃঙ্গের চতুষ্পার্শ্বে, গুটি কয়েক ক্ষীণ ক্ষুদ্র—অনাড়ম্বর শুভ্র পাপ্ড়ী! তাহাই বৃন্ত-সংলগ্ন হইয়া, পল্‌তা গাছের 'ফুল' আখ্যা লাভ করিয়াছে।

মায়া কিছু বলিল না, পূর্ব্বলব্ধ ফুল দুইটির সহিত মিশাইয়া যত্ন-সংগৃহীত পুষ্পটিকে ভাল করিয়া মুঠায় পুরিল।

সকলে ফিরিল, কিছু দূরে তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর মেয়েরা সকলে বসিয়াছিলেন। মায়াকে দেখিয়া বধূদ্বয়ের একজন বলিল, "আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আমরা কত মজা কর্‌ছি, কাঁচা আমটাম খেলুম—তারপর খুকিকে ধরে এতক্ষণ গান গাওয়াচ্ছি। আপনি শুন্‌লেন না!" খুকি—অর্থাৎ প্রতিবেশিনী কন্যা।

মৃদু হাস্যে মায়া বলিল, "তাই ত ঠ'কে গেছি তা হ'লে!"

নন্দলাল বলিল, "মা ওঠো—এবার বাড়ী ফিরে চল।"

মাতা বলিলেন, "সে কি শ্মশানের মহাদেব দর্শন করিয়ে নিয়ে যাবি বলেছিস্, এর মধ্যে বাড়ী ফেরা কি?"

মায়ার দিকে চাহিয়া নন্দলাল বলিল, "মামিমা খোকা কাঁদ্‌বে ব'লে ব্যস্ত হচ্ছেন যে।"

কুণ্ঠিত-প্রতিবাদের স্বরে মায়া বলিল, "না না, তা ব'লে ঠাকুর-প্রণাম না করে কি বাড়ী ফেরা হয়? চলুন না আপনারা, কত আর দেরী হবে? মন্দির কত দূরে?"

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নন্দলাল বলিল, "এই বাগানের পাশে যমুনার ওপর শ্মশানের ধারে মন্দির—বেশী দূর নয়।"

"যমুনা!" বিস্ময়-চকিত নয়নে মায়া নন্দলালের মুখ পানে

তাকাইল। বুঝিল ঐ দিকে গিয়া অনতিকাল পূর্ব্বে সে যে স্রোতধ্বনি শুনিয়াছিল, তাহা যমুনার-ই! কোন কথা কহিতে পারিল না—দূরে চাহিয়া কি যেন দেখিতে লাগিল।

নন্দলালের মাতা আসিয়া মায়ার পিঠ চাপড়াইয়া সহাস্যে বলিলেন, "ছেলের মায়েদের ছেলে ছেড়ে কোথাও গিয়ে একদণ্ড স্বস্তি নাই, না ভাই ?"

মায়া ক্ষীণভাবে হাসিল ; নন্দলাল সকলকে লইয়া দেবদর্শন করাইতে অগ্রসর হইল। মায়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, এ সেই পথ, যে পথে—সে ইচ্ছা সত্ত্বেও অগ্রসর হইতে গিয়া আপনার অবস্থা ভাবিয়া ভীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

সকলে উদ্যান পার হইলেন। মেঘমুক্ত চন্দ্রদেব উজ্জ্বল শোভায় হাসিয়া উঠিলেন, পরিষ্কার জ্যোৎস্নালোকে অদূরবর্ত্তী শ্মশানভূমির দৃশ্য পরিস্ফুট রূপে দেখা গেল। মহিলাগণ সকলের অন্তর মধ্যে কিছু ভাব বৈলক্ষণ্যে অস্ফুট চাঞ্চল্য অনুভব করিলেন। ঠানদিদি সন্ত্রস্তভাবে বলিলেন, "দেখিস্ বাছা, সবাই সাবধানে চ'।"

এরূপ স্থলে অসাবধানতা প্রকাশের দুঃসাহস কাহারও ছিল না, সকলেই সতর্কভাবে চলিল। সম্মুখেই সদ্যঃ সংস্কৃত শুভ্র সুন্দর দেবালয়, দেবালয়ের পার্শ্বদেশ ধৌত করিয়া নিদাঘ-শোষণে শীর্ণ কলেবরা যমুনা প্রবাহিত হইতেছে। চারিদিকে কোথাও মনুষ্য-বসতির চিহ্ন নাই, চারিদিকে মৌন-নিস্তব্ধতা উগ্র-গাম্ভীর্য্যে বিরাজ করিতেছে।

মায়া সকলের পিছনে থাকিয়া, নির্ব্বাক বিস্ফারিত নয়নে, জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত নীরব নির্জ্জন শ্মশানক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া চলিল, সঙ্গিনীগণের

অস্ফুট ভীতি গুঞ্জন তাহার কানে ভাল লাগিল না। আশ্চর্য্য ব্যাপার, এমন চরম নির্ভয়ের অঙ্কে দৃষ্টি ফিরাইয়া তাকাইতেও মানুষের প্রাণ আতঙ্কে শিহরিতে চায়! মানব জীবনের সকল দ্বন্দ্ব সমস্যার নির্ভুল মীমাংসার সমাপ্তি-স্থান ত ইহাই! ভ্রান্ত. মানব, তবু ইহাকে ভয়ানক বলিয়া মনে করিতে চায়!

না না—মায়াও অবশ্য নির্ব্বিকার নহে, ইহাকে দেখিয়া তাহার মনেও নানা ভাবের উদয় হইয়াছে, কিন্তু তাহা ভয় নহে! ইহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহার হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে না বটে, কিন্তু কাঁদিতেও ইচ্ছা হইতেছে না। তাহার ইচ্ছা হইতেছে—এই নিস্তব্ধ-গম্ভীর মুক্ত সুন্দর জ্যোৎস্না নিশীথে, অকুণ্ঠিত প্রাণে—নিজের জীবনের দিক হইতে ইহার পানে তাকাইয়া—সশ্রদ্ধ চিত্তে নতশিরে, এই মহা সমাপ্তির সম্মিলনক্ষেত্রকে অভিবাদন করিতে!

শিবালয়ের মন্দির সম্মুখে সুদৃঢ় স্তম্ভের উপর সুদৃশ্য খিলানযুক্ত ছাদে ঢাকা, সুদীর্ঘ অলিন্দ; মসৃণ মর্ম্মর প্রস্তরে রচিত অলিন্দে পা দিয়া, এতক্ষণের পর অসমতল কর্কশ বন্ধুর পথে অনভ্যস্ত ভ্রমণশীল চরণ কয়খানি পরম স্বস্তি অনুভব করিল, এক সঙ্গে অনেকগুলি কণ্ঠে 'আঃ' শব্দ নির্গত হইল।

মায়ার মনে হইল, এতক্ষণের পর সে সহযাত্রিগণের সহিত একত্র হইল। এতক্ষণ ইহাদের সঙ্গ সংশ্রবের খুব নিকটস্থ হইয়াও নিজের নিভৃত মনের মাঝে সে নিঃসঙ্গভাবে ঘুরিতেছিল, কিন্তু এইবার—ইহাদের তৃপ্তির আনন্দ ব্যঞ্জনার সহিত তাহার হৃদয়ের ভাষাও এইখানে আসিয়া সমস্বরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে!—"আঃ।"

মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ ; শ্মশান-শিবের পূজারীমহাশয় সন্ধ্যার পরই 'শীতল' দিয়া, দেবতার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া যান, সুতরাং দর্শনাশায় ভগ্ন-মনোরথ প্রণামার্থীগণ রুদ্ধ দ্বারের বাহির হইতেই, দেবোদ্দেশে যথা কর্ত্তব্য শেষ করিল। মায়াও প্রণাম করিল, প্রণামান্তে মস্তকোত্তলন-উদ্যতা মায়ার—সহসা মনে পড়িল, তাহার হাতের মুঠায় ফুল আছে। ব্যস্ত হইয়া মায়া মুঠা খুলিল, স্বল্পান্ধকারে স্পষ্ট অনুভব করিল, তিনটি ফুলই বটে! কিন্তু হায়, এ কি? অনায়াসলভ্য চম্পক পুষ্প দুইটির সতেজ সৌরভ, তাহাদের জীবনী-শক্তির দৃপ্ত প্রাখর্য্য সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করিতেছে বটে, কিন্তু—আ মরি মরি, তাহার ব্যগ্র-আয়াসে বড় সাধের সংগৃহীত অন্যতম পুষ্পটির ক্ষীণ প্রাণ, কখন তাহার অন্যমনস্ক কর-নিষ্পেষণে বিদলিত হইয়া গিয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারে নাই। পুষ্পটি সম্পূর্ণরূপে নির্জ্জীব হইয়া গিয়াছে।

মায়া নিঃশ্বাস ফেলিল। যাক্ ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক! অনায়াসলব্ধ ও যত্নায়াস-সংগৃহীত যত কিছু ভাল মন্দ—সব তোমার দ্বারে সমর্পণ করিয়া, রিক্ত হস্তে তাহাকে বিদায় লইতে দাও! চরম অমঙ্গলের শিয়রে পরম মঙ্গলের শান্ত সুন্দর মূর্ত্তি ধরিয়া কঠিন নিশ্চলভাবে বিরাজমান—ওগো রুদ্ধ গৃহের অদৃশ্য দেবতা, দ্বন্দ্ব পীড়িত দুর্ভাগা মানব হৃদয়ের যত কিছু ভুল-ভ্রান্তি, যত কিছু সুখ-সান্ত্বনা, দুঃখ-বেদনা—সব আজ তোমার উদ্দেশে 'তস্মৈ নমঃ' বলিয়া উৎসর্গ করিয়া দিতেছে, হে দেব, এই দান সার্থক হইবার আশীর্ব্বাদ কর—শ্রান্তি-হত মানবাত্মার নিষ্কৃতি বিধান কর!

সাশ্রুনয়নে অন্ধকার চৌকাঠের পাশে নিঃশব্দে পুষ্পগুলি রাখিয়া

মায়া আবার প্রণাম করিল। ভারমুক্ত হৃদয়ের মাঝে, অনেক দিনের পর ধীর-আবর্ত্তনে নির্ম্মল স্বাচ্ছন্দ্য প্রবাহের জীবন-হিল্লোল অনুভব করিল।

সঙ্গীগণের সহিত অলিন্দ হইতে অবতরণ করিয়া, মায়া সকলের সহিত পথের ধূলায় মাথা লুটাইয়া দেবালয়ের উদ্দেশে পুনশ্চ প্রণাম করিল। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেই ললাট সংলগ্ন ধূলিকণাগুলি ঝর্ ঝর্ করিয়া, মুখ বুক বহিয়া, নীচে পড়িল! অলক্ষিতে মায়ার অধর প্রান্তে স্নিগ্ধ-কোমল হাস্যরেখা নীরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। হায় দেবতা, এমনি করিয়া একদিন মুক্ত কৃতার্থ প্রণতির পর—অভিশপ্ত ললাটের সমস্ত দুঃখ-কলঙ্ক রেখা নিঃশেষে ঝরিয়া পড়িয়া, মানবীয় অদৃষ্ট-টা সত্যই কখনও প্রসন্ন নির্ম্মল হইবে কি?

মায়ার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল!

নবম পরিচ্ছেদ

মায়াকে বাটীতে পৌছাইয়া দিয়া, শ্রীশবাবুর বাটীর সকলে নিজালয়ে প্রস্থান করিলেন। মায়া রান্নাঘরে আসিয়া ঢুকিতেই ঝি বলিল, "মা, তোমার বাপের বাড়ী থেকে কে কুটুম এসেছে,—বাবু সঙ্গে ক'রে নিয়ে উপরে গেলেন, দেখ গে।"

মায়া আশ্চর্য্য হইল, পিত্রালয় হইতে আসিবার মত কুটুম্ব ত কাহাকেও মনে পড়িল না, ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করিল, "কতক্ষণ ?"

ঝি বলিল, "এই আস্‌ছেন।"

বাক্যব্যয়ে কালক্ষেপ অনাবশ্যক বুঝিয়া মায়া দ্রুতপদে উপরে চলিল। কুটুম্ব যিনিই হউন—মন্মথনাথ যখন অন্তঃপুরে বিশ্রাম-কক্ষে তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই নিঃসম্পর্কীয় বাহিরের লোক হইতে পারেন না। মায়ার মনে হইল হয় ত কেবল দাদা-ই মামলা-সম্পর্কীয় কার্য্যানুরোধে আসিয়াছেন।

শয়ন কক্ষ হইতে সদ্যঃ জাগরিত পুত্রের অস্পষ্ট ক্রন্দনধ্বনি কানে আসিয়া পৌছিল। মায়া গৃহে ঢুকিতে উদ্যতা হইয়া বিস্মিত-সঙ্কোচে পিছু হটিয়া দাঁড়াইল, দেখিল দোল্‌নার কাছে টুলের উপর বসিয়া, জনৈক সুন্দর-কান্তি তরুণ যুবক, স্নিগ্ধ-কৌতূহল বিস্ফারিত নয়নে শিশুর পানে চাহিয়া দোলনায় দোল্ দিতেছে। তাহার পরিধানের কাল রংয়ের কোট-প্যাণ্ট ও মাথার মারাঠি পাগড়ীতে—সেই তরুণ-শ্রী সুন্দর আকৃতিকে গম্ভীর-কোমল গরিমাময় দেখাইতেছে। মায়া দেখিল সে মূর্ত্তি তাহার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত !

মায়ার পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া যুবক দ্বারের দিকে চাহিল। পরক্ষণে টুল ছাড়িয়া উঠিয়া শিষ্ট-সৌজন্যের সহিত প্রণাম করিয়া অসঙ্কোচ হাস্য সুন্দর বদনে বলিল, "দাঁড়ান মা, আমি আপনাকে প্রণাম করতে এসেছি, আমায় আপনি চেনেন না, কিন্তু মঙ্গল-মঠে শান্তি মাসিমার নিকট হ'তে আমি আপনার পরিচয় পেয়েছি, আমার নাম মদনানন্দ ভট্ট।"

যুবক বাঙ্গালায় কথা কহিল বটে, কিন্তু তাহার কথার স্পষ্ট মারাঠি-টান মায়ার কর্ণ অতিক্রম করিল না। মায়া বুঝিল উদার স্নেহময়ী শান্তিদেবীর যেমন অসংখ্য স্বদেশী-বিদেশী পুত্র-কন্যা মাতা-পিতা আছে, ইনিও তাহাদের একজন। কিন্তু যুবকের সরল পরিচয়ের উত্তরে সে যে কি বলিয়া স্নেহ-অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। কুণ্ঠিতভাবে মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দ্বারের-পাশ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ চাহিল—মন্মথনাথ কৈ?

দোল্‌নার কার্য্য বন্ধ হওয়ায়, শিশু ততক্ষণে হাত পা ছুঁড়িয়া রীতিমত ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, মদন তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া, সহাস্য মুখে মাথা নাড়িয়া, আঙ্গুলে তুড়ি দিয়া 'ছোট ভাই-টি আমার'— 'ছোট ভাই-টি আমার' বলিয়া আদর করিয়া তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বিস্ময় নির্ব্বাক মায়া, তাহার অকুণ্ঠিত আনন্দময়-আত্মীয়তা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেল—এ ব্যক্তিকে অপরিচিত বলিবে কে?

পাশের ঘর হইতে মন্মথনাথ কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দ্বারের পাশে কুণ্ঠিত বিপন্নভাবে দণ্ডায়মানা মায়াকে দেখিয়া প্রসন্ন-স্মিত বদনে

বলিলেন, "একটি ভদ্রলোক এসেছেন, দেখেছ? সন্ধ্যার ট্রেনে এসে উনি শ্রীশবাবুর বাসায় উঠেছিলেন, পরিচয় পেয়ে আমি ধরে নিয়ে এলুম। উনি সুন্দর-মঠের মহারাজের কাছে এসেছেন, শান্তিদিদিকে উনি মাসিমা বলেন।"

খোকাকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া মদন বলিল, "অবিচার করবেন না, আপনি না বল্লেও আমি ছোট মাসিমাকে প্রণাম করতে আসতাম। সেখান থেকে আমি ঠিকানা নিয়ে এসেছি—মাসিমা ক্ষমা করবেন, সামাজিক শিষ্টাচারের বাঁধাবাঁধি আমার প্রকৃতিতে সব সময় পোষায় না। আপনাদের মত ভাল-লোক দেখলে আমার ভারী আনন্দ হয়! আমার অদ্ভুত ব্যবহারে আপনি খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছেন, না? কিন্তু আমার প্রকৃতি-টা এমন-ই বর্ব্বরতা পূর্ণ! চিরদিন-ই।"

উচ্ছ্বসিত সরলতায় মদন আপনা আপনি অপ্রস্তুত লজ্জায় সকৌতুকে হাসিয়া উঠিল। মায়া দেখিল, নিতান্ত-ই বালক! সঙ্কোচ ইহার কাছে আপনি সঙ্কুচিত হয়! কিন্তু তবু মায়ার অনভ্যস্ত প্রকৃতি অপরিচিতের সম্মুখে সলজ্জ-কুণ্ঠায় অবনত হইয়া রহিল। মায়া মন্মথনাথকে লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "রাত্রি অনেকটা হয়ে গেছে, আমি খাবারের বন্দোবস্ত করে আসি।"

মায়া প্রস্থানোদ্যতা হইল, মদন বলিল, "আপনার খোকার খিদে পেয়েছে বোধ হয়।"

খোকার ক্ষুধার কথা—সদ্যঃ পরিচয়ের দায় সামলাইবার তাড়ায়, মায়া ভুলিয়া গিয়াছিল, মদনের কথায় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কুণ্ঠা-চকিত নয়নে মন্মথনাথের পানে চাহিয়া বলিল, "ওকে এনে দাও।"

শিশুকে মদনের নিকট হইতে লইয়া মন্মথনাথ মায়াকে দিলেন, মায়া চলিয়া গেল।

বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া মদন জল-যোগান্তে মন্মথনাথের সহিত নানাকথায় প্রবৃত্ত হইল। মায়া রান্নাঘরের কাজকর্ম্ম লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত রহিল, সে আর এদিকে আসিল না।

আহারের সময় মন্মথনাথ আহারস্থানে মায়াকে অনুপস্থিত দেখিয়া তাহার সন্ধানে রন্ধনাগারে গেলেন, দেখিলেন মায়া দুধ জ্বাল দিতেছে। মন্মথনাথ বলিলেন, "ওগো তুমি এস, মদন খেতে বসেছে।"

মায়া ফুটন্ত দুগ্ধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংক্ষেপে বলিল, "তুমি ত রয়েছ।"

মন্মথনাথ বলিলেন, "কি মুস্কিল, খাওয়ার সময় তুমি না থাক্‌লে কি ভাল হয়? সে হবে না, চল।"

অসহিষ্ণু-চঞ্চলভাবে মায়া সহসা বলিল, "আমার লজ্জা করে— আচ্ছা তুমি চল, আমি গিয়ে পরিবেশন কর্‌ছি।"

মন্মথনাথ বিস্মিত হইলেন, বলিলেন "না না—তুমি বসে খাওয়াবে চল, ঠাকুর পরিবেশন করুক। ছিঃ নিঃসম্পর্কীয়ের মত ব্যবহার কর্‌লে ছেলে মানুষ দুঃখিত হবে—ওকে আর লজ্জা কি? না মায়া, ও সব পাগলামি রাখ, তুমি ওকে এখনো বুঝ্‌তে পার নি, ও অত্যন্ত সরল-স্বভাব ছেলে মানুষ। রক্তের সম্পর্ক নেই বলে হৃতগ্রাহ্য কর্‌লে—ওকে অন্যায় আঘাত দেওয়া হবে।"

দুধের কড়া উনানের উপর হইতে নামাইয়া রাখিয়া মায়া বলিল, "তবে চল।"

উভয়ে আহার স্থানে উপস্থিত হইলেন। মদন ও মন্মথনাথ আহার করিতে লাগিলেন—মায়া সম্মুখে বসিয়া এবার সংযতভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। শান্তিদেবীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে মদন বলিল, "মাসিমার ভারী ইচ্ছে ছিল আমার সঙ্গে এখানে আসেন, কিন্তু ক'মাস থেকে তাঁর শরীরের অবস্থা ভাল নহে, সেই জন্যে সাহস করলেন না।"

পিতার মৃত্যুর পর হইতে হঠাৎ আচার-অনুষ্ঠানের অত্যন্ত কড়াকড়ি করিয়া, শান্তিদেবী তাঁহার শক্তি সুগঠিত স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহটির প্রতি একরূপ অ-যথা অত্যাচার করিয়া, তাহার স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত করিয়া কিছুদিন হইতে অসুস্থতা-বোধ করিতেছেন, তাহা মায়া পূর্ব্বে কেবলরামের পত্রে সংবাদ পাইয়াছিল। আজ মদনের মুখেও তাহার কিছুকিছু আভাস পাইল, দুঃখিতভাবে বলিল, "দিদি অবশ্য আমাদের চেয়ে ঢের বেশী বোঝেন, কিন্তু তাঁর এ সমস্ত কাজকে আমরা মন্দ বলে নিন্দা করতে না পারলেও—"

মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "ভাল বলে সুখ্যাতি করতেও পারিনে, কি বল ভট্ট-জী?"

সজোরে মাথা নাড়িয়া মদন বলিল, "নিশ্চয়! এই নিয়ে আমি এবার তাঁর সঙ্গে খুব ঝগড়া করে এসেছি।"

স্নিগ্ধ-কৌতুহলপূর্ণ নয়নে চাহিয়া মায়া বলিল, "ঝগড়া! কি রকম?"

মদন বলিল, "ক্রমশঃ অভ্যাসে শরীরের পক্ষে সকল ক্লেশই সহনীয় হয়, কিন্তু হঠাৎ চাবুক মেরে কার্য্যোদ্ধার অসম্ভব! মাসিমা সারা রাত হিমে বসে—রাত জেগে মালা করতেন, দিবসান্তে একাসনে হবিষ্য

গ্রহণ কর্‌তেন—আরও এম্‌নি কত শক্ত শক্ত নিয়ম পালন কর্‌তেন, এত কি সহ্য হয়? সীমা সকলের-ই আছে! আপনি ত এবার সেখানে যাবেন মাসিমা, সবই দেখ্‌তে পাবেন, এখন তবু কড়াক্কড়ি অনেক কমিয়েছেন।”

মায়ার কৌতূহলী দৃষ্টির উপর চকিতে একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্য্যের ছায়া নামিয়া আসিল। হেঁট হইয়া মায়া সম্মুখের বাতিটা উজ্জ্বল করিয়া দিতে মনোযোগী হইল, কোন কথা কহিল না।

মন্মথনাথ ও মদন অন্যান্য কথা আরম্ভ করিলেন। মঙ্গল-মঠের গদির স্বত্ব-সাব্যস্ত বিষয়ক তর্ক উত্থাপন করিয়া মদন বলিল, “দেখুন, সুন্দর-মঠের মোহন্তমহারাজকে আমি খুব ভাল রকম চিনি, তিনি কোন মানুষকে, তার জাতি, ধর্ম্ম, বয়স্‌, এ-সবের দিক থেকে বিচার করেন না, তিনি গুণগ্রাহী লোক, মানুষের মনুষ্যত্ব-টা সকলের উপর দেখেন। আমি বেশ জানি দেওয়ান দেবলচাঁদ যদি মানুষের মত মানুষ হ’ত, তা হলে তাকে গদি দিতে মহারাজের কোনই আপত্তি ছিল না, কিন্তু দেওয়ান শিক্ষিত হলে হবে কি? সে যে চরিত্রহীন, অপদার্থ! সে সব লোক এমন অসীম প্রতাপে গুরুতর দায়িত্বভার পরিচালনের ক্ষমতা পেলে, অপ্রতিহত স্বেচ্ছাচারে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম, সমাজ সব রসাতলে পাঠাবে! তাই ত মোহন্ত মহারাজ এমন ভাবে তার দুষ্প্রবৃত্তি দমনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। না হলে তিনি কি এ সব ছেঁড়া-ল্যাঠায় নিজে মাথা গলাতেন, না আমাদের শুদ্ধ জড়িয়ে এত হয়রান্‌ কর্‌তেন!”

কথা বলিতে বলিতে মদন ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল,

"দেখুন মন্মথবাবু, আপনার কাছে যথার্থ বল্‌ছি, আইন-বিদ্যা ভাল লাগে না বলে এর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে গেছলুম, কিন্তু মহারাজের আজ্ঞায় আবার বাধ্য হয়ে কলেজে ঢুকে আইন পড়ে পাশ করে এলুম। কিন্তু বাস্তবিক বল্‌ছি তবু এ ব্যবসায়ের ওপর আমার শ্রদ্ধা ছিল না, কিন্তু এই মামলার দায়ে ঠেকে, এইবার আইনের মাহাত্ম্য বুঝ্‌ছি, চমৎকার জিনিস!"

মন্মথনাথ হাসিয়া বলিলেন, "প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সকল বস্তুর শক্তি-মাহাত্ম্য পরীক্ষিত হয়। সাধনার প্রণালী ভেদে সকল ধর্ম্ম, সকল কর্ম্ম, মন্দ ভাল হয়ে থাকে। ব্যক্তি বিশেষের স্বার্থপরতার নিকট যদিও এ ব্যবসায়ের মর্য্যাদা হানি হয় বটে, তবু সমষ্টিভাবে দেখ্‌লে ব্যবহার-ক্ষেত্রে এ বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার কর্‌বার যো নাই।"

স্মিত-কোমল দৃষ্টি তুলিয়া মায়া বলিল, 'আপনি পাশ করেছেন, ওকালতী কর্‌বেন না?"

অসন্তোষের সহিত মদন বলিল, "আমায় আপনি? না মাসিমা, ওটা গাল দেওয়া হয়। মেসোমশায়, উনি পর মনে কর্‌তে পারেন, কিন্তু আপনি শুদ্ধ—নাঃ! ভারি অন্যায় কর্‌ছেন।"

মায়া মাথা হেঁট করিয়া সলজ্জভাবে হাসিল। সুন্দর শিশু বটে! ইহার প্রকৃতিকে আদর করিয়া ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, চমৎকার সরল-হৃদয় বালক!

মদন বলিল, "ওকালতীর দিকে গেলে আমার মত ঝগ্‌ড়াটে লোক খুব সুবিধে কর্‌তে পার্‌বে, সকলে এ কথা বল্‌ছেন বটে—কিন্তু আমার ওতে ইচ্ছে নাই।"

মন্মথনাথ বলিলেন, "কোন লাইনে যেতে চাও শুন্‌তে পারি কি ?"

মদন এক নিশ্বাসে জলের গ্লাশটা উজাড় করিয়া বলিল, "আপত্তি নাই। দেখুন আপনারা আমায় নির্ব্বোধ মনে কর্‌তে পারেন কিন্তু আমি মিথ্যাবাদী নই, কারুর কাছে নিজের সত্য-ধারণা, বিশ্বাস, মতামত বা ইচ্ছা গোপন করে রাখ্‌তে পারি না। অবশ্য এ জন্যে অনেক সময় লোকের কাছে আমায় খুবই অপদস্থ লজ্জিত হতে হয় বটে, কিন্তু তাই বলে কুণ্ঠিত হয়ে কথা-কওয়া আমার কুষ্ঠিতে লেখে নাই। কোন্ লাইনে যেতে চাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন? আমি সরলভাবে বল্‌ছি শুনুন, যেখানে কাজ আছে, অথচ কাজের লোক নাই, আমি সেইখানে ভিড়্‌তে চাই। আমাদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের পথে এখন বিস্তর বিঘ্ন উন্নতির প্রতিকূল হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমি সেইদিকে কল্যাণের জন্য আমার অর্থ, বিদ্যা, সময়, চেষ্টা সব উৎসর্গ করে দিতে চাই। অজ্ঞান কু-সংস্কারাচ্ছন্ন নরনারীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আমি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যজ্ঞান, শিক্ষা প্রচার কর্‌বার সঙ্কল্পে দীক্ষিত হয়েছি। তবে ভগবানের ইচ্ছায় কতদূর কি হয়ে উঠ্‌বে বল্‌তে পারিনে, কিন্তু চেষ্টা আমার ঐ দিকে।"

মায়া শ্রদ্ধা স্নেহমণ্ডিত নয়নে মদনের জীবন্ত-উৎসাহ-প্রোজ্জ্বল তরুণ সুন্দর মুখের পানে নির্ব্বাক্‌ভাবে চাহিয়া রহিল। মন্মথনাথ বলিলেন, "সুন্দর-মঠের মোহন্ত মহারাজের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক আছে, মদন ?"

মদন বলিল, "আছে বৈ কি—আদেশ এবং পালনের মধ্যে যে

সম্পর্ক, তাঁর সঙ্গে আমারও সেই সম্পর্ক ; অন্য শিষ্য, সেবক, অনুগত ব্যক্তির মত তাঁকে আমি সম্মান প্রতিপত্তির জন্য শ্রদ্ধা-ভক্তি করি কিনা, বল্‌তে পারি না, কিন্তু তাঁকে আমরা পিতার মত, সুহৃদের মত ভক্তি করি, ভালবাসি। তিনি সকলের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বত্যাগী হয়ে সংসারে বাস কর্‌ছেন, কাজেই সম্মান তাঁর পায়ের কাছে বাধ্য হয়ে মাথা নোয়ায়। মাসিমা মঙ্গল-মঠে থাক্‌তে তাঁর কথা বোধ হয় সব শুনে থাক্‌বেন ?”

মৃদু স্বরে মায়া বলিল, “শুনেছি, সামান্য-ই।”

মন্মথনাথ বলিলেন, “আমিও ভাল ভাল লোকের কাছে শুনেছি, মহারাজ চরিত্র-মহত্বে দেবতুল্য মানুষ, সাম্প্রদায়িক মঙ্গলামঙ্গলের দিকেও তাঁর যথেষ্ট দৃষ্টি আছে।”

মদন বলিল, “যথেষ্ট ; প্রত্যেকের মঙ্গলে-ই যে সম্প্রদায়ের মঙ্গল, প্রত্যেকের উন্নতিতে যে সম্প্রদায়ের উন্নতি, এ কথা তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলে যান নি ! দেখুন না, আমার মত অকর্ম্মা লোককে সেই জন্যে তিনি কি রকম জব্দ করে কাজে লাগিয়েছেন। আমার পৈতৃক বিষয় নিয়ে যখন অংশীদারগণের সঙ্গে বিরোধ হয় তখন মামলার ভয়ে—নিজের লোকসান জেনেও আমি আপোসে মামলা মিটিয়ে ফেলি, কিন্তু মঙ্গল-মঠের গদির সঙ্গে আমার চৌদ্দ-পুরুষের কারুর কোন সম্পর্ক না থাক্‌লেও, মহারাজ এমনি জোরে আমার কান ধরে মামলা তদ্বিরে লাগিয়েছেন, যে এখানে “না” বলে মাথা নাড়্‌বার উপায় নাই। মঙ্গল-মঠের গদি, মৃত অধিকারীর ভাগিনেয়-ই পান, আর জামাতাই পান—আমার তাতে কোন দুঃখ-দরদ ছিল না। কিন্তু মহারাজ আমার

দেখিয়ে দিলেন সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্য এর মধ্যে আমার মত তৃতীয় পক্ষগণের যথেষ্ট বাধ্যতা আছে! রাজত্ব পরিচালনের জন্য রাজার হৃদয় যেমন প্রশস্ত-উদার হওয়া দরকার, সুশৃঙ্খলা বিধানের জন্য মন্ত্রির মগজটি যেমনি উর্ব্বর সতেজ হওয়া দরকার—বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাপতির বাহুবল তেমনি দৃঢ়-নির্ভীক শক্তিশালী হওয়া চাই। কেউ 'ফেলনা' নন। কিছুদিন আগে, পড়াশুনো ছেড়ে-ছুড়ে চিরকুমার সন্ন্যাসী সাজবার লোভে আমার ভারী ঝোঁক চেপেছিল, কিন্তু মহারাজ আমার সে আব্দার গ্রাহ্য করেন নি, অবশ্য তখন আমি মহারাজের সে ব্যবহারে মোটেই খুসী হতে পারি নি বটে, কিন্তু এখন বুঝেছি—সন্ন্যাসী হলে তত্ত্ব উপদেশ আলোচনায় আধ্যাত্মিক বা আধিদৈবিক ব্যাপারে নিজের কিছুমাত্র উপকার করতে পারি আর না পারি, এই সব খুচরো আধিভৌতিক ব্যাপারে জনসাধারণের কারুকে যে আবশ্যক মত, কিছু সাহায্য করতে পারতুম না সেটা স্থির-নিশ্চয়!"

অকপট সারল্য-উচ্ছ্বাসে নিজের যুক্তিযুক্ত অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া, মদন মন্মথনাথকে যেমনই প্রীত তেমনই কৌতুকান্বিত করিয়া তুলিল। তিনি হাসিতে লাগিলেন। মদন মোহন্তমহারাজের চিত্ত ও চরিত্রের উচ্চতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিষয়ক নানা কথা কহিতে কহিতে আহার সমাপ্ত করিল। মায়া প্রশংসামুগ্ধ—স্নেহস্মিত বদনে নীরবে তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

আচমনান্তে উভয়ে ঘরে আসিয়া বসিলে মায়া মন্মথনাথের জন্য পান ও মদনের জন্য মসলা আনিয়া দিল। তখনও মদন মোহন্তমহারাজের কীর্ত্তিকলাপ আলোচনা করিতেছিল, মায়া মন্মথনাথের

পাশে টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

রাত্রি সাড়ে এগারটা বাজিয়া গেল। মদন বলিল, "মাসিমা খেয়ে আসুন।"

"যাব এখন—" ঈষৎ হাসিয়া মায়া বলিল, "আর একটু হোক্, মহারাজের কথা শুন্‌তে আমার বড় ভাল লাগ্‌ছে।"

উৎসাহিতভাবে চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিয়া মদন বলিল, "এ ত কি শুন্‌ছেন মাসিমা—মুখে কত বল্‌ব? যদি দেখেন তাঁকে কখনো, 'যদি' কেন, এবার ত নিশ্চয়ই মঙ্গল-মঠে গিয়ে তাঁকে দেখ্‌তে পাবেন—তখন দেখে আশ্চর্য্য হবেন। কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির নিষ্কাম-সাধনা যে কাকে বলে সেটা মহারাজকে দেখ্‌লে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বুঝ্‌তে পার্‌বেন। তাঁর প্রকৃতি—অদ্ভুত শক্তিশালী! আমার প্রতি তাঁর কৃপাদৃষ্টি আছে বলে যে আমি তাঁকে ভালবাসি, তা নয় মাসিমা—ছোট বড় সকলের উপরই তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা সহানুভূতির দৃষ্টি আছে বলে, আমি তাঁর একান্ত গুণমুগ্ধ। সাময়িক বৈরাগ্য-উচ্ছ্বাসে আমার মত অনেক চপল-কৌতূহলী প্রকৃতির শিক্ষিত অশিক্ষিত যুবক তাঁর কাছে গিয়ে চিরকুমারব্রতে দীক্ষিত হবার জন্য কত মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করেছে, তার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু মহারাজ কারুর কথা গ্রাহ্য করেন নাই। স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট পরিহাসের সঙ্গে হাসিমুখে আদর করে উপদেশ দিয়ে সকলকে বিদায় দিয়েছেন। আমরা সকলেই মনে কর্‌তাম মহারাজ চিরকৌমার্য্য ব্রতের একান্ত বিরোধী, কিন্তু মানবপ্রকৃতিগত সূক্ষ্ম বিশেষত্ব নির্ণয়ে তাঁর এমনি আশ্চর্য্য দক্ষতা—একদিন বিনা অনুরোধে হঠাৎ একটি রাজপুত

যুবককে চিরকৌমার্য্য ব্রতে দীক্ষা দিয়ে, কাজে ভিড়িয়ে দিলেন। সে লোকটি ছিলেন পাথুরে কারিকর, মানুষের প্রাণের ওপর কলম চালাবার শক্তি যে তাঁর মগজের মধ্যে আছে, এ ত আমরা কেউ স্বপ্নেও জান্‌তুম না, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, তিন বৎসরে সে লোকটি যা করেছেন, ত্রিশ বৎসরের সাধনায় অন্যের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়! আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেছি মেসোমশায়, তাঁর চেয়ে সুপণ্ডিত বুদ্ধিমান লোক ঢের দেখেছি—কিন্তু তাঁর মত একাগ্র-সাধননিষ্ঠ অদ্ভুত সংযমী, হৃদয়বান লোক এ পর্য্যন্ত আমি বোধ হয় আর দেখিনি।"

কৌতূহলী নয়নে চাহিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "কি কর্‌তেন তিনি?"

মদন বলিল, "প্রস্তর শিল্প ব্যবসায়। মহারাজের প্রতিষ্ঠিত নির্ম্মল-মঠের নাম বোধ হয় শুনে থাক্‌বেন, পাচ বৎসর আগে সেই নির্ম্মল-মঠ তিনি নিজ হাতে গড়েছিলেন। শুনেছিলাম তিনি একজন প্রতিভাশালী তরুণ ভাস্কর, ব্যস্‌ ঐ পর্য্যন্ত! তিন বৎসর আগে তাঁকে দেখেছিলাম, মৃদু প্রকৃতির নিতান্ত নিরীহ শান্ত সাধারণ ভদ্রলোক। কার সাধ্য বোঝে ভিতরে কিছু জানাশোনা আছে! এবার গিয়ে তাঁকে দেখে হতভম্ব হলুম, আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! যাঁদের কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণের যোগ্যতা পর্য্যন্ত তাঁর ছিল না—এখন স্বচ্ছন্দে তাঁদের ওপর শিক্ষকতা কর্‌ছেন, বয়সে সকলের ছোট হলেও এখন নির্ম্মল-মঠের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তিনি!"

মন্মথনাথ বলিলেন, "তিনিই কি নির্ম্মল-মঠের মোহন্ত হয়েছেন?"

মদন বলিল, "মহারাজ সেই পদে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে চান। সাধু পণ্ডিতগণ সকলেই তাঁর অনুরাগী, সকলেই একবাক্যে তাঁকে যোগ্যপাত্র

বলে স্বীকার করছেন, কিন্তু তিনি এমন অমায়িক নিরভিমানী ব্যক্তি যে তেমন সম্মানের পদও অক্লেশে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি স্পষ্ট বলেন, আমার শিক্ষা সাধনা আগে হৃদয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হউক্, তবে আমি পরীক্ষা ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হব। 'অধিকারী' 'মোহন্ত' ইত্যাদি পদের যোগ্যতা মানুষ তখনই লাভ করতে পারে, যখন মোহ-অন্তকারী বিশুদ্ধ নির্ম্মলতার উপর সম্পূর্ণ বিজয়াধিকার স্থাপনে মানুষের হৃদয় সিদ্ধকাম হয়।"

প্রশংসা-উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মন্মথনাথ বলিলেন, "বাঃ, পাণ্ডিত্য ত একেই বলে! তিনি এখন কি করছেন?"

"নির্ম্মল-মঠে থেকে সাধু-সহবাসে শিক্ষা-সাধনা বেশ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিভাবলে ভাষ্য ব্যাখ্যার বিকৃতঅর্থ—যার জন্যে সম্প্রদায় উৎসন্ন যেতে বসেছে, সেই সকলের সত্য রহস্য উদ্ঘাটনেও নিযুক্ত আছেন, কিছুদিন পরে সে সব চারিদিকে প্রচার হবে। তা ছাড়া, শুন্‌লুম একদিকে তাঁর ভয়ানক ঝোঁক—নারী জাতির উন্নতি! মূর্খ উপদেষ্টাগণের দোষে বর্ত্তমানে আমাদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম সাধন-প্রণালীর অত্যাচারে, বলতে ঘৃণা হয় মশায়—মাতৃরূপিণী নারীজাতিকে কুৎসিত বিড়ম্বনায় নিগৃহীত হতে হয়েছে। সম্প্রদায়ের ভিতর জন্মলাভ করে, রক্তের টানেও—যে অন্যায়াচারের বিরুদ্ধে কেউ সাহস করে দাঁড়াতে পারেনি, নিরঞ্জনদেব বাইরে থেকে এসে—আন্তরিক সমবেদনায় প্রাণের জোরে তেজস্বী হয়ে সেই মিথ্যাসৃষ্ট অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। সুন্দর-মঠের মোহন্তমহারাজ তাঁর পৃষ্ঠপোষক, সুতরাং চারিদিকে অনেক স্বার্থপর মঠাধিকারী ইতিমধ্যে

যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। খুব সম্ভব শীঘ্রই একটা বিপ্লব আরম্ভ হবে।"

মায়া এতক্ষণ স্থির-নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় মদনের কথা শুনিতেছিল। সহসা নিরঞ্জনদেবের নাম শুনিয়া সে তীব্র-চমক খাইল! উদ্বেগ-পীড়িত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি? কি নাম তাঁর?"

মদন উত্তর দিল, "নিরঞ্জন ভাস্কর, উপাধি 'দেব'।"

"নি-র-ঞ্জ-ন দেব!" বিস্ফারিত-নয়না মায়ার কণ্ঠ হইতে এমনই ভাবে নামটা প্রতিধ্বনিত হইল। যেন সে প্রতিধ্বনি তাহার কণ্ঠ শব্দের নহে!—সে যেন তাহার হৃন্মর্ম্ম স্তম্ভনকারী অন্য কোন প্রচণ্ড শক্তি-সংঘাতের—যুগান্ত প্রলয়কারী আকস্মিক বিস্ময় প্রতিধ্বনির মৃদু শব্দ-স্ফুরণ! মায়া শক্ত হাতে টেবিল-টা চাপিয়া ধরিয়া আড়ষ্ট-নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পাশের ঘরে ঘুমন্ত খোকার মশক দংশনে নিদ্রা ব্যাঘাতের অস্বস্তিজ্ঞাপক মৃদু ক্রন্দন শব্দ শোনা গেল। মদনের সর্ব্বব্যাপী তীক্ষ্ণ অনুভূতির নিকট সকলের আগে সে সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল, ত্রস্তে সে বলিল, "মাসিমা, আপনার খোকা কাঁদছে।"

"যা—ই" সংযত-ধীর কণ্ঠে উত্তর দিয়া মায়া অকম্পিত চরণে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

মদন ও মন্মথনাথ আরও কিছুক্ষণ বসিয়া, অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিলেন। তারপর উভয়ে বাহিরের বৈঠকখানায় গিয়া মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি লইয়া দেখাশুনা করিতে লাগিলেন। মামলার আর বেশী দিন বিলম্ব নাই, কাজেই সমস্ত কাজ পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত করিয়া রাখিবার

ব্যবস্থা চলিতেছিল। মন্মথনাথ রাত্রি দেড়টা পর্য্যন্ত জাগিয়া কাজ করিলেন। তারপর মদনকে বৈঠকখানার শয্যায় শয়ন করাইয়া নিজে বাটীতে আসিলেন।

মন্মথনাথ শয়ন করিতে না-আসা পর্য্যন্ত মায়া প্রত্যহ রাত্রে সেলাই, বোনা—অভাব পক্ষে একখানা বই লইয়া, জাগিয়া থাকিত। আজিও জাগিয়াছিল, কিন্তু মন্মথনাথ আজ শয়ন কক্ষে আসিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, দেখিলেন মায়া জাগিয়া আছে বটে কিন্তু সেলাই, বোনা, বা বই লইয়া নহে! সে খোকাকে জাগাইয়া নিশ্চিন্ত-কৌতুকে খেলা করিতেছে!

কাছে আসিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "খোকা এখনো ঘুমায়নি কেন?"

শান্ত দৃষ্টি তুলিয়া মায়া খুব সহজভাবে উত্তর দিল, "আমি ঘুমাতে দিইনি।"

সপরিহাসে মন্মথনাথ বলিলেন, "অপরাধ?"

মায়া স্থির কণ্ঠে উত্তর দিল, "বড় একলা বোধ হচ্ছে।"

হাসিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "আশ্চর্য্য ব্যাপার ত, তোমায় আমি কখনো একলা থাকার জন্যে আক্ষেপ করতে শুনিনি। সেলাই, বোনার মাঝে মৌন গাম্ভীর্য্যে ধ্যানস্থ হতে আজ ভুলে গেলে না কি?"

মায়া শিশুর মুখে চুমা খাইয়া বলিল, "ধ্যান হয়ত না-ও ভুলে যেতে পারি, তবে ধ্যেয় আজ রূপান্তরিত হয়েছেন সেটা ঠিক। বুনে বুনে জালাতন হয়েছি, সেলায়ের কাজও আজ কিছু নাই।

মন্মথনাথ বলিলেন, "বই পড়া?"

উদাস-দৃষ্টিতে আলমারির পানে চাহিয়া মায়া বলিল, "সবই যে পুরাণো।"

হাসিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "বটে! ভুলে গেছি আচ্ছা এবার নূতন বই আনিয়ে দেব। যাক্ রাত্রি অনেকটা হয়েছে, এখন নিদ্রার ব্যবস্থায় মনোযোগী হ'লে ভাল হয় না?"

কুণ্ঠিত মিনতির স্বরে মায়া বলিল, "তুমি ঘুমাও, খোকা-টা যতক্ষণ জেগে আছে—"

বাধা দিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "না না, রাত জাগিয়ে খেলা নয়, ওর অসুখ করতে পারে—অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে, শেষে তোমাকেই ভুগতে হবে। খেলা ছাড়, ঘুম পাড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা কর, এখনি ঘুমাবে, ওঠো তুমি।"

আদেশের উপর জেদের তর্ক চালান মায়ার প্রকৃতিতে অনভ্যস্ত ব্যাপার, সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে বিনা বাক্যে শিশুকে তুলিয়া শয্যায় গেল। মন্মথনাথ আলো কমাইয়া দ্বারের বাহিরে রাখিয়া, নিজে শয্যায় গিয়া শুইলেন।

নিস্তব্ধ অন্ধকার কক্ষের মধ্যে মাতৃবক্ষের শান্তি সুধায় পরিতৃপ্ত শিশু, শীঘ্রই নিদ্রার আরামে মগ্ন হইল। শ্রান্ত মন্মথনাথও বোধ হয় তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছিলেন, কোন দিকে কাহারও সাড়া শব্দ নাই; মায়ার মন অধীর ব্যাকুল হইয়া উঠিল, এ নির্জ্জনতা তাহার কাছে ভয়াবহ অস্বস্তিকর বোধ হইল। হঠাৎ ব্যগ্র-উৎকণ্ঠিতভাবে সে বলিয়া উঠিল, "ওগো শুনছ?"

তন্দ্রাকর্ষিত মন্মথনাথ চমকিয়া বলিলেন, "এঁ্যা।"

অপ্রতিভ হইয়া মায়া বলিল, "তোমার ঘুম এসেছিল, তাই ত—আচ্ছা ঘুমাও।"

মন্মথনাথ বলিলেন, "তুমি ভয় পেয়েছিলে বুঝি? কিসের শব্দ শুনতে বলছিলে না?"

"শব্দ?" সবিস্ময়ে মায়া বলিল, "শব্দ? কৈ না?"

"তবে কি?"

"কি জানি—তা হবে, বাতাসের শব্দ বোধ হয়, ও কিছু নয়, তুমি ঘুমাও।" মায়ার কণ্ঠস্বর ব্যস্ততাপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া নিশ্চিন্ত হাস্যে মন্মথনাথ বলিলেন, "ভাল ভীরু যা-হোক্, মাঝখান থেকে আমার তন্দ্রাটি নষ্ট করলে।"

অনুতপ্ত স্বরে মায়া বলিল, "আমি বুঝতে পারি নি।" পাখা-টা তুলিয়া লইয়া সজোরে বাতাস করিতে করিতে মায়া পুনরায় বলিল, "তুমি ঘুমাও।"

নিদ্রালস নয়ন বিস্তৃত করিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "তোমার ঘুম আসে না কেন? অসুখ বিসুখ করে নি ত?"

সজোরে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "কিছু না।"

"তবে ঘুমাচ্ছ না কেন?"

"কি জানি—যাক্ গে। দ্যাখ আমি ঐ মদন ভট্টের কথা ভাবছি, বেশ ছেলে, ওর কথাবার্ত্তা ভারী চমৎকার।"

মন্মথনাথ সংক্ষেপে অনুমোদন করিয়া বলিলেন, "প্রাণ খোলা লোক।

মায়া সাগ্রহে বলিল, "আচ্ছা, মদন যে ভাস্করের কথা বললে, নিরঞ্জন ভাস্কর—তিনি আগে মঙ্গল-মঠেও গিয়েছিলেন নয়?"

পুনশ্চ নিদ্রা চেষ্টিত মন্মথনাথ জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "হতে পারে, জানিনে।"

এবার পরিষ্কার কঠিন স্বরে মায়া বলিল, "তুমি ত তাঁকে দেখেছ, বিয়ের সময়। কেবল-দা'র সঙ্গে তাঁর যে খুব বন্ধুত্ব ছিল, অনাথ দরিদ্রের সেবা—কত লোকের কত সাহায্য—" মায়ার কণ্ঠস্বর কাঁপিল, মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া মায়া পুনশ্চ বলিল, "কতলোকের কত উপকার করতেন, তার হিসাব নাই। তখন তাঁর বয়স অল্প—মঙ্গল-মঠ সংস্কারের জন্য এসেছিলেন, ভাস্করের কাজ করতেন তখন।"

মন্মথনাথ বলিলেন, "তোমরা তা হলে দেখেছ তাঁকে।"

খুব শান্ত সংযত কণ্ঠে মায়া বলিল, "হ্যাঁ দেখেছি, তুমিও দেখেছ ত, বিয়ের আগের দিন কেবলদার সঙ্গে তিনি ষ্টেশনে তোমাদের আনতে গেছলেন।"

"কেবল-দার সঙ্গে?" ভ্রূযুগল ঈষদাকুঞ্চিত করিয়া বিস্মৃতি মোচন চেষ্টায় ক্ষণেক থামিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ মনে আছে, পাৎলা চেহারা সুন্দর রং—একটি ছোকরা। হাঁ কেবল তাঁর কি-একটা পরিচয় দিয়েছিল, মঠের সম্পর্কেই বটে! তিনিই নিরঞ্জন ভাস্কর? হতে পারে—তাঁর মুখের গঠন আমার ভারি ভাল লেগেছিল, ঠিক স্মরণ আছে, বড় বড় ভাসা চোখ, প্রশস্ত সুন্দর কপাল, মুখে অল্প অল্প গোঁফের রেখা।"

ক্ষীণ কণ্ঠে মায়া উত্তর দিল, "হবে, তাঁর চেহারা ভাল করে দেখি নি।"

মন্মথনাথ বলিলেন, "আমি বেশ দেখেছি, ঘাড় পর্য্যন্ত কোঁকড়া কাল চুল, মাথায় পাগড়ী।"

অন্ধকারে মায়ার মুখভাব কেহ দেখিতে পাইল না, কিছুক্ষণ

পরে, একটি অস্পষ্ট—নিতান্ত ক্ষীণ শব্দ আসিয়া মন্মথনাথের কানে পৌঁছিল—"হুঁ।"

অনেকক্ষণ মায়ার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। নিস্তব্ধতার মধ্যে নীরব নিদ্রাকর্ষণ অনুভব করিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "মায়া, শোও গে।"

মায়া নিঃশব্দে পাখা রাখিয়া উঠিয়া গিয়া শুইল। ক্ষণপরে, তন্দ্রাচ্ছন্ন মন্মথনাথ পা সরাইতে গেলেন মায়ার কপালে পা ঠেকিল, অপ্রসন্ন-ভাবে জড়িত স্বরে তিনি বলিলেন, "আঃ কোথায় শুলে গিয়ে? ছেলে-টার কাছে নিজের জায়গায় শোও না।"

মায়া যেন এই আদেশটার প্রতীক্ষায় ছিল, তৎক্ষণাৎ বিনা বাক্যে উঠিয়া গিয়া নিজের শয্যায় শয়ন করিল।

সহসা দূরে—সুপ্তিবিবশ নিশীথের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তীব্র ব্যাকুলতার উচ্ছ্বাসে কে গাহিয়া উঠিল—

'আমায় ভাবের ভেলায় ভুবন স্রোতে ভাসাও এবার ভাই!'

মন্মথনাথের শুব্ধ তন্দ্রা আকস্মিক শব্দ-সংঘাতে আবার আহত হইল। মায়া উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, বিস্ময়-বিহ্বল স্বরে বলিল, "এ কি গান?"

সুপ্তি-জড়িত-কণ্ঠে মন্মথনাথ বলিলেন, "স্কুলের পাগলা মাষ্টারমশাই গাইছেন বুঝি?"

কে গাহিতেছেন, তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরিচয় সংবাদ লইয়া মন ঠাণ্ডা করিবার সাবকাশ তখন মায়ার ছিল না। গানের ছন্দ, সুর, তান, লয়

নির্ভুল সঠিক কি না তাহার হিসাব খতাইবার প্রবৃত্তিও তাহার ছিল না। গান যাহাই হউক, কিন্তু তাহার প্রাণের আঘাত আসিয়া মায়ার হৃদয়ে বাজিয়াছিল। উৎকণ্ঠিতভাবে মায়া কান পাতিল—আবার সেই উচ্ছ্বসিত সৌহৃদ্যের প্রাণভরা অনুরোধ-বাণী শুনিতে পাওয়া গেল—

'আমায় ভাবের ভেলায় ভুবন স্রোতে ভাসাও এবার ভাই!'

ব্যগ্র উন্মাদনায় মায়ার সর্ব্বশরীরের রক্ত চঞ্চল উদ্দাম হইয়া উঠিল, শয্যা ছাড়িয়া মায়া আসিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইল। গায়ক গানের দ্বিতীয় চরণ গাহিল। এবার উচ্ছ্বাসের মত্ততায় নহে—বেদনা-নম্র হৃদয়ের দৃঢ়-করুণ অনুনয় স্বর—

'এই ভয়ের বাঁধন চাইনে কখন, অকূলে কূল নাই বা পাই।'

তারপর গানের সুর আরও নামিয়া গেল। বিশ্বস্ত প্রিয়তমের নিকট নিভৃত বিজনে, গোপন-হৃদয়ের আবেগ অভিব্যক্তির ন্যায় আবার সুর ব্যঞ্জনায় সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল—

'আমায়, নিয়ে চল জগত ছেড়ে, সব কলরব শান্ত করে,
শূন্য হতে শূন্যান্তরে—দিগন্তে দূরে—
জীবন্ততা সজীব যেথা, প্রান্ত সীমার অন্ত নাই।'

ক্ষণপরে সুর পরিবর্ত্তিত হইয়া যেন সুখাবেশ কল্পনার স্বপ্ন-বিহ্বলতায় গলিয়া কোমল—কোমলতম হইয়া মধুর আবেগে ধ্বনিত হইল—

'তোমায় আমায় খেল্‌ব সেথা উড়িয়ে পরাণ-পোড়া ছাই।'

আবার সুরের গতি ফিরিল। উচ্ছ্বাসে চড়িয়া দৃপ্ত-আজ্ঞার মত আবার সেই একান্ত অনুরোধের প্রথম তরঙ্গ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল—

'ভাবের ভেলায় ভুবন স্রোতে ভাসাও এবার ভাই!'

মায়ার স্নায়ুকেন্দ্রমূলে সহসা এক আকুল ব্যগ্রতার প্রচণ্ড শিহরণ বজ্র-ঝঞ্ঝণায় জাগিয়া উঠিল; একি গান, একি গান! এ কি গান! ভয়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া মুক্ত নির্ভীকতার স্রোতে—অবাধ গতিতে সমস্ত ভুবনের বুকে ভাসিয়া চলিবার জন্য একি আশ্চর্য্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা! একি উন্মাদ হৃদয়ের ভ্রান্ত প্রলাপ?

মায়ার মনে পড়িল, সে শুনিয়াছে ঐ পাগলা মাষ্টারমহাশয় —অসময়ে স্ত্রীপুত্রের মৃত্যু হওয়ায়, শোকে অর্দ্ধ উন্মাদ হইয়াছেন। লোক তাঁহার পাগলামীর ত্রুটী ধরিয়া বিদ্রূপ কৌতুকে আমোদ অনুভব করিয়া থাকে—পাগল তাহাতে কখনও অত্যন্ত বিরক্তিতে অধৈর্য্য হইয়া উঠেন, কখনও উন্মাদ-আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়েন। নিয়মের নির্দ্দিষ্ট পরিসীমায় আবদ্ধ হইয়া জীবিকা অর্জ্জন অসহ্য বলিয়া তিনি কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছেন, এখন যত্র-তত্র ঘুরিয়া বেড়ান। গভীর রাত্রে নিদ্রা ভাঙ্গিলে, অজ্ঞাত-ঔৎসুক্যে উত্তেজিত হইয়া, পাগল এমনি ভাবে পথে পথে করতাল বাজাইয়া ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান। তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি, তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধি যথেষ্ট মার্জ্জিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রকৃতির স্থৈর্য্য সব সময় থাকে না। এক এক সময় তিনি সত্যই পাগল হইয়া উঠেন, কিন্তু এখন তিনি যে ভাবোদ্বোধনে মত্ত হইয়াছেন, কে বলিবে উহা অ-প্রকৃতিস্থের মুখের

বাণী? না—সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হৃদয়ের যথার্থ অকপট আকাঙ্ক্ষার মুক্ত-উচ্ছ্বাস?

সহসা সচেতন হইয়া মায়া অনুভব করিল, ইহার মধ্যে মন্মথনাথ কখন শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিয়া—তাহার পাশে দাঁড়াইয়াছেন, তিনি নিঃশব্দে গান শুনিতেছেন।

গায়ক ভাবের অভিব্যক্তি ব্যঞ্জনার তালে তালে সুর উঠাইয়া নামাইয়া কঠিন কোমল করিয়া—উচ্ছ্বাসের বুক বিদীর্ণ করিয়া, প্রাণ খুলিয়া প্রাণের ভাষা নিবেদন করিতে লাগিলেন। সুপ্ত রজনীর বুকের উপর যেন বিরাট-চেতনার দৃপ্ত-জাগরণ অপরূপ সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা দুইটী অবাক হইয়া শুনিতে লাগিল গায়ক গানের শেষাংশ গাহিতেছে—

"চোখে চোখে মুখে মুখে হৃদয়ে হৃদয়—
মাটীর মানুষ জানে না সে প্রেমের পরিচয়,
মহা স্বচ্ছ মুক্ততাতে বিশ্ব ছাড়া বিশ্বাসেতে
মহাপ্রাণে প্রাণ মিশাতে ব্যাকুল মরম আকুল তাই!
দণ্ডী খেটে দম যে ছোটে—
(এবার) গণ্ডি কেটে মুক্তি চাই।"

গানের শেষ চরণে গায়ক অগাধ অপরিমেয় করুণ কাতরতায় মর্ম্মদুঃখের চরম ঐকান্তিকতা ঢালিয়া দিয়াছিলেন। মায়া প্রাণপণ চেষ্টাতেও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ সম্বরণ করিতে পারিল না—নিঃশব্দে তাহার চক্ষু ফাটিয়া টপ্ টপ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। ঊর্দ্ধ নয়নে

চাহিয়া বুকের উপর দুই হাত স্থাপন করিয়া সারা হৃদয়-ব্যপী আবেগ-কম্পনের মধ্যে, রক্তকেন্দ্রের প্রত্যেক রক্ত কণিকার—আকস্মিক ত্রস্ততায় সচেতন-সাড়া, সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে লাগিল। গায়ক গাহিতে গাহিতে কখন গান থামাইল, তাহার সংবাদ সে আর লইল না।

অনেকক্ষণ মন্মথনাথও কথা কহিলেন না। তারপর সশব্দে নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষুণ্ণ করুণ কণ্ঠে বলিলেন, "বাস্তবিক কি অকপট ভক্তি, কি সুন্দর! আহা ঐ ভদ্রলোকটীর কথা নিয়ে ছেলে বুড়োয় নিরঙ্কুশভাবে বিদ্রূপ করে, বেশী কি কৌতুকের অনুরোধে আমরাও কত সময় হৃদয়হীনের মত তাতে যোগ দিয়ে থাকি। কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি আজ এইখানে দাঁড়িয়ে ঐ অবজ্ঞেয় পাগলের ভক্তি ভাবুকতার চরণে আমার মাথা লুটিয়ে প্রণাম কর্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে।"

মায়া চমকিয়া বলিল, "কি?"

মন্মথনাথ ভাবিলেন, তাঁহার প্রণামের নামে মায়া চমকিত হইয়াছে বুঝি বর্ণগত-পার্থক্যের প্রচলিত মর্য্যাদার পানে চাহিয়া! মন্মথনাথ ব্রাহ্মণ সন্তান, আর ঐ পাগল যে বৈদ্য! মৃদু হাসিয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "না আমি অন্য ভাবে বলিনি, আমি আমার নিজের হৃদয়ের দিকে থেকে বলছি, ঐ শোকাহত জীর্ণ হৃদয়ের মাঝে অকপট সরলতার যে মহৎ সাধনার উচ্ছ্বাস আপনার আনন্দে আপনি স্বচ্ছন্দে বয়ে যাচ্ছে, সে মহত্ত্ব—অন্ততঃ আমার কাছে অবশ্য প্রণম্য বৈ কি?"

সহসা সবলে মন্মথনাথের হাত চাপিয়া ধরিয়া মায়া ত্রস্ত ব্যাকুলতায় বলিয়া উঠিল, "অবশ্য প্রণম্য! সত্য বল্‌ছ তুমি—সত্যই বল্‌ছ? ওগো

মানুষের মহত্বকে—মানুষ যত ক্ষুদ্র, যত ক্ষীণই হোক—কিন্তু তার প্রাণের উচ্চতাকে তুমি—না না তুমি নয়, তোমার হৃদয়, ওগো সত্য বল, সত্যই কি তোমার হৃদয় অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধায় সম্মান করে। ক্ষুদ্র মানুষের অবজ্ঞাত হৃদয়ের উদার মহত্বকে—সে কি সত্যই অকপটে সম্ভ্রম করে?" মায়ার প্রশ্ন আর অগ্রসর হইল না, তাহার আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর উচ্ছাস আধিক্যে রোধ হইয়া গেল।

দুর্ব্বোধ্য বিস্ময়ের তাড়নায় বিপন্ন হইয়া মন্মথনাথ বলিলেন, "হাঁ করে, সত্যই করে। মহা পাষণ্ডের চরিত্রেও যখন অতর্কিত ঘটনা সংঘাতে এতটুকু মহত্ব বিকাশ দেখি, তখন সেখানেও আমার হৃদয় আপনি শ্রদ্ধাসম্ভ্রমে নত হয়। কিন্তু তাতে কি? কেন তুমি এমন অধীর হয়ে উঠ্‌লে মায়া, কি হয়েছে তোমার?"

মায়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, হায় একথার উত্তর সেকি দিবে? ওগো—ক্ষমা কর, এ ভয়ঙ্কর প্রশ্নের উত্তর সে জানে না —জানেন তাহার অন্তর্য্যামী, কিন্তু থাক্—থাক! আজ অপর্য্যাপ্ত বেদনার সহিত অগাধ সান্ত্বনার সত্য জ্যোতিঃ আসিয়া তাহার প্রাণে পৌঁছিয়াছে।

গায়ক ঠিক বলিয়াছেন, "মাটির মানুষ প্রেমের পরিচয় জানে না।" মহাস্বচ্ছ মুক্তির মাঝে—বিশ্বের সঙ্কীর্ণ সংস্কার বিশ্বাসের বহির্ভাগে, সে প্রেমের পূজার স্থান—ধ্যানের আসন প্রতিষ্ঠিত! মানুষ আত্মার চৈতন্য মহিমা অনুভব করিতে জানে না, জানে শুধু চর্ম্মচক্ষে মূঢ়-জড়তার বাহ্যাকৃতি দেখিয়া, লঘু কৌতুকে কুৎসা করিতে! কিন্তু থাক্, আজ তর্ক দ্বন্দ্বে মিথ্যা মনঃপীড়া সৃষ্টির সময় নাই! আজ স্পষ্ট জাগরণের মধ্যে

মায়া প্রাণের আলোকে নিজের জীবনকে উপলব্ধি করিয়া লইতেছে, আজ আর দুঃখ করিবার কিছু নাই। মর্ত্তের নিরঞ্জনের মধ্যে যে অনবদ্য-চৈতন্যের মহানুভবতা দৃপ্ত-গৌরবে ঝলসিত হইতেছিল, মায়া দূর হইতে তাহার সৌন্দর্য্য আত্মচেতনায় উপলব্ধি করিয়া এক নিমেষে মুগ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এত বড় নিষ্কলঙ্ক শুচিতার মাঝে ঈর্ষার বিদ্রোহ তুফান তুলিয়া প্রমাদ ঘটাইল—সেই তাহার ভিতরের নীচ দৃষ্টি 'মাটীর মানুষ-টা!' সে মাটীর মানুষ, সে প্রেম-জ্ঞানহীন! সে পূজা মানে না, ধ্যান মানে না, সে বুঝে শুধু—নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যে বর্ব্বর-উৎপীড়ন! আত্মার সৌন্দর্য্য সম্মান তাহার কাছে অগ্রাহ্য; সত্য-নীতি, সত্য-বিবেক তাহার কাছে হতাদৃত! সে বুঝে শুধু বিবেকের দম্ভে—অবিবেকী মোহ! সে জানে শুধু নীতির দোহাই দিয়া দুর্নীতির নিষ্ঠুর শাসন!)

ওরে হতভাগ্য 'মাটীর মানুষ!' আজ তোর সমস্ত মলিনতা লইয়া তুই দূর হইয়া যা। আজ 'মাটীর মানুষ'কে লইয়া 'মাটীর মনুষ্যত্বের' সহিত সম্পর্ক পাতাইয়া, সে আর অন্তর্দ্দাহে জ্বলিবে না।

মন্মথনাথ বুঝিলেন, একটা অস্বাভাবিক আলোড়ন মায়ার ভিতর তীব্র বেগে চলিতেছে। তিনি কারণ বুঝিলেন না—বিস্ময়-উদ্বেগে অধীর হইয়া, মায়ার স্কন্ধ ধরিয়া নাড়া দিয়া বলিলেন, "মায়া—মায়া এমন করছ কেন?"

কম্পিত দেহে মায়া মন্মথনাথের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কেন শুনবে? জীবনে স্বর্গ কোথায় জানি না, কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য-তীর্থের পথ আজ আমি এইখানে খুঁজে

পেলুম। ওগো আজ আশীর্ব্বাদ কর, তোমার এই মুহূর্ত্তের শিক্ষা আমার জীবনে যেন চির সার্থক হয়।”

মায়া মন্মথনাথের পায়ের উপর মাথা নামাইল। মন্মথনাথ সেইখানে বসিয়া পড়িলেন, মায়ার মাথা বুকের উপর তুলিয়া লইয়া নির্ব্বাক্ ভাবে বসিয়া রহিলেন। দুইজনেই স্থির, নীরব, নিস্পন্দ! মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত গভীর নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া কাটিয়া চলিল, স্বামীস্ত্রীর কেহ কাহাকে কোন ক্ষুদ্র শব্দে সম্ভাষণ করিয়া সে নিস্তব্ধতার শান্তিভঙ্গ করিতে পারিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর মন্মথনাথ সুপ্তি-জড়িত চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, মায়া শয্যা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। মন্মথনাথ শয্যা ত্যাগের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, দেহ অবসন্ন আলস্যে জড়তাময় বোধ হইল। স্মরণ হইল—গতরাত্রে অনেক বিলম্বে শয়ন করা হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলা অস্পষ্ট ঘটনাস্মৃতিও মনে পড়িল, কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও—তাহার সবিশেষ তথ্য স্মরণ করিতে পারিলেন না। মস্তিষ্ক অত্যন্ত বিকলতা পূর্ণ বোধ হইল। মন্মথনাথ আবার শুইয়া পড়িলেন, অসহিষ্ণু বিরক্তিতে স্মরণ হইল—অনেক প্রয়োজনীয় কাজ পড়িয়া আছে, এখন নিশ্চিন্ত বিশ্রাম একান্তই অমার্জ্জনীয়। কিন্তু তখনই অবসাদ-শ্রান্ত-দেহ কঠিন ভাবে উত্তর দিল, আজ আমি নিতান্তই অপারগ। নিরস্ত হইয়া মন্মথনাথ আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

অনেক বেলায় মদন আসিয়া ডাকাডাকি করিয়া মন্মথনাথের ঘুম ভাঙ্গাইল। মন্মথনাথ চোখ মেলিলেন, মদন দেখিল—তাঁহার দুই চক্ষু জবাফুলের মত ঘোর রক্তবর্ণ। গায়ে হাত দিয়া দেখিল জ্বরতাপে সর্ব্বাঙ্গে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে। বিস্মিত হইয়া বলিল, "একি? আপনার জ্বর হ'ল কখন?"

অলস-ঘুর্ণিত নয়নে মন্মথনাথ বলিলেন, "জ্বর, কি জানি কখন জ্বর হয়েছে—তা হোক্ গে, একটু ঘুমাতে দাও।"

মদন আবার বলিল, "আজ আফিস যাবেন না!"

কার্য্যালয়ের নামে কর্ম্মপ্রাণ মন্মথনাথের রোগ আলস্য জড়তার ভিতর একটা চাঞ্চল্য উত্তেজনা বহিয়া গেল, ব্যর্থ চেষ্টায় দুইবার উঠিতে গিয়া অধিকতর শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। উদ্বিগ্ন ভাবে বলিলেন, "তাই ত সর্ব্বাঙ্গে বিষম বেদনা বোধ হচ্ছে—না পারব না, ওহে ভট্টজী তুমি আছ; ভুলে গেছি তাই ত বড় বিপদে পড়লুম যে। অনুগ্রহ করে একবার শ্রীশবাবুর কাছে যাও, আজ গরাইদের মামলার দিন, তাঁকে বোলো একটা যেন ব্যবস্থা করেন, আমি আজ উঠতে পারছি না।"

আরও দুই একটা খুচরা মামলা ছিল, মন্মথনাথ সেগুলা সম্বন্ধে যথাকর্ত্তব্য উপদেশ দিয়া মদনকে সত্বর শ্রীশবাবুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। মায়াকে ডাকিয়া অভ্যাগত অতিথি মদনের যত্ন স্বাচ্ছন্দ্যে যাহাতে ত্রুটি না হয় তৎসম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন।

সমস্ত দিন তেমনই তন্দ্রাঘোরে কাটিয়া গেল। মদন বার বার আসিয়া সংবাদ লইতে লাগিল। মায়া সংসারে অত্যাবশ্যকীয় কাজকর্ম্ম-গুলো শীঘ্র ও সংক্ষেপে সারিয়া, সমস্ত দিন মন্মথনাথের কাছে বসিয়া রহিল।

রাত্রে নিঃশব্দ তন্দ্রাঘোর আর রহিল না, যন্ত্রণায় মন্মথনাথ খুব ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। মায়া ভীত হইল, মদন উদ্বিগ্ন হইল, রাত্রেই একজন চিকিৎসককে আনা হইল। রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করিয়া তিনি বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিলেন না, সন্দিগ্ধ ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "কাল্‌কের দিনটা না দেখে কিছু বলা যায় না।"

পরদিনও সেই অবস্থায় কাটিল, যন্ত্রণাঘোরে মন্মথনাথ প্রলাপ

বকিতে লাগিলেন। শ্রীশবাবুপ্রমুখ হিতৈষী সুহৃদবর্গ আসিয়া রোগীর অবস্থা দেখিয়া বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতাল হইতে সাহেব ডাক্তার আনা হইল, সাহেব সহযোগীর সহিত একমত হইয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "অবস্থা দুর্ব্বোধ্য !"

বুকভরা উৎকণ্ঠা বুকের মধ্যে চাপিয়া, মায়া শ্রান্তিহীন ধৈর্য্য লইয়া রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিল।

মদন অভ্যাগতরূপে এ বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু অবস্থাচক্রে বাধ্য হইয়া এই দুঃসময়ে তাহাকে এ বাটীর অভিভাবকপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইল। এই বিপদের সময় মদনের সাহায্য মায়ার নিকট যেন দেবতার আশীর্ব্বাদের মত বোধ হইল। অক্লান্ত পরিচর্য্যার মাঝে, যখন সংজ্ঞাহীন মন্মথনাথের পাণ্ডু বিবর্ণ মুখপানে চাহিয়া, মায়ার অন্তর শিহরিয়া উঠিত, যখন আপনাকে দুঃসহ সঙ্কটের মধ্যে অত্যন্ত অসহায় নিরুপায় বোধ হইত—সেই সময় মদন যখন "কি চাই মা" বলিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন অপার্থিব করুণ-কৃতজ্ঞতায় মায়ার সমস্ত বুক যেন ভরিয়া যাইত! তাহার মনে হইত—চাহিবার আর কিছু নাই, প্রয়োজন সব ফুরাইয়াছে।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন, চারদিন কাটিল। মদনের ঐকান্তিক আগ্রহ, মায়ার প্রাণান্তিক সেবা কিছুই সফল হইবার লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তারগণের সন্দিগ্ধ গাম্ভীর্য্য ক্রমশঃ স্থির বিশ্বাসে কঠিন নীরব হইয়া উঠিল।

গতিক ভাল নহে দেখিয়া শ্রীশবাবু মদনকে ইঙ্গিত করিলেন।

মদন মঙ্গল-মঠে টেলিগ্রাম করিল, সেখান হইতে কেবলরাম শান্তিদেবীকে সঙ্গে লইয়া, পরদিন এলাহাবাদে আসিলেন।

শুক ম্লান মুখে আসিয়া শান্তিদেবীকে প্রণাম করিয়া, মায়া পায়ের ধূলা লইল। হঠাৎ তাহার মুখ হইতে যেন অজ্ঞাত অশুভ লক্ষণের পূর্ব্বসূচনার মত ক্ষীণ কাতর বাণী নির্গত হইল, "দিদি কি হবে?"

শান্তিদেবী আশ্বাসের স্বরে বলিলেন, "কি আর হবে বোন্? ভগবান মঙ্গলময়, তিনি যা করবেন তাই হবে।"

শান্তিদেবী ও কেবলরাম আসিয়া রোগশয্যার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। ডাকাডাকিতে মন্মথ অনেক কষ্টে বিকারঘোরাচ্ছন্ন চক্ষু মেলিলেন, কিন্তু কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না। কেবলরাম পরিচয় দিল, মন্মথনাথ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আপনারা এসেছেন, এ সময় বড় উপকার হোল—ওদের দেখবেন।"

তিনি আর কিছু বলিতে পারিলেন না, পাশ ফিরিয়া শুইলেন। বৈকালের দিকে তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া আসিতে লাগিল, বাড়ীর লোকে প্রমাদ গণিল, চিকিৎসকগণ হতাশ হইলেন। মন্মথনাথের বন্ধুত্ব ও উপকার যাহারা ভুলিয়া যান নাই, তাঁহারা সকলেই আসিয়া বিষণ্ণ বেদনায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। মায়ার সাহস লোপ পাইল, ধৈর্য্য ফুরাইল, সেবার শক্তি ঘুচিল। সে আর সহ্য করিতে পারিল না, সকলের নিষেধ উপদেশ সান্ত্বনা ভুলিয়া শয্যাপ্রান্তে বসিয়া মুখে আঁচল চাপা দিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কেহই তাহাকে থামাইতে পারিল না।

শেষ রাত্রে মন্মথনাথের নাভিশ্বাস আরম্ভ হইল। প্রাণ যখন কণ্ঠাগত,

তখন কেবলরামের দুই হাত ধরিয়া সাশ্রু-নয়নে তিনি বলিলেন, "সব অপূর্ণ রইল ভাই, চল্লুম। ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপূণ্য কাকে বলে জানিনে, তবে কর্ত্তব্যকে চিরদিন প্রাণপণ নিষ্ঠায় পালন করেছি, অসহায়া দরিদ্রকন্যাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেছিলাম, মনে বড় আশা ছিল সুখী করব, কিন্তু সময় পেলুম না, বড় দুঃখ রইল কিছুই সঞ্চয় করতে পারিনি, ওদের পথের ধূলায় বসিয়ে রেখে চল্লুম। তোমরা রইলে, ওদের দেখো—আর তোমার কাছে—মদনের কাছে আমার একটি অনুরোধ, ছেলেটা যদি বাঁচে তা হলে তাকে মূর্খ করে রেখো না, তোমরা নিজের সন্তান বলে—অন্ততঃ ভিক্ষার দানেও ওর পড়াশুনার ব্যবস্থা কোর।"

অশ্রুপ্লাবনে অধীর কেবলরাম কথা কহিতে পারিল না। মদন আত্মদমন করিয়া নিকটে আসিয়া বলিল, "আপনি নিশ্চিন্ত হোন্ মন্মথবাবু, আপনার পুত্রকে আজ থেকে আমি ধর্ম্মভ্রাতা বলে গ্রহণ করলুম। তার সকল ভার আমার ওপর—ভাইয়ের জন্য ভাই যা করতে পারে, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে তার কিছু মাত্র ত্রুটি হবে না, নিশ্চয় জানবেন।"

মন্মথনাথের মৃত্যুছায়া-মলিন বদনে প্রসন্ন আনন্দের জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, ইঙ্গিতে আশীর্ব্বাদ করিয়া শান্তমুখে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। নবীন জীবনের অজস্র আশা আকাঙ্ক্ষা, হৃদয় ভরা উদ্যম, প্রাণভরা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সব এক মুহূর্ত্তে ছায়াবাজীর মত শূন্যে মিলাইয়া গেল। ত্রয়োবিংশ বর্ষীয়া পত্নী ও দুগ্ধপোষ্য বালককে অনাথ করিয়া—নিয়তির বিধান মাথায় বহিয়া তিনি লোকান্তরে চলিয়া গেলেন। জগতে রহিল শুধু তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ

জীবনের শান্ত স্মৃতি—আর মানুষের বুক ভরা ব্যর্থ ব্যাকুলতার বেদনাময় হাহাকার!

যথাসময়ে কেবলরাম শ্মশানে যথাকর্ত্তব্য শেষ করিয়া বাড়ী আসিল শোকের প্রথম সংঘাত সহ্য হইলে পর কেবল শান্তি দিদির সহিত পরামর্শ করিয়া মদনের সহিত একমত হইয়া, শ্রীশবাবুপ্রমুখ বিজ্ঞ ভদ্রলোকগণের অনুমতি লইয়া—এখানকার বাসা উঠাইয়া মায়াকে লইয়া মঙ্গল-মঠে নিজালয়ে যাইতে প্রস্তুত হইল। প্রস্তাব শুনিয়া শোকক্লিষ্টা মায়ার শুষ্ক অধরপ্রান্তে শুধু একটু ক্ষীণ হাসি ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্যও দ্বিধা আপত্তি করিল না।

উদ্যোগী কেবলরাম বাসার অনাবশ্যক আসবাবপত্র টেবিল চেয়ার খাট প্রভৃতি এবং মন্মথনাথের বহুলায়াস-সংগৃহীত মূল্যবান আইন পুস্তকগুলি সব সুবিধামত দরে বিক্রয় করিয়া দিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল কপর্দ্দকহীনা বিধবা মায়ার হাতে, নগদ যাহা কিছু আসে তাহাই ভাল

যেদিন তাঁহারা বোম্বাই ফিরিবেন, সেইদিনই স্বরাটের মোহন্ত-মহারাজের নিকট হইতে মদন টেলিগ্রাম পাইল। তিনি মদনকে ফিরিয়া যাইতে লিখিয়াছেন কারণ মঠের মামলা মিটিয়া গিয়াছে, দেশের গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ একত্র হইয়া ধর্ম্ম সম্পর্কীয় মতদ্বন্দ্ব নিষ্পত্তির জন্য রাজদ্বারে আবেদন করা লজ্জা ও অপমানের বিষয় বুঝিয়া, দেবলচাঁদকে মহারাজের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করাইয়া আপোসে মীমাংসা করাইয়াছেন। দেবলচাঁদ গদি লাভের আশা ত্যাগ করিয়াছে, মহারাজ তাহাকে ক্ষমা করিয়া পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন, এবং শীঘ্রই জনৈক সুপাত্রের সহিত মৃত দেবকীনন্দনের কন্যার শুভ বিবাহকার্য্য

সমাধা করাইয়া তাহাকে মঠাধিকারী পদে অভিষেক করিবেন জানাইয়াছেন।

মন্মথনাথের আকস্মিক মৃত্যুতে মদন অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিল। মামলার গোলমাল তাহার আদৌ ভাল লাগিতেছিল না, সুতরাং মহারাজের টেলিগ্রাম পাইয়া সে নিশ্চিন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, এবং কালবিলম্ব না করিয়া সেইদিনই তাহাদের সহিত এলাহাবাদ ত্যাগ করিয়া মঙ্গল-মঠ হইয়া সুরাটে গমন করিল। কেবলরাম শোকখিন্না মায়াকে ও শান্তিদেবীকে সঙ্গে লইয়া, শিশু ভাগিনেয়কে বুকে করিয়া বিষাদমলিন-বদনে নিজের বাটীতে প্রবেশ করিল।

কেবলের কিশোরী বধূ অমিয়াদেবী সরল উন্নতচেতা সদাশয় স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী; সে শান্তিদেবীকে পূর্ব্বাপর যত্ন ও সম্মান করিয়া চলিত, এখন মায়াকেও ঠিক তাঁহারই পাশে স্থান দিল। মায়ার শিশুকে সে খুব সহজেই নিজের আয়ত্ত করিয়া ফেলিল, মায়ার সহিত এখন আর শিশুর কোন সম্পর্ক রহিল না, শুধু স্তন্য পানের জন্য সে কয়বার মায়ার কাছে আসিত মাত্র, তাহা ছাড়া সর্ব্বক্ষণ সে কেবলের বধূর তত্ত্বাবধানে থাকিত।

———

একাদশ পরিচ্ছেদ

মায়ার নম্র-কোমল প্রকৃতির শান্ত-সহিষ্ণুতা সকলেই চিরদিন ভালরূপে জানিত, এত বড় পরিবর্ত্তনেও তাহার সে ভাবের বিশেষ কিছু ব্যত্যয় দেখা গেল না। সে প্রথমটা অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা খুব অল্প সময়ের জন্যই। তারপর তাহার প্রকৃতিতে সেই চির অভ্যস্ত ধৈর্য্য-দৃঢ় গাম্ভীর্য্য-প্রশান্তি আবার দ্বিগুণ শক্তিতে প্রকটিত হইতে দেখা গেল। সকলেই বেদনার সহিত বিস্ময় বোধ করিলেন কিন্তু মায়া কিছুতেই দৃক্‌পাত করিল না। নিজের মধ্যে স্পষ্ট-চেতনায় সে উপলব্ধি করিল যে, এই সর্ব্বস্ব-খোয়ান শোকের আঘাত যত বড় বিষম কঠিন হউক, কিন্তু এই শোক, একটা সুদৃঢ় সান্ত্বনা পরিবেষ্টনে আবরিত করিয়া তাহাকে সর্ব্বজয়ী নিশ্চিন্ত নির্ভয়ের অঙ্কে স্থান দিয়াছে। এই দুঃসহ যন্ত্রণাময়ী বিয়োগ বেদনা, তাহাকে সকল মোহের যোগ হইতে, সকল দৌর্ব্বল্য কারণতার যোগ হইতে চিরদিনের জন্য নির্ম্মম টানে ছিঁড়িয়া একেবারে পরম নির্ভরতার বুকে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। এখানে দাঁড়াইয়া অতীতের সুখ দুঃখের স্মৃতি আন্দোলন করা দুঃসাধ্য—বড় অসহ্য ব্যাপার! বর্ত্তমানের জন্য আক্ষেপ করিতেও ইচ্ছা নাই। এখন এখানে দাঁড়াইয়া, তাহার ইচ্ছা হইতেছে শুধু—ভবিষ্যতের পরপারে যাহা আছে, তাহারই দিকে নিঃশঙ্ক দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিতে!

সেদিন সন্ধ্যাবেলা কেবলরাম মঠের কাজ সারিয়া বাটী ফিরিয়া জলযোগে বসিয়াছিল, অদূরে শান্তিদেবী মালা হাতে করিয়া বসিয়া-

ছিলেন। তাঁহার নিকটে বধূ আসিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া মায়ার শিশুকে কোলে লইয়া বসিয়াছিল। কেবল শান্তিদেবীকে তাঁহার পাঁজরের ব্যথার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে মায়া সেখানে আসিয়া কেবলরামের সম্মুখে বসিয়া পড়িয়া বিনা ভূমিকায় বলিল, "দাদা, আমার একটি অনুরোধ আছে, বল তোমরা রাগ করবে না ?"

কেবল ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল, "রাগ করবার মত অনুরোধ তুমি ত কখনো করনি দিদি, কেন আমি রাগ করব ?"

মায়া খুব সহজভাবে সংক্ষেপে বলিল, "মঙ্গল-মঠে দেবালয়ের পরিচারিকা ক'দিন হোল কর্ম্মত্যাগ করেছে, আমাকে তুমি সেইখানে নিযুক্ত করে দাও।"

বিস্ময়ে চমকিয়া কেবল বলিল, "তোমাকে ? অসম্ভব ! না মায়া, আমার আয় যত অল্পই হোক, কিন্তু সংসারে অভাব অসচ্ছলতা আমার কিছুই নাই—"

বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে মায়া বলিল, "তোমার অভাব না থাক, কিন্তু আমার আছে। আমার শক্তি সবল দেহ, জপের মালা নিয়ে অষ্টপ্রহর অলস নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকায় শক্তির অপব্যবহার হচ্ছে। এই অপব্যবহারই যে মহাপাপ কেবল-দা, না, এর প্রতিকার চাই, তুমি আপত্তি কোর না।"

হতবুদ্ধি হইয়া কেবল বলিল, "তোমার ছেলে যে ছোট মায়া।"

"তাতে আমার কি ? যে ক'দিন একান্ত অসহায়ভাবে আমার মুখাপেক্ষী হয়েছিল, সে ক'দিন প্রাণপণে যত্ন তত্ত্বাবধান করেছি। এখন

ভগবানের ইচ্ছায় ও দিনে দিনে আমার সংস্রব এড়িয়ে যাচ্ছে, এ ত আমার পক্ষে খুব ভাল হয়েছে—আমি এখন নিজের কাজ খুঁজে নিতে কেন আলস্য করি বল দেখি ?"

কেবল ক্ষণেক হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "বুঝেছি মায়া, দিদিমা যে ঐ কাজ করে গেছেন, সে কথাটা তুমি ভুলতে পারনি, কিন্তু তাঁর অবস্থার সঙ্গে তোমার অবস্থার পার্থক্য কতটা তা কি ভেবে দেখেছ ?"

মায়া বলিল, "দেখেছি কেবলদা, কিন্তু তাই বলে সেই ভয়টাকে বড় করে এখন থেকে পেছিয়ে দাঁড়াতে পারিনে। আমার কাজ চাই, কেবল-দা, সৎ কাজ, যাতে দেহ মন দুই সুস্থ থাকে, এমন কাজের ব্যবস্থা চাই। না কেবল-দা, বুঝতে পারছি, তুমি তোমার মান-অপমানের কথা ভুলে আপত্তি করতে চাইছ, কিন্তু ও বাজে তর্ক। ভাই যেখানে দাসত্ব করতে পারে, ভগিনীর সেখানে দাসীত্ব স্বীকারে হানি কি ? বিশেষ সে দাসীত্বে যদি চিত্তের আনন্দ স্ফূর্ত্তি থাকে।"

মায়া যে এমনভাবে তর্কযুক্তির অবতারণা করিতে পারে তাহা কেবলের স্বপ্নের অগোচর ! কি উত্তর দিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া সে হতভম্ব হইয়া রহিল। শান্তিদেবী ম্লানমুখে অশ্রু ছল ছল নয়নে বলিলেন, "কেন পাগলামী করিস্ মায়া, এমনভাবে আমাদের কষ্ট দেওয়াটা কি তোর উচিত ? তোর এত দুঃখ সহ্য করবার কি দায় পড়েছে ?"

মায়ার অধরপ্রান্তে যেন ক্ষুব্ধ-বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল, "বলিল দুঃখ ? তোমরা একে 'এত দুঃখ' মনে করলে দিদি ? সত্যই এবার আমার বড় দুঃখ বোধ হোল। তোমাদের স্নেহ, অনুগ্রহ, যত্ন, আদরের

ওপর খুসীর জোরে তর্ক চালাতে পারি না দিদি, চুপ করে যেতে বাধ্য হচ্ছি, কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বল্‌ছি বিশ্বাস কর—দুঃখের সম্পূর্ণ মূর্ত্তিটা যে কত বিরাট, কত ভয়ানক, তা আমি জীবনের চরম সুখের মুহূর্ত্তে সব চেয়ে ভাল করে দেখে নিয়েছি, বুঝে নিয়েছি। তার কাছে এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষীণ ছায়া ভয় কর্‌বার জিনিস নয়, ভালবাস্‌বার সামগ্রী।"

একটু থামিয়া, সহসা অসহিষ্ণু বিরক্তির সহিত মায়া বলিয়া উঠিল, "এই সামান্য ব্যাপারটার জন্যে তোমরা যে অনর্থক মত-দ্বন্দ্ব বাধিয়ে দেবে, এটা বড়ই অবিচার হয়। আমি বাক্‌চাতুরী করে তোমায় জ্বালাতন কর্‌তে আসি নি দাদা, আমি এক কথা বলে দিতে এসেছি আমার 'কাজ চাই!' এর ওপর সত্যসত্যই যদি আপত্তি কর্‌বার মত কিছু থাকে, বুঝে দেখে কাল আমায় বোলো, কিন্তু যতদূর বুঝ্‌ছি, তুমি এখন দেবালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ, প্রধান পুরোহিত। তুমি যদি একটু চেষ্টা কর, তা হলে এ কাজ আমার পক্ষে খুবই সহজসাধ্য হয়।"

মায়ার অসঙ্গত অনুরোধটা সদ্যঃ প্রত্যাখ্যান করিয়া নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কেবলরাম মনে মনে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কিন্তু জোর করিয়া 'না' বলিতেও তাহার ভয় হইল, অথচ কোন তর্কে মায়াকে নিরস্ত করিবে তাহাও ভাল বুঝিতে পারিল না। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা বলিল, "মনের শান্তির জন্য যে গোলমেলে দাসত্ব-বাধ্যতার মধ্যে ঢুকতে চাইছ, তাতে কি শেষ পর্য্যন্ত মনের শান্তি সন্তোষ অব্যাহত থাকবে?"

মায়া ইহার উত্তর যেন পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, হাসিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল, "তা কি থাকে কেবল দা? শেষ পর্য্যন্ত শান্তি সন্তোষ

অব্যাহত থাক্‌লে যে সর্বদিকই মাটী হয়ে যাবে। আমি এ কাজে এগোতে চাইছি, বাইরের দিক থেকে শান্তি সন্তোষ লাভের জন্য নয়, বাইরের দিক থেকে নানা অবস্থার সংঘাতের ভেতর দিয়ে আমি এমন জিনিস নিতে চাই, যাতে করে আমার ভিতরের শান্তিসন্তোষ চরম তৃপ্তিতে চিরদিনের জন্য জমাট বেঁধে যায়।"

মায়ার কথাটা সকলের নিকটই অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য বোধ হইল. কেবলরাম নির্ব্বাক হইয়া রহিল, শান্তিদেবী বলিলেন, "মায়া, তুই বুদ্ধিহীনা নস্, সেটা খুব ভাল জানি, দেবালয়ের পরিচর্য্যা খুব সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই, যদি প্রাণের নিষ্ঠায় কর্ত্তব্যপালন করা যায়, তাহলে সেও যে এক মস্ত সাধন তা' কে অস্বীকার করবে? আমি তোকে বাধা দিতে চাইনে, কিন্তু একটা কথা, নিশ্চিন্ত নির্জ্জনে মুখ্যসাধন ছেড়ে, অত কোলাহলের মধ্যে গিয়ে গৌণ-সাধনের প্রয়োজন কি?"

মায়া শান্তিদেবীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মুখ্য সত্তা স্পষ্ট পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করবার জন্যই গৌণ সাধনের আবশ্যকতা বুঝ্‌ছি বলে! অস্ত্রের ব্যবহার ক্ষেত্র যেখানেই হোক্, কিন্তু তাকে 'শাণ' দেবার জন্য কঠিন পাথরের দরকার, সেটা বিধাতা আমায় খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। না—আমার কথা হয়ত গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে, তোমরা বুঝ্‌তে পারছ না, কিন্তু ক্ষমা কর দিদি, আমি মনে যা বুঝ্‌ঝি, তা নিয়ে মুখোমুখী বকাবকি করতে পারিনে। কেবলদা তোমার পায়ে পড়ি ভাই আপত্তি কোর না, আমি জীবনে অনেক ভুল করেছি, ভুল করে করে ভুলের চেহারাটা খুব ভাল করে চিনে নিয়েছি। কিন্তু এবার ভগবান

আমায় যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সে পথের ত্রিসীমানায় ভুল তিষ্ঠাতে পারে না—এটা খাটি সত্য।"

মায়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আত্মসম্বরণ করিয়া খুব সহজভাবে একটু হাসিয়া তরল কণ্ঠে বলিল, "অত কথায় কাজ নাই, মোটামুটি এইটুকু বল্‌তে চাই, আমার দিদিমাও পিতৃমাতৃহীনা দৌহিত্রীর জীবনের সদ্গতির জন্য ঐ দেবালয়ে ঐ কাজ করে গেছেন। তবে আমি কেন আমার অপোগণ্ড শিশুর ভবিষ্যত কল্যাণের জন্য ঐ দেবালয়ে কাজ কর্‌তে পার্‌ব না? বিশেষ, সুযোগ যখন রয়েছে, তখন একাজে অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য নয় কি?"

মায়া চলিয়া গেল। কেবলরাম ও শান্তিদেবী অনেকক্ষণ ধরিয়া মায়ার প্রস্তাবের অনুকূলে ও প্রতিকূলে অনেক ভালমন্দের সম্ভাবনা লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলেন। তারপর উভয়ে একমত হইয়া, মায়ার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। পরদিন কেবল মায়াকে মঠের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিল।

দেওয়ান দেবলচাঁদের হস্তে মঠের বৈষয়িক ব্যাপারের সমস্ত ক্ষমতা থাকিলেও দেবালয় সংক্রান্ত কোন বিষয়ের সহিত তাহার সংস্রব ছিল না। পুরাতন পুরোহিত শ্যামসুন্দর পণ্ডিত এখন পরলোকে, কেবলরাম তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং দেবালয়সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারে কেবলরামই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। তাহার কঠোর শাসন ও সতর্ক দৃষ্টিতে এখন দেবালয়ের সকল কাজই খুব সুশৃঙ্খলে চলে, সেবকগণ সকলেই শিষ্ট-সংযতভাবে কর্ত্তব্যপালন করে। কেবল পূর্ব্ব হইতে সকলকে ভালরূপে চিনিয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং এখন প্রভু হইয়া সে

সকলের সম্বন্ধেই যথোচিত সতর্ক হইয়া, কাজ আদায় করে; সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা শাসিত হইয়া দেবালয় এখন যথার্থই দেবালয়ে পরিণত হইয়াছে।

দেবালয়ের অনেক পুরাতন লোক চলিয়া গেলেও, মায়া দেখিল এখনও বৃদ্ধ ভাণ্ডারী-জী দেবালয়ে আছেন। মায়ার জীবনের বিসদৃশ অবস্থা পরিবর্তনের সংবাদ, বৃদ্ধের সরল স্নেহশীল হৃদয়ে বড় বেদনার সহিত গভীর সম্ভ্রমের ভাব জাগাইয়া দিল। বৃদ্ধ নিজের ব্যবহারে ত ত্রুটি রাখিল না, উপরন্তু তীক্ষ্ণ সতর্কতায় মায়ার উচ্চ সম্মানের দ্বারে সে যেন প্রহরী হইয়া বসিল। তাহার ইঙ্গিতে দেবালয়ের ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই এই ভাগ্যপীড়িতা ভদ্র-গৃহস্থ যুবতীকে যথোচিত শিষ্ট-মর্য্যাদাপূর্ণ ব্যবহারে সম্ভ্রম দেখাইয়া চলিত। মায়া যতক্ষণ দেবালয়ের কাজে নিযুক্ত থাকিত, ততক্ষণ সকলেই পূর্ণমাত্রায় শান্ত, সংযত ও নম্র হইয়া থাকিত। মায়া অবাধ শান্তিতে প্রসন্ন হৃদয়ে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইত।

মায়ার দিন-রাত্রিগুলা দিনে দিনে নব নব তৃপ্তি-আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। পিছনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তটা, সে যেন স্বপ্ন-বিস্মৃতির অন্ধকারে সজোরে নিক্ষেপ করিয়া তীব্র আকাঙ্খায় ব্যাকুল আগ্রহে, তৃষিত উৎসুক হৃদয় লইয়া বাঞ্ছিত পথে ছুটিয়া চলিল। চতুষ্পার্শের ঘটনা-তরঙ্গ বলিষ্ঠ বাহুর ক্ষিপ্র-কৌশল সঞ্চালনে সজোরে ঠেলিয়া মুক্ত বাতাসের উপর মাথা উঁচাইয়া নির্ভীক নিশ্বাসে প্রাণশক্তি সংগ্রহ করিয়া, সে যেন স্রোতের মুখে উজানে ভাসিয়া চলিল। এক এক সময় গভীরতম শান্তি আনন্দের মধ্যে হর্ষবিহ্বল হইয়া সে ভাবিত,

তাহার এত শক্তি এতদিন কেবল দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে, কোন মহাসুপ্তির মধ্যে মগ্ন হইয়াছিল? সে যে ইহার অস্তিত্ব এক মুহূর্ত্তের জন্যও জানিতে পারে নাই! মঙ্গলময় বুঝি দয়া করিয়া তাহাকে এই নির্ভুল সন্তরণ-কৌশল শিখাইবার জন্যই, নির্দ্দয়ের মত তত বড় ভুলের মধ্যে ডুবাইয়াছিলেন। না ডুবিলে বুঝি এই সাঁতার শিক্ষা হইত না।

মায়ার কৃতজ্ঞ ভক্তিভার-নম্র হৃদয় একান্ত আত্মনিবেদনের মধ্যে আত্মহারা হইয়া উঠিত। নারায়ণ, তোমার বিরাট রহস্য কৌতুক-লীলা মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য! মানুষ কি বুঝিবে, তুমি কাহাকে গড়িবার জন্য কাহাকে ভাঙ্গিতেছ! কোন বোধ-উদ্বোধনের জন্য কত বড় ভ্রান্তি-রহস্য রচনা করিতেছ! দুর্ভাগিনী মায়া, জীবনের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য, সার্থকতার মুহূর্ত্তে অন্তরের সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য. ব্যর্থতা অনুভব করিয়া, ক্ষুব্ধ বেদনায় আত্মগ্লানিতে জর্জ্জর হইয়াছিল। আর আজ, জীবনের চরম ব্যর্থতার অঙ্কে উপস্থিত হইয়া, অন্তরের পরম সার্থকতা খুঁজিয়া পাইল। এ কি আশ্চর্য্য তোমার করুণা, দীনবন্ধু! সে আজ বুঝিতে পারিতেছে, মানবজীবনের সব চেয়ে বড় ব্যর্থতাই সব চেয়ে বড় সার্থকতার সংবাদ বহন করিয়া আনে। হে কৌতুক-কুশল দেবতা, তোমার কৌতুক-লীলা তোমার কৌতুকের জন্যই, জগতে চিরদিন সমস্রোতে প্রবাহিত হোক, তোমার তৃপ্তিতে মর্ত্ত্য-জীবের জীবনমরণ গৌরবে ধন্য হোক। কিন্তু ক্ষমা কর দয়াময়, একান্ত পরিশ্রান্তকে এবার চির বিশ্রামের আশীর্ব্বাদে অমর করিয়া দাও।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বৈকালের বেলা পড়িয়া গিয়াছে। মায়া সন্ধ্যারতির দ্রব্যসম্ভার যথাযথভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া, নামের মালা লইয়া সেইমাত্র মন্দিরের ভিতর বিগ্রহের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া মালা ফিরাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় বাহির হইতে ব্যগ্র উচ্চকণ্ঠে পরিচিত স্বরে কে ডাকিল, "মা আছেন, এখানে মা আছেন ? মা—"

এই অপ্রত্যাশিত আহ্বানে মায়া সহসা গভীর প্রীতি আনন্দের সহিত কিছু বিস্ময় বোধ করিল, এ যে মদনের কণ্ঠস্বর ! মায়া দ্বার-সম্মুখে আসিয়া স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এস বাবা এস, অনেকদিনের পর ! কেমন আছ বাবা ?"

"ভাল" বলিয়া মায়ার পানে চাহিয়া মদনের কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া গেল। কাশিয়া জড়িত স্বর পরিষ্কার করিয়া মদন বলিল, "নেমে আসুন মা, প্রণাম করব।"

মৃদু আপত্তিব্যঞ্জক স্বরে মায়া বলিল, "দেবালয় ?"

মদন বলিল, "হানি কি ? আমি যে ধূলো পায়েই আপনাকে খুঁজতে গেছলুম, তারপর বাড়ী থেকে এখানে ফিরে আসছি।"

এত বড় আগ্রহ প্রত্যাখ্যাত করা মায়ার শক্তিতে অসাধ্য, দ্বিরুক্তি না করিয়া সে মন্দির সোপান বাহিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। মদন প্রণাম করিয়া অশ্রু ছল্ ছল্ নয়নে ম্লানভাবে বলিল, "দেহটা কি করে ফেলেছেন মা, এত কৃশ ! আপনার দিকে যে চাইতে পাচ্ছিনে,

মাথার চুলগুলা শুদ্ধ ছেঁটে ফেলেছেন, আপনার মুখ দেখে যে আমার সেই মা বলে মোটেই চিন্‌তে পাচ্ছিনে! এ কি করেছেন?"

শান্ত মৃদু হাস্যের সহিত মায়া উত্তর দিল, "বাইরের বেশের দৈন্যই শুধু 'বড়' করে দেখ্‌বো বাবা?"

মদন বলিল, "সন্তানের দৃষ্টিতে সেই দৃশ্যই বড় ক্লেশদায়ক মা—"

বাধা দিয়া মায়া বলিল, "ও কথা যেতে দাও, তুমি সুন্দর-মঠে কেমন ছিলে এতদিন, তাই বল। সেখানে মহারাজ ভাল আছেন ত? দেবকী-নন্দন ঠাকুরের কন্যা 'কিশোরী' মহারাজের কাছে কেমন আছে বল?"

মদন মৃদুস্বরে বলিল, "ভালই আছেন, তাঁরা সকলে আজ এখানে এলেন যে।"

"তোমার সঙ্গেই? মহারাজ শুদ্ধ?"

"হাঁ।"

"কোথায় রয়েছেন তাঁরা?"

"বাইরে থেকে মন্দির প্রণাম করে মহারাজ কাছারী মহলে গেছেন। সমাগত সম্ভ্রান্ত লোকজনদের সঙ্গে দেখা শুনা কর্‌ছেন, আমি মাঝখান থেকে পালিয়ে এসেছি।"

মায়া হাসিল। মদন হাসিয়া বলিল, "শান্তি মাসিমাকে প্রণাম করে, খোকার—অর্থাৎ মুক্তির সঙ্গে দেখা করে এলুম। কি দুরন্তই হয়েছে মা! আমাকে ঝক্ মানিয়ে দিলে, আর দিনকতক পরে, লোকে তাকে দেখ্‌লেই মদনের ভাই বলে বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

মায়া স্মিত বদনে বলিল, "তা পারুক, কিন্তু আর কতদিন এমন বম্ বম্ করে বেড়াবে বল দেখি, এইবার সংসারের কাজে এগুলে ভাল হয় না?"

মদন নম্র হাস্যে বলিল, "আপনারা পেছুতে দিলেন কৈ? মহারাজ ত সেইজন্যই কাণ ধরে টেনে আন্‌লেন।"

মায়া সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি বিয়ে কর্‌তে এসেছ? কোথায় বিয়ে কর্‌বে?"

"আপনাদের এই মঠে।"

"মঠে? কার সঙ্গে?"

"দুঃখের কথা আর কেন বলেন মা, মহারাজের ঘটকালী বুদ্ধিটা বড় সুবিধে নয়। তিনি দেবকীনন্দন ঠাকুরের জামাই হবার উপযুক্ত লোক ব্রহ্মাণ্ডে খুঁজে পেলেন না, আমি নিরীহ প্রাণী একপাশে পড়ে আছি দেখে আমাকেই গিয়ে পাকড়াও কর্‌লেন।"

সানন্দে মায়া বলিল, "মহারাজের জয় জয়কার হোক, তাঁর বুদ্ধি বিবেচনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, বড় সুসংবাদ শুনিয়েছ বাবা! আমি নিশ্চিন্ত হলুম, তুমি এবার মঠের অধিকারী হবে।"

মদন বলিল, "না মা, অত বড় যোগ্যতা আমার নাই, সে আমি মহারাজের সঙ্গে চুক্তি করে এসেছি। মহারাজের এক সু-পণ্ডিত ব্রহ্মচারী শিষ্য মঠের অধিকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সম্প্রদায়ের কল্যাণসাধন কর্‌বেন, আমি তাঁর অধীনস্থ উপদেশার্থী হয়ে থাক্‌ব। আমি শুধু বৈষয়িক ব্যাপারের শৃঙ্খলার জন্য দায়ী রইলুম—শুধু ওকালতী বুদ্ধি খরচ করা ছাড়া মঙ্গল-মঠের কাজে আমার কোন কর্ত্তৃত্ব থাকবে না, যা কর্‌বার সব তিনি কর্‌বেন।"

মায়া বলিল, "কর্ম্ম কর্ত্তা যিনিই হোন, কিন্তু সত্বাধিকারী ত তুমি-ই?"

মদন হাসিয়া বলিল, "আপনাদের আশীর্ব্বাদে, অগত্যা।"

ক্ষণপরে মদন সহসা বলিল, "ভাল কথা, খবরটা শুনে অবধি, আমার মন ক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে। আপনার সঙ্গে ঝগড়া করব বলে, দুষ্ট বুদ্ধিকে শাণিয়ে ছুটে আস্‌ছিলুম্, কিন্তু আপনাকে প্রণাম করেই সব ভুলে গেছি।"

মায়া বলিল, "কি কথা বাবা ?"

মদন ক্ষুণ্ণ-করুণ কণ্ঠে বলিল, "মঠের এই কাজটা নেওয়া কি ভাল হয়েছে মা ?"

মায়া সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না। একটু থামিয়া, খুব শান্ত ধীর কণ্ঠে বলিল, "তোমরা যেদিক থেকে এর ভালমন্দ বিচার কর্‌ছ, আমি সে দিকে চোখ রেখে এ কাজে আসিনি বাবা। গৌণ আয়োজন, মুখ্য সাধনের সহায়ক বলে-ই আমি জোর করে দেবালয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়েছি, এখন এই কাজেই আত্মনিয়োগ করে, আমি সমস্ত তৃপ্তি, সমস্ত শান্তিকে খুঁজে পাচ্ছি। এখন দিনে দিনে বুঝ্‌তে পার্‌ছি—খুব ভাল করেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি বাবা, কাজের পথে উঁচু নীচু বল্‌তে কিছু ভেদ নাই, উর্দ্ধে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যাওয়াই শুধু আমাদের কর্ত্তব্য, তা হলে পথই পথের সন্ধান দেখিয়ে দেয়।"

চমৎকৃত মদন নির্ব্বাক্ হইয়া গেল ! তাহার চোখে অশ্রু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। শ্রদ্ধানত শিরে মায়ার পদপ্রান্তে মাথা নোয়াইয়া দুইহাতে সে পায়ের ধূলো তুলিয়া মাথায় দিল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কলেজে পড়েছি, পাশ করেছি, অনেক ভাব, অনেক ভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, সমাজে বিদ্বান বলে পরিচিত হয়েছি—কিন্তু

কিছুই শিখিনি মা, কিছুই শিখিনি! সে শিক্ষা শুধু মনকে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করেছে মাত্র, কিন্তু যে সাধনা হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে, প্রাণকে উজ্জ্বল করে, তার আগুন শুধু আপনাদের মধ্যেই প্রদীপ্ত দেখি। থাক, এর ওপর একটি কথাও উচ্চারণ কর্‌বার ক্ষমতা আমার নাই, তবে যোড় হাত করে একটি ভিক্ষা চাইছি মা, অনুরোধটা রাখ্‌তেই হবে।"

মায়া মন্দিরে বিগ্রহের পানে দৃষ্টি স্থির বদ্ধ রাখিয়া বলিল, "মদন তুমি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত, আজ বাদে কাল রাজরাজেশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত হবে, তোমার সামাজিকমর্য্যাদা ভুলে যেও না। সংসারের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় দগ্ধ ভস্মীভূত—সন্তান পালনের জন্য পরানুগ্রহপ্রত্যাশী দীন-ভিখারিণীর সঙ্গে কথা কইছ, সেটা স্মরণ রেখো বাবা।"

মনস্তাপ পীড়িত স্বরে মদন বলিল, "মুমূর্ষুর অন্তিম শয্যায় সত্য সাক্ষ্য করে, যাঁদের ধর্ম্ম-মাতা বলে, ধর্ম্ম-ভ্রাতা বলে স্বীকার করেছি, আজ অবস্থা পরিবর্ত্তনে সামাজিক মর্য্যাদার দোহাই দিয়ে সত্য সম্পর্ক অস্বীকার কর্‌তে বলেন?"

মায়া ধীর কণ্ঠে বলিল, "সম্পর্ক আমি অস্বীকার কর্‌তে বল্‌ছিনে।"

"তবে, সম্পর্কের দায়িত্ব মর্য্যাদা অস্বীকার কর্‌তে বলেন? তা হলে আমি যে ধর্ম্মে পতিত হব মা, আমার শিশু ভ্রাতার ওপর বিধবা মাতার ওপর আমার যা কর্ত্তব্য আছে, আমি তা অবশ্য প্রতিপালন কর্‌তে বাধ্য বৈ কি। না, আমি আপনার স্বচ্ছন্দ সাধনার ব্যাঘাত কর্‌তে চাইনে, যেমন আছেন তেমনি থাকুন, তবে এইবার থেকে আমার মুখ চেয়ে একটু প্রকার ভেদের কষ্ট সহ্য কর্‌তে হবে, এইটুকু নিবেদন।"

প্রশান্ত দৃষ্টি তুলিয়া মায়া বলিল, "তুমি কি বল্‌তে চাও বুঝেছি,

অক্ষম শিশুর দরিদ্রা জননীকে তুমি সক্ষম সন্তানের—রাজরাজেশ্বরের মাতৃত্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে চাও। কিন্তু না বাবা, তা হতে পারে না, আমার অন্তরের গৌরবকে আন্তরিক তৃপ্তিতে ধন্য হতে দাও, বাইরের গর্ব্ব আস্ফালন প্রকাশ চেষ্টায় তাকে হতশ্রী কোর না, আমার স্বাচ্ছন্দ্য হানি কোর না, ভগবান দয়া করে আমায় যে অবস্থায় রেখেছেন এই অবস্থাই আমার পক্ষে সহজ, সরল ও সত্য। এই অবস্থা আমি সন্তুষ্টচিত্তে শিরোধার্য্য করে নিয়েছি, আমায় প্রলোভনে বিচলিত করো না। আমি মদনের মা, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট—লঙ্কেশ্বরের মা হওয়া আমার পক্ষে বিড়ম্বনা। তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি বাবা, আমার মনকে দ্বিধায় কুণ্ঠায় অশান্ত করে তুলো না, আমি বেশ আছি—এইটুকু জেনে নিশ্চিন্ত হও।"

মদন অধোবদনে নিরুত্তর হইয়া রহিল। মানুষের মুখের কথা মৌখিক তর্কে উড়াইয়া দেওয়া সহজ, কিন্তু হৃদয়ের দৃঢ়তা যেখানে মূর্ত্তিমান হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে মুখের কথা সম্পূর্ণই অচল!

মদন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বুঝিয়া মায়াও মনে দুঃখিত হইল, কিন্তু স্নেহের মুখ চাহিয়া অন্যায়ের সমর্থন করা যায় না। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া মায়া সান্ত্বনা-কোমল কণ্ঠে বলিল, "কিছু মনে করো না মদন, তোমার আত্মীয়তা, আমার জীবনের মূল্যবান সম্পদ, কিন্তু তাই বলে অনর্থক কলগ্রহ হয়ে নিজে অস্বস্তিভোগ কর্‌তে চাইনে। যখন শক্তি যাবে, তখন সকলের আগে তোমারই সাহায্যপ্রার্থী হব, এটা নিশ্চয় জেনো, কিন্তু—এখন অপাত্রে দয়া দান ক'র না, এই আমার অনুরোধ।"

বৃদ্ধ ভাণ্ডারী-জী কার্য্যব্যপদেশে সেইদিকে আসিতেছিলেন, মায়াকে

একজন অপরিচিত যুবার সহিত কথা কহিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া দূরে দাঁড়াইলেন। মায়া হাস্যোজ্জ্বল বদনে তাঁহাকে ডাকিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আসুন ভাণ্ডারী-জী, সু-সংবাদ শুনে যান, সুন্দর-মঠের মোহন্ত মহারাজ বরকন্যা নিয়ে শুভ বিবাহ সম্পাদন করাতে এসেছেন, ইনিই আমাদের মঠের ভাবী জামাতা—এঁর নাম মদনানন্দ ভট্ট।"

ভাণ্ডারী অধিকতর বিস্মিত হইয়া একবার মায়ার মুখ পানে একবার মদনের মুখপানে তাকাইলেন, মায়ার কথার অর্থ তিনি যেন ভাল বুঝিলেন না। মোহন্ত মহারাজের অপ্রত্যাশিত আগমনে বাহির-মহলে খুব হুলস্থুল পড়িয়া গেলেও ভিতর মহলের কর্ম্মব্যস্ত কর্ম্মচারী কয়জন এখনো সে সংবাজ জানিতে পারে নাই। ভাণ্ডারীকে ইতস্ততঃ-পরায়ণ দেখিয়া মায়া প্রসন্ন-স্মিত বদনে বলিল, "ইনি আপনাদের মঠের জামাই হলেও আমার সঙ্গে এঁর আলাদা সম্পর্ক আছে, ইতিপূর্ব্বে ইনি আমায় 'মা' বলে ধন্য করেছেন তাই তাড়াতাড়ি আগে আমায় দেখা দিতে এসেছেন।"

ভাণ্ডারী অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। দেখিতে দেখিতে একে একে অনেক লোক জুটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাহির মহল হইতে সংবাদ লইয়া দূত আসিল, সকলে ব্যস্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, চারিদিকে হাঁকডাক সোর-গোল জমিয়া গেল। সন্ধ্যারতির সময় হইয়া আসিতেছে দেখিয়া মদন অন্যান্য কথার পর মায়ার নিকট বিদায় লইয়া মহারাজের সন্ধানে চলিয়া গেল। মায়া মন্দিরের দীপ জ্বালিয়া, সন্ধ্যারতির প্রতীক্ষায় একপাশে বসিয়া মালা জপ করিতে লাগিল। উজ্জ্বল দীপালোক সম্মুখে স্বর্ণ সিংহাসনে, কৃষ্ণমর্ম্মর নির্ম্মিত সুচিক্কন

সুন্দর, সলজ্জ গোপাল-বিগ্রহ, নির্ব্বিকার হাস্য প্রসন্ন বদনে বিরাজ করিতে লাগিলেন। মায়া শান্ত নিশ্চিন্ত দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। আরতি দর্শনার্থীগণ নগ্নপদে একে একে আসিয়া, সংযত গম্ভীরভাবে মন্দির-প্রাঙ্গনে সমবেত হইতে লাগিল। কিছু পরে কয়েকজন অনুচরের সহিত মহারাজা আসিয়া প্রাঙ্গনে দাঁড়াইলেন, সকলে অভিবাদন করিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। কেবলরাম তাঁহাদের সহিত আসিয়াছিল, সে মন্দির প্রাঙ্গনে সকলকে পৌঁছাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্থানোন্মুখ হইল, কারণ আরতির সময় পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় ব্যবহার-ই প্রচলিত বিধি।

মহারাজের অনুচরবর্গের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া কেবলকে নমস্কার করিয়া বলিল, "আমি সদ্যঃস্নাত, যদি অনুমতি করেন, আমিই তাহলে, সন্ধ্যারতি করি।"

কেবলরাম সসৌজন্যে বলিল, "স্বচ্ছন্দে, আহ্লাদের সহিত এ প্রস্তাব অভিনন্দন কর্‌ছি।"

তাহাদের কথা মহারাজের কানে পৌঁছিল। তিনি বলিলেন, "কেও নিরঞ্জন, আরতি কর্‌তে চাও? যাও, কিন্তু তোমার উত্তরীয়?"

নিরঞ্জন মন্দির সোপানে উঠিতে উদ্যত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "মহারাজ আমি স্নানের পর কৌপীন ও বহির্ব্বাস গ্রহণ করে আরতি দর্শনের উদ্দেশ্যে এসেছি, উত্তরীয় আনি নাই।"

"আমার উত্তরীয় নিয়ে যাও—" মহারাজ স্কন্ধ-বিলম্বী রেশমী উত্তরীয় খুলিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া নিরঞ্জনের দিকে ছুড়িয়া দিলেন। নিরঞ্জন

ক্ষিপ্রহস্তে ধরিয়া ফেলিয়া, মাথায় ঠেকাইয়া নতজানু হইয়া সেইখান হইতে অভিবাদন করিল। তারপর বক্ষ পৃষ্ঠ আচ্ছাদন করিয়া বাহুর নিম্ন দিয়া উত্তরীয়ের উভয় প্রান্ত একত্র করিয়া বুকের উপর টানিয়া ফাঁশ দিয়া বাঁধিল। মন্দিরের দ্বারে মাথা নোয়াইয়া ভিতরে ঢুকিয়া আরতি কার্য্য আরম্ভ করিল, সমস্ত উপকরণ নিভু‌র্লভাবে পাশাপাশি সজ্জিত ছিল—কিছু খুঁজিতে হইল না।

মন্দিরের কোণে স্তম্ভগাত্রে ঠেস দিয়া মালাজপনিরতা মায়া বাহিরের কথাবার্ত্তা শব্দ কিছু কিছু শুনিয়াছিল, সকলের শেষে মহারাজের কথাটা খুব স্পষ্ট, খুব তীব্র ভাবে শুনিল—"কেও নিরঞ্জন।"

নূতন পুরোহিত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সংযত গাম্ভীর্য্যে ধীর ভাবে আপন কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। সকল আয়োজনই সজ্জিত ছিল, সুতরাং অভাবের জন্য তাঁহাকে কোন কিছু অন্বেষণ করিতে হইল না, তিনি কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। নিস্পন্দ জড় ভাবে—আর একজন মনুষ্যও যে সেই মন্দিরে রহিয়াছে, তাহার অস্তিত্বও তিনি জানিলেন না।

আরতি শেষ হইল, বাদ্যধ্বনি থামিয়া গেল। পূজারী শঙ্খঘণ্টা নামাইয়া, গভীর উদাত্ত স্বরে—যেন আভ্যন্তরিক স্বর-যন্ত্রের প্রাণ-মূলকে পর্য্যন্ত পবিত্রত্বের ভাব-সৌরভে পূত সংস্কৃত করিয়া গম্ভীর মধুর ধ্বনিতে প্রণাম মন্ত্র বলিতে বলিতে মন্দিরের বাহিরে প্রণাম করিতে গেলেন। মন্দির নিস্তব্ধ হইল। মন্দিরে রহিলেন শুধু, প্রসন্ন শোভা সৌন্দর্য্যে পরিস্নাত অপরূপকান্তি পাষাণ বিগ্রহ—আর ততোধিক রূঢ় কঠিনতার মধ্যে আত্মসমাহিত, এক স্থির নিস্পন্দ নারীমূর্ত্তি!

বাহিরে বিচিত্র কণ্ঠের বহুবিধ স্তব-স্তোত্র প্রণাম মন্ত্রের মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক ভজন গান আরম্ভ হইল। মায়া আজ ভজন শুনিতে বাহিরে আসিল না, অন্যতম পূজক দেবানন্দ ঠাকুর প্রাত্যহিক প্রথানুসারে স্নান-জল চরণ-তুলসী লইয়া দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দের মধ্যে পরিবেশন করিলেন। মায়া সেখানেও গেল না, যেখানে বসিয়াছিল সেইখানেই বসিয়া রহিল—এক চুল নড়িল না।

অনেকক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া মায়া দেবানন্দ পূজারীকে ডাকিয়া বলিল, "বাবা, আমায় চরণ-তুলসী দাও।"

পূজারী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন মা? দেখ্‌তে পাইনি।"

"মন্দিরেই—" বলিয়া মায়া সহসা থামিল। একটু কাশিয়া ধীর স্বরে বলিল, "কাজে ব্যস্ত ছিলুম।"

পূজারী তখনই চরণ-তুলসী আনিয়া দিলেন। যথারীতি গ্রহণ করিয়া প্রণামান্তে মায়া উঠানে নামিয়া আসিল। তখন ভজন গান থামিয়া গিয়াছে, দর্শনার্থীর দল সকলে বিদায় লইয়াছে, উঠানে কেহ কোথাও নাই, শুধু নাট-মন্দিরের সম্মুখে খিলানের গাত্র অবলম্বী 'সেজে'র আলোকে বসিয়া তিন ব্যক্তি সংযত গম্ভীর ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। মায়া দূর হইতে দেখিয়া চিনিল, মদন ও কেবল; তৃতীয় ব্যক্তি কে চিনিতে পারিল না। তিনি সেজের ঠিক সম্মুখে বসিয়াছিলেন, তাঁহার পেশীপুষ্ট বলিষ্ঠ বিশাল সুন্দর মহিমোজ্জ্বল আকৃতি খুব স্পষ্ট পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। তিনি তর্জ্জনী উঁচাইয়া পার্শ্বোপবিষ্ট মদনের উদ্দেশ্যে কি বলিতেছিলেন, মদন বিনীতভাবে

নীরব মনোযোগে শুনিতেছিল কেবলরাম অন্য পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

মায়া মোহন্ত মহারাজকে কখনো দেখে নাই, তাহার সন্দেহ হইল বুঝি ইনিই তিনি! প্রণাম করিবার জন্য অগ্রসর হইল, নিঃশব্দে নিকটস্থ হইয়া, কণ্ঠস্বর ভাল করিয়া শুনিয়া, সহসা চমকিয়া সে স্তম্ভের ছায়া অন্ধকারে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ওহো হো! এই তেজস্বী গম্ভীর কণ্ঠধ্বনির সহিত—সুদূর অতীতের সেই স্বল্প পরিচয়ে তীব্র পরিচিত—তরুণ কণ্ঠের নম্র-কোমল-ধ্বনির কোন অসামঞ্জস্য নাই যে! সেই কণ্ঠ, স্বরে শুধু—উচ্চারণে শুধু, দৃপ্ত দৃঢ়তা মাহাত্ম্য বিস্ফুরিত হইতেছে মাত্র! কি কথার উত্তরে ঠিক বলা যায় না, বুঝি সদ্যঃবিবাহার্থী, সংসার প্রবেশোদ্যত অনভিজ্ঞ সরল যুবা মদনের প্রতি তিনি উপদেশ দিতেছেন, —"নারী দেবীর জাতি! কল্পনা নয়, কাহিনী নয়, বাস্তব সত্য! আমি নিজের অভিজ্ঞতায় জোরের ওপর বল্‌ছি, নারীত্বের মধ্যে আত্মবোধ যেখানে জাগ্রত হয়েছে, দেবীত্বের বিকাশ সেখানে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখ্‌বে! শুধু—লঘুভাবে কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য এই মহত্ত্বকে দু' চক্ষু মেলে যথেচ্ছাচারের ওপর দেখ্‌তে চেওনা, বুঝ্‌তে যেওনা, তা'হলে নিরাশ হবে, ভুল করবে। আমি স্পষ্টভাবে এখানে মনের ভাষা ব্যক্ত কর্‌বার শক্তি সাহস পাইনি অকপটে স্বীকার কর্‌ছি, তবুও আন্তরিক শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে স্বীকার কর্‌তে কুণ্ঠিত হব না। আমি দেখেছি, জেনেছি, এঁদের মধ্যেই দেবীর সৌন্দর্য্য আছে। সতর্ক হও, এঁদের দেবীত্ব উদ্বোধনে সহায়তা কর, দেখ্‌বে এঁরাই বিষ্ণু-গৃহিণী লক্ষ্মীর মূর্ত্তি ধরে পূর্ণশক্তি-গৌরবে সংসার পালয়িত্রী-পদে প্রতিষ্ঠিত হবেন। নির্দ্দয়-লালসা

চড়ুইয়ের মত ক্ষুদ্র প্রাণ নিয়ে ততোধিক সংকীর্ণতর ঘৃণিত ভোগ তৃষ্ণায় পশুত্ব আশ্রয় ক'রে—এই মহামহিমার দিকে হীনদৃষ্টিতে তাকিও না, এ মর্য্যাদার অপমান কোর না, নিজেদের প্রাণ-শক্তিকে ধ্বংস কোর না। সংহত-তেজস্বী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হও, সিংহের পৃষ্ঠে ভগবতীর আসন, এটা মুর্খের পরিকল্পনা নয়—এর ভিতর জ্বলন্ত সত্য নিহিত আছে; খোঁজ, আবিষ্কার কর, সিদ্ধি সাফল্য সবই করায়ত্ত হবে।"

নিঃশব্দে মায়ার অধরে সকরুণ বেদনার হাসি ফুটিয়া উঠিল। অজ্ঞাতে —সম্পূর্ণ নীরবে একটা অতি ক্ষীণ, দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, হায়! এত দিন পরে, এতদূরে আসিয়া আজ এ সংবাদ শুনিতে হইল! কিন্তু থাক্— বুকের ভিতর যত বড় তীব্র উন্মাদনায় কম্পন-স্রোতে চলুক, কিন্তু তাহার পথ আজ ভিন্নমুখে! তাহার দুর্জ্জয় উন্মাদ স্রোত, সে আজ মহাসাগরের দিকে সুনিশ্চিতরূপে ফিরাইয়া দিয়াছে। আজ নারীত্বের গণ্ডিতে নিজেকে পূরিয়া এই সু-উচ্চ জাতীয় সম্মানকে গ্রহণ করিয়া, ব্যক্তিগত সত্যনিষ্ঠার চরণে কৃতজ্ঞতা-ভারে, মোহ-গৌরবের মূল্যে আপনাকে বিকাইয়া দিতে পারিবে না! আজ তাহার মধ্যে জাতীয়ত্ব নাই, নারীত্ব নাই, পৃথিবীর মানুষের জন্য কিছুই অবশিষ্ট নাই! পৃথিবীর সহিত, পৃথিবীর মানুষের সহিত আজ তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

থাক্—নীচাশয় জগতের অতৃপ্ত স্বার্থ বাসনা। তুমি তোমার স্বভাবসিদ্ধ ঈর্ষাদ্বেষের ভ্রূকুটি পীড়ন লইয়া দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে আপনার মনে আপনি মাথা খুঁড়িয়া মর, আজ তোমাকে চাহিয়া দেখিবার অবসর তাহার নাই! চিরদিন ভয়ের মূর্ত্তিটাই সে বড় করিয়া দেখিয়াছে।

আজ সদ্যঃলব্ধ শক্তি বলে সে নিঃশঙ্ক সতেজ হইয়া, পূর্ণ সাহসের মূর্ত্তিটা কত বিরাট, কত সুন্দর, তাহা দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া লইবে, আজ নিজের ক্ষুদ্রতার পানে চাহিয়া সে কুণ্ঠিত হইয়া পিছাইবে না।

মায়া অগ্রসর হইল। কেবলরাম তাহাকে দেখিতে পাইয়া প্রশ্ন করিল, "কে মায়া?"

"হাঁ—" খুব সহজ উত্তর! মুক্ত দীপালোকের মধ্যে নিরাভরণা, শুভ্রবসনা, ক্ষীণাঙ্গী বিধবা যুবতী, অসঙ্কোচে সকলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কোনখানে এতটুকু শঙ্কা নাই, কুণ্ঠা নাই, দ্বিধা নাই, দৈন্য মলিনতা নাই—সে যেন দৃপ্ত মহিমার মধ্যে সম্পূর্ণ নির্ম্মল ভাস্বর! অপূর্ব্ব শক্তি-শ্রীমণ্ডিতা গরীমাময়ী দেবী!

সম্মুখেই নিরঞ্জন উপবিষ্ট। তাহার পরিধানে কৌপীন বহির্ব্বাস, দেহ অনাবৃত, মহারাজের সেই উত্তরীয় এখন তাহার বক্ষবন্ধন মুক্ত হইয়া স্কন্ধের উপর শ্লথ-বিলম্বমান; তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত। মায়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, হাঁ ইনি নিরঞ্জনই বটে! কিন্তু ইনি সেই আট বৎসর পূর্ব্বের প্রবল-হৃদয়াবেগে আত্মহারা সৌন্দর্য্যসাধক, তরুণ কোমল কান্তি নিরঞ্জন ভাস্কর নহেন—ইনি এখন সুদৃঢ় সাধন-শক্তি-প্রভাবে পূর্ণ পরিণত আকৃতি বলিষ্ঠ ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন! ইহার সংযম-শক্তি স্ফীত সুবিশাল বক্ষে শৌর্য্যমহিমা, নয়নে প্রশান্ত করুণা, ললাটে মহত্ত্ব-গরিমা, অধরে তেজস্বী দৃঢ়তা নির্ভীক স্থৈর্য্যে বিরাজমান, সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ গরীমায় ব্রহ্মচর্য্য জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত! মায়া সসম্ভ্রমে প্রণত হইল, মহত্তর শ্রদ্ধার চরণে মহত্তর সম্মান-অর্ঘ্য নিবেদন করিল।

প্রণতার প্রণাম গ্রহণের জন্য প্রণম্য সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন,

আমায় যে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, সে পথের ত্রিসীমানায় ভুল তিষ্ঠাতে পারে না—এটা খাটি সত্য।"

মায়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আত্মসম্বরণ করিয়া খুব সহজভাবে একটু হাসিয়া তরল কণ্ঠে বলিল, "অত কথায় কাজ নাই, মোটামুটি এইটুকু বল্‌তে চাই, আমার দিদিমাও পিতৃমাতৃহীনা দৌহিত্রীর জীবনের সদ্গতির জন্য ঐ দেবালয়ে ঐ কাজ করে গেছেন। তবে আমি কেন আমার অপোগণ্ড শিশুর ভবিষ্যত কল্যাণের জন্য ঐ দেবালয়ে কাজ করতে পারব না? বিশেষ, সুযোগ যখন রয়েছে, তখন একাজে অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য নয় কি?"

মায়া চলিয়া গেল। কেবলরাম ও শান্তিদেবী অনেকক্ষণ ধরিয়া মায়ার প্রস্তাবের অনুকূলে ও প্রতিকূলে অনেক ভালমন্দের সম্ভাবনা লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোচনা করিলেন। তারপর উভয়ে একমত হইয়া, মায়ার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। পরদিন কেবল মায়াকে মঠের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিল।

দেওয়ান দেবলচাঁদের হস্তে মঠের বৈসয়িক ব্যাপারের সমস্ত ক্ষমতা থাকিলেও দেবালয় সংক্রান্ত কোন বিষয়ের সহিত তাহার সংশ্রব ছিল না। পুরাতন পুরোহিত শ্যামসুন্দর পণ্ডিত এখন পরলোকে, কেবলরাম তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং দেবালয়সম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারে কেবলরামই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা। তাহার কঠোর শাসন ও সতর্ক দৃষ্টিতে এখন দেবালয়ের সকল কাজই খুব সুশৃঙ্খলে চলে, সেবকগণ সকলেই শিষ্ট-সংযতভাবে কর্ত্তব্যপালন করে। কেবল পূর্ব্ব হইতে সকলকে ভালরূপে চিনিয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং এখন প্রভু হইয়া সে

সকলের সম্বন্ধেই যথোচিত সতর্ক হইয়া, কাজ আদায় করে; সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা শাসিত হইয়া দেবালয় এখন যথার্থই দেবালয়ে পরিণত হইয়াছে।

দেবালয়ের অনেক পুরাতন লোক চলিয়া গেলেও, মায়া দেখিল এখনও বৃদ্ধ ভাণ্ডারী-জী দেবালয়ে আছেন। মায়ার জীবনের বিসদৃশ অবস্থা পরিবর্ত্তনের সংবাদ, বৃদ্ধের সরল স্নেহশীল হৃদয়ে বড় বেদনার সহিত গভীর সম্ভ্রমের ভাব জাগাইয়া দিল। বৃদ্ধ নিজের ব্যবহারে ত ত্রুটি রাখিল না, উপরন্তু তীক্ষ্ণ সতর্কতায় মায়ার উচ্চ সম্মানের দ্বারে সে যেন প্রহরী হইয়া বসিল। তাহার ইঙ্গিতে দেবালয়ের ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেই এই ভাগ্যপীড়িতা ভদ্র-গৃহস্থ যুবতীকে যথোচিত শিষ্ট-মর্য্যাদাপূর্ণ ব্যবহারে সম্ভ্রম দেখাইয়া চলিত। মায়া যতক্ষণ দেবালয়ের কাজে নিযুক্ত থাকিত, ততক্ষণ সকলেই পূর্ণমাত্রায় শান্ত, সংযত ও নম্র হইয়া থাকিত। মায়া অবাধ শান্তিতে প্রসন্ন হৃদয়ে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইত।

মায়ার দিন-রাত্রিগুলা দিনে দিনে নব নব তৃপ্তি-আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। পিছনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তটা, সে যেন স্বপ্ন-বিস্মৃতির অন্ধকারে সজোরে নিক্ষেপ করিয়া তীব্র আকাঙ্খায় ব্যাকুল আগ্রহে, তৃষিত উৎসুক হৃদয় লইয়া বাঞ্ছিত পথে ছুটিয়া চলিল। চতুষ্পার্শ্বের ঘটনা-তরঙ্গ বলিষ্ঠ বাহুর ক্ষিপ্র-কৌশল সঞ্চালনে সজোরে ঠেলিয়া মুক্ত বাতাসের উপর মাথা উঁচাইয়া নির্ভীক নিশ্বাসে প্রাণশক্তি সংগ্রহ করিয়া, সে যেন স্রোতের মুখে উজানে ভাসিয়া চলিল। এক এক সময় গভীরতম শান্তি আনন্দের মধ্যে হর্ষবিহ্বল হইয়া সে ভাবিত,

তাহার এত শক্তি এতদিন কেবল দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে, কোন মহাসুপ্তির মধ্যে মগ্ন হইয়াছিল? সে যে ইহার অস্তিত্ব এক মুহূর্ত্তের জন্যও জানিতে পারে নাই! মঙ্গলময় বুঝি দয়া করিয়া তাহাকে এই নির্ভুল সন্তরণ-কৌশল শিখাইবার জন্যই, নির্দ্দয়ের মত তত বড় ভুলের মধ্যে ডুবাইয়াছিলেন। না ডুবিলে বুঝি এই সাঁতার শিক্ষা হইত না।

মায়ার কৃতজ্ঞ ভক্তিভার-নম্র হৃদয় একান্ত আত্মনিবেদনের মধ্যে আত্মহারা হইয়া উঠিত। নারায়ণ, তোমার বিরাট রহস্য কৌতুক-লীলা মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য! মানুষ কি বুঝিবে, তুমি কাহাকে গড়িবার জন্য কাহাকে ভাঙ্গিতেছ! কোন বোধ-উদ্বোধনের জন্য কত বড় ভ্রান্তি-রহস্য রচনা করিতেছ! দুর্ভাগিনী মায়া, জীবনের সব চেয়ে বড় সৌভাগ্য, সার্থকতার মুহূর্ত্তে অন্তরের সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, ব্যর্থতা অনুভব করিয়া, ক্ষুব্ধ বেদনায় আত্মগ্লানিতে জর্জ্জর হইয়াছিল। আর আজ, জীবনের চরম ব্যর্থতার অঙ্কে উপস্থিত হইয়া, অন্তরের পরম সার্থকতা খুঁজিয়া পাইল। এ কি আশ্চর্য্য তোমার করুণা, দীনবন্ধু! সে আজ বুঝিতে পারিতেছে, মানবজীবনের সব চেয়ে বড় ব্যর্থতাই সব চেয়ে বড় সার্থকতার সংবাদ বহন করিয়া আনে। হে কৌতুক-কুশল দেবতা, তোমার কৌতুক-লীলা তোমার কৌতুকের জন্যই, জগতে চিরদিন সমস্রোতে প্রবাহিত হোক, তোমার তৃপ্তিতে মর্ত্ত্য-জীবের জীবনমরণ গৌরবে ধন্য হোক। কিন্তু ক্ষমা কর দয়াময়, একান্ত পরিশ্রান্তকে এবার চির বিশ্রামের আশীর্ব্বাদে অমর করিয়া দাও।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বৈকালের বেলা পড়িয়া গিয়াছে। মায়া সন্ধ্যারতির দ্রব্যসম্ভার যথাযথভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া, নামের মালা লইয়া সেইমাত্র মন্দিরের ভিতর বিগ্রহের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া মালা ফিরাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় বাহির হইতে ব্যগ্র উচ্চকণ্ঠে পরিচিত স্বরে কে ডাকিল, "মা আছেন, এখানে মা আছেন? মা—"

এই অপ্রত্যাশিত আহ্বানে মায়া সহসা গভীর প্রীতি আনন্দের সহিত কিছু বিস্ময় বোধ করিল, এ যে মদনের কণ্ঠস্বর! মায়া দ্বার-সম্মুখে আসিয়া স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এস বাবা এস, অনেকদিনের পর! কেমন আছ বাবা?"

"ভাল" বলিয়া মায়ার পানে চাহিয়া মদনের কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া গেল। কাশিয়া জড়িত স্বর পরিষ্কার করিয়া মদন বলিল, "নেমে আস্থন মা, প্রণাম করব।"

মৃদু আপত্তিব্যঞ্জক স্বরে মায়া বলিল, "দেবালয়?"

মদন বলিল, "হানি কি? আমি যে ধূলো পায়েই আপনাকে খুঁজতে গেছলুম, তারপর বাড়ী থেকে এখানে ফিরে আসছি।"

এত বড় আগ্রহ প্রত্যাখ্যাত করা মায়ার শক্তিতে অসাধ্য, দ্বিরুক্তি না করিয়া সে মন্দির সোপান বাহিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। মদন প্রণাম করিয়া অশ্রু ছল্ ছল্ নয়নে ম্লানভাব বলিল, "দেহটা কি করে ফেলেছেন মা, এত কৃশ! আপনার দিকে যে চাইতে পাচ্ছিনে,

মাথার চুলগুলা শুদ্ধ ছেঁটে ফেলেছেন, আপনার মুখ দেখে যে আমার সেই মা বলে মোটেই চিন্‌তে পাচ্ছিনে! এ কি করেছেন?"

শান্ত মৃদু হাস্যের সহিত মায়া উত্তর দিল, "বাইরের বেশের দৈন্যই শুধু 'বড়' করে দেখবো বাবা?"

মদন বলিল, "সন্তানের দৃষ্টিতে সেই দৃশ্যই বড় ক্লেশদায়ক মা—"

বাধা দিয়া মায়া বলিল, "ও কথা যেতে দাও, তুমি সুন্দর-মঠে কেমন ছিলে এতদিন, তাই বল। সেখানে মহারাজ ভাল আছেন ত? দেবকী-নন্দন ঠাকুরের কন্যা 'কিশোরী' মহারাজের কাছে কেমন আছে বল?"

মদন মৃদুস্বরে বলিল, "ভালই আছেন, তাঁরা সকলে আজ এখানে এলেন যে।"

"তোমার সঙ্গেই? মহারাজ শুদ্ধ?"

"হাঁ।"

"কোথায় রয়েছেন তাঁরা?"

"বাইরে থেকে মন্দির প্রণাম করে মহারাজ কাছারী মহলে গেছেন। সমাগত সম্ভ্রান্ত লোকজনদের সঙ্গে দেখা শুনা কর্‌ছেন, আমি মাঝখান থেকে পালিয়ে এসেছি।"

মায়া হাসিল। মদন হাসিয়া বলিল, "শান্তি মাসিমাকে প্রণাম করে, খোকার—অর্থাৎ মুক্তির সঙ্গে দেখা করে এলুম। কি দুরন্তই হয়েছে মা! আমাকে ঝক্ মানিয়ে দিলে, আর দিনকতক পরে, লোকে তাকে দেখ্‌লেই মদনের ভাই বলে বুঝ্‌তে পার্‌বে।"

মায়া স্মিত বদনে বলিল, "তা পারুক, কিন্তু আর কতদিন এমন বম্ বম্ করে বেড়াবে বল দেখি, এইবার সংসারের কাজে এগুলে ভাল হয় না?"

মদন নম্র হাস্যে বলিল, "আপনারা পেছুতে দিলেন কৈ? মহারাজ ত সেইজন্যই কাণ ধরে টেনে আনলেন।"

মায়া সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি বিয়ে করতে এসেছ? কোথায় বিয়ে করবে?"

"আপনাদের এই মঠে।"

"মঠে? কার সঙ্গে?"

"দুঃখের কথা আর কেন বলেন মা, মহারাজের ঘটকালী বুদ্ধিটা বড় সুবিধে নয়। তিনি দেবকীনন্দন ঠাকুরের জামাই হবার উপযুক্ত লোক ব্রহ্মাণ্ডে খুঁজে পেলেন না, আমি নিরীহ প্রাণী একপাশে পড়ে আছি দেখে আমাকেই গিয়ে পাকড়াও করলেন।"

সানন্দে মায়া বলিল, "মহারাজের জয় জয়কার হোক, তাঁর বুদ্ধি বিবেচনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, বড় সুসংবাদ শুনিয়েছ বাবা! আমি নিশ্চিন্ত হলুম, তুমি এবার মঠের অধিকারী হবে।"

মদন বলিল, "না মা, অত বড় যোগ্যতা আমার নাই, সে আমি মহারাজের সঙ্গে চুক্তি করে এসেছি। মহারাজের এক সু-পণ্ডিত ব্রহ্মচারী শিষ্য মঠের অধিকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সম্প্রদায়ের কল্যাণসাধন করবেন, আমি তাঁর অধীনস্থ উপদেশার্থী হয়ে থাকব। আমি শুধু বৈষয়িক ব্যাপারের শৃঙ্খলার জন্য দায়ী রইলুম—শুধু ওকালতী বুদ্ধি খরচ করা ছাড়া মঙ্গল-মঠের কাজে আমার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না, যা করবার সব তিনি করবেন।"

মায়া বলিল, "কর্ম্ম কর্ত্তা যিনিই হোন, কিন্তু সত্ত্বাধিকারী ত তুমি-ই?"

মদন হাসিয়া বলিল, "আপনাদের আশীর্ব্বাদে, অগত্যা।"

ক্ষণপরে মদন সহসা বলিল, "ভাল কথা, খবরটা শুনে অবধি, আমার মন ক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে। আপনার সঙ্গে ঝগড়া করব বলে, দুষ্ট বুদ্ধিকে শাণিয়ে ছুটে আস্‌ছিলুম, কিন্তু আপনাকে প্রণাম করেই সব ভুলে গেছি।"

মায়া বলিল, "কি কথা বাবা?"

মদন ক্ষুণ্ণ-করুণ কণ্ঠে বলিল, "মঠের এই কাজটা নেওয়া কি ভাল হয়েছে মা?"

মায়া সহসা কোন উত্তর দিতে পারিল না। একটু থামিয়া, খুব শান্ত ধীর কণ্ঠে বলিল, "তোমরা যেদিক থেকে এর ভালমন্দ বিচার করছ, আমি সে দিকে চোখ রেখে এ কাজে আসিনি বাবা। গৌণ আয়োজন, মুখ্য সাধনের সহায়ক বলে-ই আমি জোর করে দেবালয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়েছি, এখন এই কাজেই আত্মনিয়োগ করে, আমি সমস্ত তৃপ্তি, সমস্ত শান্তিকে খুঁজে পাচ্ছি। এখন দিনে দিনে বুঝ্‌তে পারছি—খুব ভাল করেই বুঝ্‌তে পারছি বাবা, কাজের পথে উঁচু নীচু বল্‌তে কিছু ভেদ নাই, ঊর্দ্ধে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যাওয়াই শুধু আমাদের কর্ত্তব্য, তা হলে পথই পথের সন্ধান দেখিয়ে দেয়।"

চমৎকৃত মদন নির্ব্বাক্ হইয়া গেল! তাহার চোখে অশ্রু ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। শ্রদ্ধানত শিরে মায়ার পদপ্রান্তে মাথা নোয়াইয়া দুইহাতে সে পায়ের ধূলো তুলিয়া মাথায় দিল। রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কলেজে পড়েছি, পাশ করেছি, অনেক ভাব, অনেক ভাষা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, সমাজে বিদ্বান বলে পরিচিত হয়েছি—কিন্তু

কিছুই শিখিনি মা, কিছুই শিখিনি! সে শিক্ষা শুধু মনকে বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করেছে মাত্র, কিন্তু যে সাধনা হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করে, প্রাণকে উজ্জ্বল করে, তার আগুন শুধু আপনাদের মধ্যেই প্রদীপ্ত দেখি। থাক, এর ওপর একটি কথাও উচ্চারণ কর্‌বার ক্ষমতা আমার নাই, তবে যোড় হাত করে একটি ভিক্ষা চাইছি মা, অনুরোধটা রাখ্‌তেই হবে।"

মায়া মন্দিরে বিগ্রহের পানে দৃষ্টি স্থির বদ্ধ রাখিয়া বলিল, "মদন তুমি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত, আজ বাদে কাল রাজরাজেশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠিত হবে, তোমার সামাজিকমর্য্যাদা ভুলে যেও না। সংসারের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় দগ্ধ ভস্মীভূত—সন্তান পালনের জন্য পরানুগ্রহপ্রত্যাশী দীন-ভিখারিণীর সঙ্গে কথা কইছ, সেটা স্মরণ রেখো বাবা।"

মনস্তাপ পীড়িত স্বরে মদন বলিল, "মুমূর্ষুর অন্তিম শয্যায় সত্য সাক্ষ্য করে, যাঁদের ধর্ম্ম-মাতা বলে, ধর্ম্ম-ভ্রাতা বলে স্বীকার করেছি, আজ অবস্থা পরিবর্ত্তনে সামাজিক মর্য্যাদার দোহাই দিয়ে সত্য সম্পর্ক অস্বীকার কর্‌তে বলেন?"

মায়া ধীর কণ্ঠে বলিল, "সম্পর্ক আমি অস্বীকার কর্‌তে বল্‌ছিনে।"

"তবে, সম্পর্কের দায়িত্ব মর্য্যাদা অস্বীকার কর্‌তে বলেন? তা হলে আমি যে ধর্ম্মে পতিত হব মা, আমার শিশু ভ্রাতার ওপর বিধবা মাতার ওপর আমার যা কর্ত্তব্য আছে, আমি তা অবশ্য প্রতিপালন কর্‌তে বাধ্য বৈ কি। না, আমি আপনার স্বচ্ছন্দ সাধনার ব্যাঘাত কর্‌তে চাইনে, যেমন আছেন তেমনি থাকুন, তবে এইবার থেকে আমার মুখ চেয়ে একটু প্রকার ভেদের কষ্ট সহ্য কর্‌তে হবে, এইটুকু নিবেদন।"

প্রশান্ত দৃষ্টি তুলিয়া মায়া বলিল, "তুমি কি বল্‌তে চাও বুঝেছি,

অক্ষম শিশুর দরিদ্রা জননীকে তুমি সক্ষম সন্তানের—রাজরাজেশ্বরের মাতৃত্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত কর্‌তে চাও। কিন্তু না বাবা, তা হতে পারে না, আমার অন্তরের গৌরবকে আন্তরিক তৃপ্তিতে ধন্য হতে দাও, বাইরের গর্ব্ব আস্ফালন প্রকাশ চেষ্টায় তাকে হতশ্রী কোর না, আমার স্বাচ্ছন্দ্য হানি কোর না, ভগবান দয়া করে আমায় যে অবস্থায় রেখেছেন এই অবস্থাই আমার পক্ষে সহজ, সরল ও সত্য। এই অবস্থা আমি সন্তুষ্টচিত্তে শিরোধার্য্য করে নিয়েছি, আমায় প্রলোভনে বিচলিত করো না। আমি মদনের মা, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট—লক্ষেশ্বরের মা হওয়া আমার পক্ষে বিড়ম্বনা। তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি বাবা, আমার মনকে দ্বিধায় কুণ্ঠায় অশান্ত করে তুলো না, আমি বেশ আছি—এইটুকু জেনে নিশ্চিন্ত হও।"

মদন অধোবদনে নিরুত্তর হইয়া রহিল। মানুষের মুখের কথা মৌখিক তর্কে উড়াইয়া দেওয়া সহজ, কিন্তু হৃদয়ের দৃঢ়তা যেখানে মূর্ত্তিমান হইয়া দাঁড়ায়, সেখানে মুখের কথা সম্পূর্ণই অচল!

মদন ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বুঝিয়া মায়াও মনে দুঃখিত হইল, কিন্তু স্নেহের মুখ চাহিয়া অন্যায়ের সমর্থন করা যায় না। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া মায়া সান্ত্বনা-কোমল কণ্ঠে বলিল, "কিছু মনে করো না মদন, তোমার আত্মীয়তা, আমার জীবনের মূল্যবান সম্পদ, কিন্তু তাই বলে অনর্থক গলগ্রহ হয়ে নিজে অস্বস্তিভোগ কর্‌তে চাইনে। যখন শক্তি যাবে, তখন সকলের আগে তোমারই সাহায্যপ্রার্থী হব, এটা নিশ্চয় জেনো, কিন্তু— এখন অপাত্রে দয়া দান ক'র না, এই আমার অনুরোধ।"

বৃদ্ধ ভাণ্ডারী-জী কার্য্যব্যপদেশে সেইদিকে আসিতেছিলেন, মায়াকে

একজন অপরিচিত যুবার সহিত কথা কহিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া দূরে দাঁড়াইলেন। মায়া হাস্যোজ্জ্বল বদনে তাঁহাকে ডাকিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আসুন ভাণ্ডারী-জী, সু-সংবাদ শুনে যান, সুন্দর-মঠের মোহন্ত মহারাজ বরকন্যা নিয়ে শুভ রিবাহ সম্পাদন করাতে এসেছেন. ইনিই আমাদের মঠের ভাবী জামাতা—এঁর নাম মদনানন্দ ভট্ট।"

ভাণ্ডারী অধিকতর বিস্মিত হইয়া একবার মায়ার মুখ পানে একবার মদনের মুখপানে তাকাইলেন, মায়ার কথার অর্থ তিনি যেন ভাল বুঝিলেন না। মোহন্ত মহারাজের অপ্রত্যাশিত আগমনে বাহির-মহলে খুব হুলস্থূল পড়িয়া গেলেও ভিতর মহলের কর্ম্মব্যস্ত কর্ম্মচারী কয়জন এখনো সে সংবাজ জানিতে পারে নাই। ভাণ্ডারীকে ইতস্ততঃ-পরায়ণ দেখিয়া মায়া প্রসন্ন-স্মিত বদনে বলিল, "ইনি আপনাদের মঠের জামাই হলেও আমার সঙ্গে এঁর আলাদা সম্পর্ক আছে, ইতিপূর্ব্বে ইনি আমায় 'মা' বলে ধন্য করেছেন তাই তাড়াতাড়ি আগে আমায় দেখা দিতে এসেছেন।"

ভাণ্ডারী অগ্রসর হইয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। দেখিতে দেখিতে একে একে অনেক লোক জুটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাহির মহল হইতে সংবাদ লইয়া দূত আসিল, সকলে ব্যস্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, চারিদিকে হাঁকডাক সোর-গোল জমিয়া গেল। সন্ধ্যারতির সময় হইয়া আসিতেছে দেখিয়া মদন অন্যান্য কথার পর মায়ার নিকট বিদায় লইয়া মহারাজের সন্ধানে চলিয়া গেল। মায়া মন্দিরের দীপ জ্বালিয়া, সন্ধ্যারতির প্রতীক্ষায় একপাশে বসিয়া মালা জপ করিতে লাগিল। উজ্জ্বল দীপালোক সম্মুখে স্বর্ণ সিংহাসনে, কৃষ্ণমর্ম্মর নির্ম্মিত সুচিক্কন

সুন্দর, সলজ্জ গোপাল-বিগ্রহ, নির্ব্বিকার হাস্য প্রসন্ন বদনে বিরাজ করিতে লাগিলেন। মায়া শান্ত নিশ্চিন্ত দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। আরতি দর্শনার্থীগণ নগ্নপদে একে একে আসিয়া, সংযত গম্ভীরভাবে মন্দির-প্রাঙ্গনে সমবেত হইতে লাগিল। কিছু পরে কয়েকজন অনুচরের সহিত মহারাজা আসিয়া প্রাঙ্গনে দাঁড়াইলেন, সকলে অভিবাদন করিয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। কেবলরাম তাঁহাদের সহিত আসিয়াছিল, সে মন্দির প্রাঙ্গনে সকলকে পৌঁছাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্থানোন্মুখ হইল, কারণ আরতির সময় পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় ব্যবহার-ই প্রচলিত বিধি।

মহারাজের অনুচরবর্গের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া কেবলকে নমস্কার করিয়া বলিল, "আমি সদ্যঃস্নাত, যদি অনুমতি করেন, আমিই তাহলে, সন্ধ্যারতি করি।"

কেবলরাম সসৌজন্যে বলিল, "স্বচ্ছন্দে, আহ্লাদের সহিত এ প্রস্তাব অভিনন্দন করছি।"

তাহাদের কথা মহারাজের কানে পৌঁছিল। তিনি বলিলেন, "কে ও নিরঞ্জন, আরতি করতে চাও? যাও, কিন্তু তোমার উত্তরীয়?"

নিরঞ্জন মন্দির সোপানে উঠিতে উদ্যত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "মহারাজ আমি স্নানের পর কৌপীন ও বহির্ব্বাস গ্রহণ করে আরতি দর্শনের উদ্দেশ্যে এসেছি, উত্তরীয় আনি নাই।"

"আমার উত্তরীয় নিয়ে যাও—" মহারাজ স্কন্ধ-বিলম্বী রেশমী উত্তরীয় খুলিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া নিরঞ্জনের দিকে ছুড়িয়া দিলেন। নিরঞ্জন

ক্ষিপ্রহস্তে ধরিয়া ফেলিয়া, মাথায় ঠেকাইয়া নতজানু হইয়া সেইখান হইতে অভিবাদন করিল। তারপর বক্ষ পৃষ্ঠ আচ্ছাদন করিয়া বাহুর নিম্ন দিয়া উত্তরীয়ের উভয় প্রান্ত একত্র করিয়া বুকের উপর টানিয়া ফাঁশ দিয়া বাঁধিল। মন্দিরের দ্বারে মাথা নোয়াইয়া ভিতরে ঢুকিয়া আরতি কার্য্য আরম্ভ করিল, সমস্ত উপকরণ নিভুঁলভাবে পাশাপাশি সজ্জিত ছিল—কিছু খুঁজিতে হইল না।

মন্দিরের কোণে স্তম্ভগাত্রে ঠেস দিয়া মালাজপনিরতা মায়া বাহিরের কথাবার্ত্তা শব্দ কিছু কিছু শুনিয়াছিল, সকলের শেষে মহারাজের কথাটা খুব স্পষ্ট, খুব তীব্র ভাবে শুনিল—"কেও নিরঞ্জন।"

নূতন পুরোহিত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া সংযত গাম্ভীর্য্যে ধীর ভাবে আপন কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন: সকল আয়োজনই সজ্জিত ছিল, সুতরাং অভাবের জন্ত তাঁহাকে কোন কিছু অন্বেষণ করিতে হইল না, তিনি কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। নিস্পন্দ জড় ভাবে—আর একজন মনুষ্যও যে সেই মন্দিরে রহিয়াছে, তাহার অস্তিত্বও তিনি জানিলেন না।

আরতি শেষ হইল, বাদ্যধ্বনি থামিয়া গেল। পূজারী শঙ্খঘণ্টা নামাইয়া, গভীর উদাত্ত স্বরে—যেন আভ্যন্তরিক স্বর-যন্ত্রের প্রাণ-মূলকে পর্য্যন্ত পবিত্রত্বের ভাব-সৌরভে পূত সংস্কৃত করিয়া গম্ভীর মধুর ধ্বনিতে প্রণাম মন্ত্র বলিতে বলিতে মন্দিরের বাহিরে প্রণাম করিতে গেলেন। মন্দির নিস্তব্ধ হইল। মন্দিরে রহিলেন শুধু, প্রসন্ন শোভা সৌন্দর্য্যে পরিস্নাত অপরূপকান্তি পাষাণ বিগ্রহ—আর ততোধিক রূঢ় কঠিনতার মধ্যে আত্মসমাহিত, এক স্থির নিস্পন্দ নারীমূর্ত্তি!

বাহিরে বিচিত্র কণ্ঠের বহুবিধ স্তব-স্তোত্র প্রণাম মন্ত্রের মধ্যে নিত্যনৈমিত্তিক ভজন গান আরম্ভ হইল। মায়া আজ ভজন শুনিতে বাহিরে আসিল না, অন্যতম পূজক দেবানন্দ ঠাকুর প্রাত্যহিক প্রথানুসারে স্নান-জল চরণ-তুলসী লইয়া দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দের মধ্যে পরিবেশন করিলেন। মায়া সেখানেও গেল না, যেখানে বসিয়াছিল সেইখানেই বসিয়া রহিল—এক চুল নড়িল না।

অনেকক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া মায়া দেবানন্দ পূজারীকে ডাকিয়া বলিল, "বাবা, আমায় চরণ-তুলসী দাও।"

পূজারী আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন মা? দেখ্‌তে পাইনি।"

"মন্দিরেই—" বলিয়া মায়া সহসা থামিল। একটু কাশিয়া ধীর স্বরে বলিল, "কাজে ব্যস্ত ছিলুম।"

পূজারী তখনই চরণ-তুলসী আনিয়া দিলেন। যথারীতি গ্রহণ করিয়া প্রণামান্তে মায়া উঠানে নামিয়া আসিল। তখন ভজন গান থামিয়া গিয়াছে, দর্শনার্থীর দল সকলে বিদায় লইয়াছে, উঠানে কেহ কোথাও নাই, শুধু নাট-মন্দিরের সম্মুখে খিলানের গাত্র অবলম্বী 'সেজে'র আলোকে বসিয়া তিন ব্যক্তি সংযত গম্ভীর ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। মায়া দূর হইতে দেখিয়া চিনিল, মদন ও কেবল; তৃতীয় ব্যক্তি কে চিনিতে পারিল না। তিনি সেজের ঠিক সম্মুখে বসিয়াছিলেন, তাঁহার পেশীপুষ্ট বলিষ্ঠ বিশাল সুন্দর মহিমোজ্জ্বল আকৃতি খুব স্পষ্ট পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। তিনি তর্জ্জনী উঁচাইয়া পার্শ্বোপবিষ্ট মদনের উদ্দেশ্যে কি বলিতেছিলেন, মদন বিনীতভাবে

নীরব মনোযোগে শুনিতেছিল কেবলরাম অন্য পার্শ্বে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

মায়া মোহন্ত মহারাজকে কখনো দেখে নাই, তাহার সন্দেহ হইল বুঝি ইনিই তিনি! প্রণাম করিবার জন্য অগ্রসর হইল, নিঃশব্দে নিকটস্থ হইয়া, কণ্ঠস্বর ভাল করিয়া শুনিয়া, সহসা চমকিয়া সে স্তম্ভের ছায়া অন্ধকারে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ওহো হো! এই তেজস্বী গম্ভীর কণ্ঠধ্বনির সহিত—সুদূর অতীতের সেই স্বল্প পরিচয়ে তীব্র পরিচিত—তরুণ কণ্ঠের নম্র-কোমল-ধ্বনির কোন অসামঞ্জস্য নাই যে! সেই কণ্ঠ, স্বরে শুধু—উচ্চারণে শুধু, দৃপ্ত দৃঢ়তা মাহাত্ম্য বিস্ফুরিত হইতেছে মাত্র! কি কথার উত্তরে ঠিক বলা যায় না, বুঝি সদ্যঃবিবাহার্থী, সংসার প্রবেশোদ্যত অনভিজ্ঞ সরল যুবা মদনের প্রতি তিনি উপদেশ দিতেছেন,—"নারী দেবীর জাতি! কল্পনা নয়, কাহিনী নয়, বাস্তব সত্য! আমি নিজের অভিজ্ঞতায় জোরের ওপর বল্‌ছি, নারীত্বের মধ্যে আত্মবোধ যেখানে জাগ্রত হয়েছে, দেবীত্বের বিকাশ সেখানে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখ্‌বে! শুধু—লঘুভাবে কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য এই মহত্ত্বকে দু' চক্ষু মেলে যথেচ্ছাচারের ওপর দেখ্‌তে চেওনা, বুঝ্‌তে যেওনা, তা'হলে নিরাশ হবে, ভুল করবে। আমি স্পষ্টভাবে এখানে মনের ভাষা ব্যক্ত করবার শক্তি সাহস পাইনি অকপটে স্বীকার করছি, তবুও আন্তরিক শ্রদ্ধা সম্ভ্রমে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হব না। আমি দেখেছি, জেনেছি, এঁদের মধ্যেই দেবীর সৌন্দর্য্য আছে। সতর্ক হও, এঁদের দেবীত্ব উদ্বোধনে সহায়তা কর, দেখ্‌বে এঁরাই বিষ্ণু-গৃহিণী লক্ষ্মীর মূর্ত্তি ধরে পূর্ণশক্তি-গৌরবে সংসার পালয়িত্রী-পদে প্রতিষ্ঠিত হবেন। নির্দ্দয়-লালসা

চড়ুইয়ের মত ক্ষুদ্র প্রাণ নিয়ে ততোধিক সংকীর্ণতর ঘৃণিত ভোগ তৃষ্ণায় পশুত্ব আশ্রয় ক'রে—এই মহামহিমার দিকে হীনদৃষ্টিতে তাকিও না, এ মর্য্যাদার অপমান কোর না, নিজেদের প্রাণ-শক্তিকে ধ্বংস কোর না। সংহত-তেজস্বী-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হও, সিংহের পৃষ্ঠে ভগবতীর আসন, এটা মূর্খের পরিকল্পনা নয়—এর ভিতর জ্বলন্ত সত্য নিহিত আছে ; খোঁজ, আবিষ্কার কর, সিদ্ধি সাফল্য সবই করায়ত্ত হবে।"

নিঃশব্দে মায়ার অধরে সকরুণ বেদনার হাসি ফুটিয়া উঠিল। অজ্ঞাতে—সম্পূর্ণ নীরবে একটা অতি ক্ষীণ, দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, হায়! এত দিন পরে, এতদূরে আসিয়া আজ এ সংবাদ শুনিতে হইল! কিন্তু থাক্—বুকের ভিতর যত বড় তীব্র উন্মাদনায় কম্পন-স্রোতে চলুক, কিন্তু তাহার পথ আজ ভিন্নমুখে! তাহার দুর্জ্জয় উন্মাদ স্রোত, সে আজ মহাসাগরের দিকে সুনিশ্চিতরূপে ফিরাইয়া দিয়াছে। আজ নারীত্বের গণ্ডিতে নিজেকে পুরিয়া এই সু-উচ্চ জাতীয় সম্মানকে গ্রহণ করিয়া, ব্যক্তিগত সত্যনিষ্ঠার চরণে কৃতজ্ঞতা-ভারে, মোহ-গৌরবের মূল্যে আপনাকে বিকাইয়া দিতে পারিবে না! আজ তাহার মধ্যে জাতীয়ত্ব নাই, নারীত্ব নাই, পৃথিবীর মানুষের জন্য কিছুই অবশিষ্ট নাই! পৃথিবীর সহিত, পৃথিবীর মানুষের সহিত আজ তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

থাক্—নীচাশয় জগতের অতৃপ্ত স্বার্থ বাসনা। তুমি তোমার স্বভাবসিদ্ধ ঈর্ষাদ্বেষের ভ্রূকুটি পীড়ন লইয়া দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে আপনার মনে আপনি মাথা খুঁড়িয়া মর, আজ তোমাকে চাহিয়া দেখিবার অবসর তাহার নাই! চিরদিন ভয়ের মূর্ত্তিটাই সে বড় করিয়া দেখিয়াছে।

আজ সদ্যঃলব্ধ শক্তি বলে সে নিঃশঙ্ক সতেজ হইয়া, পূর্ণ সাহসের মূর্ত্তিটা কত বিরাট, কত সুন্দর, তাহা দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া লইবে, আজ নিজের ক্ষুদ্রতার পানে চাহিয়া সে কুণ্ঠিত হইয়া পিছাইবে না।

মায়া অগ্রসর হইল। কেবলরাম তাহাকে দেখিতে পাইয়া প্রশ্ন করিল, "কে মায়া?"

"হাঁ—" খুব সহজ উত্তর! মুক্ত দীপালোকের মধ্যে নিরাভরণা, শুভ্রবসনা, ক্ষীণাঙ্গী বিধবা যুবতী, অসঙ্কোচে সকলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার কোনখানে এতটুকু শঙ্কা নাই, কুণ্ঠা নাই, দ্বিধা নাই, দৈন্য মলিনতা নাই—সে যেন দৃপ্ত মহিমার মধ্যে সম্পূর্ণ নির্ম্মল ভাস্বর! অপূর্ব্ব শক্তি-শ্রীমণ্ডিতা গরীমাময়ী দেবী!

সম্মুখেই নিরঞ্জন উপবিষ্ট। তাহার পরিধানে কৌপীন বহির্ব্বাস, দেহ অনাবৃত, মহারাজের সেই উত্তরীয় এখন তাহার বক্ষবন্ধন মুক্ত হইয়া স্কন্ধের উপর শ্লথ-বিলম্বমান; তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত। মায়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, হাঁ ইনি নিরঞ্জনই বটে! কিন্তু ইনি সেই আট বৎসর পূর্ব্বের প্রবল-হৃদয়াবেগে আত্মহারা সৌন্দর্য্যসাধক, তরুণ কোমল কান্তি নিরঞ্জন ভাস্কর নহেন—ইনি এখন সুদৃঢ় সাধন-শক্তি-প্রভাবে পূর্ণ পরিণত আকৃতি বলিষ্ঠ ব্রহ্মচারী নিরঞ্জন! ইঁহার সংযম-শক্তি স্ফীত সুবিশাল বক্ষে শৌর্য্যমহিমা, নয়নে প্রশান্ত করুণা, ললাটে মহত্ত্ব-গরিমা, অধরে তেজস্বী দৃঢ়তা নির্ভীক স্থৈর্য্যে বিরাজমান, সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ গরীমায় ব্রহ্মচর্য্য জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত! মায়া সসম্ভ্রমে প্রণত হইল, মহত্তর শ্রদ্ধার চরণে মহত্তর সম্মান-অর্ঘ্য নিবেদন করিল।

প্রণতার প্রণাম গ্রহণের জন্য প্রণম্য সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন,

নেই, বড় দুঃখের বিষয়—আশীর্ব্বাদ করছি দীর্ঘজীবি হও। আমাদের দৃঢ় ধারণা, কেউ কিছু না পারলেও তোমার একার চেষ্টাতেই সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে।"

নিরঞ্জন ম্লানমুখে ঘাড় হেঁট করিল। তাঁহাদের এই ধারণার দৃঢ়তা গতকল্য এমনই সময়—ঠিক এই দ্বিপ্রহরের সূর্য্যালোকের মতই, তাহারও নিকট উজ্জ্বল সত্য ছিল, কিন্তু আজ আর নাই। আজ তাঁহাদের ধারণার দৃঢ়তা নিরঞ্জনের নিকট মর্ম্মান্তিক আক্ষেপের বিসদৃশ পরিহাস। ক্ষণেক নীরব থাকিয়া নিরঞ্জন মুখ তুলিয়া শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "আপনাদের ভাল লেগেছে শুনে সুখী হলুম, যদি ওর দ্বারা কারুর কিছু উপকারের আশা আছে বোঝেন তাহলে আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, ভাষ্যের শেষাংশ প্রণয়নের ভারটি আপনি গ্রহণ করুন।"

পণ্ডিত বিস্ময়ে চমকিত হইয়া বলিলেন, "আমি কেন?"

উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস বুকের মধ্যে চাপিয়া লইয়া নিরঞ্জন ঊর্দ্ধমুখে মন্দির-চূড়ায় উড্ডীয়মান পতাকার দিকে চাহিয়া বলিল, "সকল সাধনাই শক্তি সাপেক্ষ, যে শক্তি নিয়ে এতদিন চোখ কান বুজে প্রাণান্ত চেষ্টায় খেটেছিলুম, সে শক্তি আজ হারিয়ে ফেলেছি। পঙ্কস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে লোহার মুগুর ভাঁজা হয় না, আত্মশক্তি নির্ভরতা না থাকলে কি পরের শক্তি উদ্বোধনে সহায়তা করতে পারা যায়? আমার মত হতভাগ্যের পক্ষে অশুদ্ধ মন লইয়া, শুদ্ধাদ্বৈতমতবাদের মর্ম্মরহস্য—" নিরঞ্জন হঠাৎ থামিল, ব্যাকুল নয়নে চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "না পণ্ডিতবর ক্ষমা করুন—আমার দ্বারা আর কাজ হবে না, আমি অক্ষম।"

পণ্ডিত বলিলেন, "তুমি নির্ম্মল-মঠে থেকেই না ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলে?"

নিরঞ্জন বলিল, "হাঁ, সুন্দর-মঠে দীক্ষা নিয়ে নীলাচলে শ্যামানন্দ আচার্য্যের নিভৃত আশ্রমে শিক্ষার জন্য গিয়েছিলুম। পরে নির্ম্মল-মঠে এসে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়ে, যৎকিঞ্চিৎ সিদ্ধি-শান্তিলাভ করেছিলুম, কিন্তু এই নিরেট পাথরে গড়া মঙ্গল-মঠটা প্রকাণ্ড অমঙ্গলের নিকেতন। এখানে এসে আমার সুন্দর-মঠের দীক্ষা—নির্ম্মল-মঠের সাধন সব ধ্বংস হতে বসেছে।"

পণ্ডিত নিরঞ্জনের মুখপানে চাহিয়া হতবুদ্ধি হইলেন, এমন অবিশ্বাস্য অসঙ্গত উক্তিকে কৌতুক বলিবেন কেমন করিয়া। নিরঞ্জনের চক্ষে যে সত্য সত্যই কঠোর মনস্তাপের অগ্নি দেদীপ্যমান! বিস্ময়মথিত স্বরে বলিলেন, "ধ্বংস হইতে বসেছে? একদিনেই?"

গভীর বেদনায় নিরঞ্জন বলিল, "এক মুহূর্ত্তে! বড় কোলাহল পণ্ডিতজী, এখানকার চারি দিকেই বড় কোলাহল। এখানকার বাতাসে বিষাক্ত বাষ্প ঘ্রাণে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে, আমার যেন ক্রমশই উন্মত্ততা ঘনিয়ে আস্‌ছে, আমি যেন নিশ্বাস ফেল্‌তে পাচ্ছিনে। এখানে মুক্তি সাধনার স্থান নাই—আছে শুধু শৃঙ্খলের বন্ধন!"

পণ্ডিত এমন অদ্ভুত উক্তি জীবনে কখনও কাহারও মুখে শুনিয়াছেন কি না স্মরণ করিতে পারিলেন না। আশ্চর্য্যভাবে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এখানকার মোহন্তপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজৈশ্বর্য্য ভোগ তোমার কাছে শৃঙ্খলের বন্ধন বোধ হচ্ছে? আশ্চর্য্য তোমার মনোবৃত্তি। তুমি এতবড় ছেলেমানুষী কথা কইতে জান তা আমার

ধারণা ছিল না। বুঝে দেখো, আমাদের সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী জিতেন্দ্রিয়-স্বভাব মহারাজ কি করছেন ?"

সকাতরে নিরঞ্জন বলিল, "অনেক পার্থক্য—অনেক পার্থক্য ! পুরুষকারের স্বেচ্ছাধীন আনন্দে গড়া সোনার শিকলকে কণ্ঠের ভূষণ করা—আর রাক্ষসী ছলনাময়ী প্রকৃতির ছলনায় গড়া কঠিন লোহার শিকলে পা বেঁধে আটক পড়ে থাকায় ঢের পার্থক্য, স্বর্গ নরকের চেয়েও বেশী ব্যবধান। না মহাশয় মার্জ্জনা করুন, মহারাজের আহ্বান আমি প্রণামপূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করছি। আমি আত্মসম্ভ্রমবোধ ভুলে যাচ্ছি, গুরুর মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারছি না, আমি হতভাগ্য—তাঁর শিষ্য নামের অযোগ্য ! আপনাদের সভাকে দূর থেকে নমস্কার করছি, শুদ্ধাদ্বৈতমতবাদের সম্বন্ধে উপদেশ শোনবার মত মনের শক্তি, স্থৈর্য্য এখন আমার নাই। নির্লজ্জের মত শুধু প্রশংসালুব্ধ হয়ে সেখানে গিয়ে দাড়ান, আমার পক্ষে মরণান্তিক যন্ত্রণার বিষয়। আপনি যান, মহারাজকে বলবেন, এখন আমি অসুস্থ—বড়ই অসুস্থ, একান্তই অসুস্থ !"

নিরঞ্জন অধীরভাবে উঠান পার হইয়া দ্রুতপদে কাছারীমহলে নিজের বিশ্রামকক্ষের দিকে চলিয়া গেল। পণ্ডিত অবাক্ হইয়া ক্ষণেক দাড়াইয়া রহিলেন, তারপর দুর্ব্বোধ্য বিস্ময়ে সংশয়পূর্ণচিত্তে ধীরে ধীরে মহারাজের উদ্দেশ্যে স্থানত্যাগ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গৃহের নির্জ্জন শান্তির মধ্যে আসিয়া নিরঞ্জন মাথাটা ঠিক করিয়া লইতে চাহিল। মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বের ঘটনাগুলা চেষ্টা সত্ত্বেও আর সে ভালরূপ স্মরণ করিতে পারিল না, তবে মনে পড়িল, আকস্মিক উত্তেজনাবশে—স্বাভাবিক নম্র সংযম হারাইয়া, সে উদ্ধত বর্ব্বরতায় মাননীয় প্রেমচাঁদ পণ্ডিতের সমক্ষে কতকগুলা বিশ্রী অসংযত প্রলাপ—যাহা তাঁহার চক্ষে সম্পূর্ণই অশোভনীয়, তাহাই বকিয়া আসিয়াছে। নিরঞ্জন হতভম্ব হইয়া গেল!

কিন্তু এই প্রলাপটার হেতু কি? আভ্যন্তরিক বিকার বৈকল্য বেগেই না ইহা উদগত হইয়া পড়িয়াছে? নিরঞ্জন ভীত হইল, মানুষ আজন্ম যাহা করে নাই—করিতে পারে নাই, জীবনের কোন মুহূর্ত্তে তাহা যে ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া করিতে পারিবে না—হৃদয়ের এই সুদৃঢ় সত্য ধারণা আজ তাহার কাছে, প্রকাণ্ড মিথ্যা বলিয়া ধরা পড়িল। আজ সে গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছে, নিজের উচ্ছৃঙ্খল একজ্ঞায়িতায় অন্ধ হইয়া—স্বচ্ছন্দে গুরু আজ্ঞা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে! যে গুরু পরম স্নেহ যত্নে তাহাকে হৃদয়ের কাছে টানিয়া লইয়া, গভীর নিষ্ঠায় সুমহান্ সাধনায় দীক্ষা দিয়াছেন, বড় আশা করিয়া অকপট বিশ্বাসে মহত্তর কর্ত্তব্য পালনে তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, আজ সেই গুরুর মর্য্যাদা সে অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিল! আর অধঃপতনের বাকী কি? তাহার অসাধ্য কাজ পৃথিবীতে আজ আর কিছু আছে

বলিয়া ত মনে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। নিরঞ্জন ক্ষিপ্ত ঘৃণায়, সক্রোধে আপনাকে ধিক্কার দিল, "অকৃতজ্ঞ, পাষণ্ড!"

একজন ভৃত্য গৃহে ঢুকিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ, আপনার জলযোগের আয়োজন প্রস্তুত হয়েছে, আসুন।"

নিরঞ্জন ব্যাকুলভাবে বলিল, "জলযোগ? না, না, বন্ধু এখন আমি জল গ্রহণ করতে পারব না। আমার গুরু—আমার মহারাজ আমায় ডেকেছেন, আমি তাঁর কাছে চল্লুম।"

মহারাজের দেওয়া গত কল্যকার উত্তরীয়খানা মেঝের উপর পুস্তকরাশির মধ্যে অনাদরে পড়িয়াছিল—ফিরাইয়া দিতে মনে পড়ে নাই। নিরঞ্জন সেখানা তুলিয়া লইয়া নিজের স্কন্ধের উপর ফেলিয়া ব্যগ্র প্রশ্নে সুধাইল, "মহারাজ পণ্ডিতগণকে নিয়ে কোথায় বিশ্রাম করছেন জান?"

ভৃত্য বলিল, "তোষাখানায়।"

নিরঞ্জন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। তোষাখানার দ্বার উন্মুক্ত, প্রশস্ত মর্ম্মর হর্ম্ম্যতলে সুবিস্তৃত ফরাশের উপর, একপাশে ছয়জন অপরিচিত ব্যক্তি বসিয়া আছেন, অন্যপাশে মহারাজ; মদন মাঝখানে বসিয়া সেই 'ভাষ্য' পাঠ করিতেছে। নিরঞ্জন চাহিয়া দেখিল, প্রেমচাঁদ পণ্ডিত মহারাজের তাকিয়ার পাশ ঘেঁষিয়া বসিয়া, অস্ফুটস্বরে মহারাজকে কি বলিতেছেন। মহারাজ নীরবে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন, তাঁহার মুখে একটা সংশয়ান্বিত উদ্বেগের ছায়া ঘনাইয়া উঠিয়াছে।

নিরঞ্জন বুঝিল কথাটা কি? গৃহে ঢুকিয়া, অভ্যাগত পণ্ডিতগণের উদ্দেশে শিষ্ট সম্মান জ্ঞাপন করিতে ভুলিয়া গেল, একেবারে আসিয়া

মহারাজের পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল, নিঃশব্দে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। মহারাজ কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, সুগভীর স্নেহে তাহার মাথার উপর হাত বুলাইয়া নীরব আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন, একটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন না। তাঁহার মুখে বিশ্বস্ত প্রসন্নতার জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল, তাহার অর্থ যেন—'তুমি আসিবে তাহা নিশ্চয়ই জানিতাম, তবে কত বিলম্বে আসিবে তাহা ঠিক বুঝিতে পারি নাই বৎস!'

প্রেমচাঁদ পণ্ডিত বিস্ময় নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের পানে চাহিয়া রহিলেন। মদন পড়া থামাইয়া উৎসুক দৃষ্টিতে পণ্ডিতগণের প্রতি বলিল, "ইনিই ভাষ্যকার, শ্রদ্ধেয় ব্রহ্মচারী মহাশয়!"

যথোচিত সৌজন্যের সহিত উভয়পক্ষে অভিবাদন বিনিময় হইল পণ্ডিতগণ শ্রদ্ধা বিস্ময়পূর্ণ কৌতূহল বিস্ফারিত নয়নে, তরুণ তপনের ন্যায় উজ্জ্বল সুন্দর কান্তি, আনত দৃষ্টি ব্রহ্মচারী যুবার পানে চাহিয়া রহিলেন দুই চারিটা সময়োচিত কথা সংক্ষেপে হইবার পর, মদন হাতের বইখানি নিরঞ্জনের দিকে সরাইয়া দিয়া সন্থঃ অধীত অংশের শেষ প্রান্তে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "এইখান পর্যান্ত পড়া হয়েছে, এইবার আপনি নিজে পড়ে শোনান।"

নিরঞ্জন আপত্তি করিতে উদ্যত হইয়া মহারাজের দৃষ্টিপানে তাকাইয়া সহসা থামিল। দেখিল সে দৃষ্টিতে সম্মতি অসম্মতি কিছুই নাই, আছে শুধু সুনিপুণ পরীক্ষকের তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ঔৎসুক্যের নীরব প্রতীক্ষা! নিরঞ্জন অন্তরে কুণ্ঠিত হইল, বুঝিল তিনি আজ কোথায় দাঁড়াইয়া তাহাকে বিচার করিতে চাহেন, এতদিন শিক্ষার্থী বেশে তাঁহার পদতলে বসিয়া যে ক্ষমা-স্নেহ লাভ করিয়াছিল, আজ পরীক্ষার্থী বেশে তাঁহার

সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহারই ন্যায্য মূল্য হাতে হাতে পরিশোধ করিতে হইবে।

নিরঞ্জনের অন্তরে অন্তরে হৃদ্‌কম্পন আরম্ভ হইল। হায়, ন্যায্য মূল্য দূরের কথা, সে যে নিজেই আজ সম্বলহীন! ওগো দয়াময় দীননাথ, কোথায় আছ, আজ একবার দয়া কর—গুরুর সম্মান রক্ষার জন্য, তাহার বিলুপ্ত আত্মসম্মান শক্তিকে আজ একটি দণ্ডের জন্য ফিরাইয়া দাও—শুধু একটিবার!

নিরঞ্জন বিনা ভূমিকায় পুস্তক টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল, পড়া—শুধু পড়াই মাত্র! কোন দুরূহ ভাবের নিগূঢ় অর্থ বিশ্লেষণ—যাহা এতদিন সে প্রত্যেক শ্রোতাকে প্রাণের আনন্দে প্রাণ খুলিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়াছে, তাহার এক বর্ণ আজ উচ্চারণ করিতে পারিল না। ক্ষোভে অনুতাপে তাহার চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে চাহিল, কণ্ঠ শুকাইয়া আসিতে লাগিল, জিহ্বা জড়াইয়া যাইতে লাগিল, শব্দ-উচ্চারণ দুর্বোধ্য অস্পষ্ট অশুদ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল—কি পরিতাপ! পাঠ্যের কি লাঞ্ছনা! পাঠকের কি নিগ্রহ! নিজের শক্তি গৌরবকেই নিজের দৈন্য লাঞ্ছনায়—অপমানের কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্তিত করিয়া তুলিল। নিরঞ্জনের নিশ্বাস যেন বুকের ভিতর আটকাইয়া যাইতে লাগিল। কপাল বহিয়া টস্ টস্ করিয়া ঘাম ঝরিয়া পুস্তকের পাতা ভিজিয়া যাইতে লাগিল।

প্রণাম করিবার সময় নিরঞ্জন মহারাজের পায়ের কাছে উত্তরীয়খানি রাখিয়া দিয়াছিল। মহারাজ হাতের কাছে অন্য কিছু না পাইয়া সেইটা তুলিয়া নিরঞ্জনের মাথার উপর দ্রুত সঞ্চালনে বাতাস দিতে লাগিলেন।

নিরঞ্জন জানিতে পারিল না, সুতরাং বাধা দিল না। নন্দন, মহারাজের কাজ দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু মহারাজের নীরব ইঙ্গিতে নিরস্ত হইল। অব্যাহত গতিতে পাঠকার্য্য চলিতে লাগিল।

সহসা প্রেমচাঁদ পণ্ডিত বলিলেন, "ব্রহ্মচারী, নির্ম্মল-মঠে আমাদের কাছে পাঠ করবার সময় যেমন সরল, প্রাণবন্ত ভাষায়, চমৎকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে আমাদের বুঝিয়েছিলে, এঁদের কাছেও তেমনই ভাবে বল—আমরা আরো পরিতৃপ্ত হব।"

মুমুর্ষুর অন্তিম নিশ্বাসের মত, বেদনা মথিত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, নিরঞ্জন বড় ভয়ানক বিষাদকাতর দৃষ্টি তুলিয়া একবার মহারাজের পানে, একবার প্রেমচাঁদের পানে চাহিল। হায় তৃপ্তি-অন্বেষী মানবাত্মা! তৃপ্তিহারা হতভাগ্য আজ কেমন করিয়া বুভুক্ষিত হৃদয়ে তোমাদের প্রাণের তৃপ্তি যোগাইবে? অভিশপ্ত বৃহস্পতিপুত্রের মত, নিজের শক্তিতে প্রয়োগ-অক্ষম মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের মত—মাত্র নিজের জন্য নিষ্ফলা বিদ্যার বোঝা ঘাড়ে লইয়া সে আজ এই স্বর্গে—এই সভায় লাঞ্ছনাহত অভিশপ্তের বেশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! আজ এখানে—হায় ভগবান! সকাতরে নিরঞ্জন বলিল, "আপনারা আজ দয়া করে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বিচার করুন—আমি অক্ষম।"

মহারাজ অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া পণ্ডিতগণের উদ্দেশ্যে বলিলেন; "আপনারা অনুমতি করুন, আজ এই পর্য্যন্ত স্থগিত থাক, বেলা তৃতীয় প্রহর আগত প্রায়, আপনারা ভোজনান্তে এবার বিশ্রাম করুন।"

"তথাস্তু—" বলিয়া পণ্ডিতগণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিষ্কৃতির নিশ্বাস ফেলিয়া, কৃতজ্ঞ নমস্কারের সহিত নিরঞ্জন পুঁথি বন্ধ করিল। মহারাজ

সকলকে লইয়া ভোজনস্থানের দিকে চলিলেন। নিরঞ্জন পুঁথি রাখিয়া আসিবার জন্য নিজের ঘরে চলিল।

বিচিত্র ভাবোত্তেজনা সংঘাতে দেহ-মন অত্যন্তই অবসন্ন বোধ হইতেছিল। পুঁথি রাখিয়া নিরঞ্জন ক্লান্তভাবে অনাবৃত দেহ মেঝের ধূলার উপরই এলাইয়া দিল, শৃঙ্খলিত বাহুদ্বয় মাথার উপর তুলিয়া উর্দ্ধমুখে আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল।

সংস্কার! কর্ম্মফল! অসহ্য শাস্তি পীড়ন! কর্ম্মের ভিতর দিয়া সাধনা-স্রোত চালাইয়া, ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি? হায় রে হতভাগ্য, সমস্ত আয়োজন অনুষ্ঠান, জড়ের ভিতর দিয়া জড়ত্বেই পর্য্যবসিত হইল! শুধু আড়ম্বর বহনের দাসখতেই সহি দিয়া মরিল—দাসত্বচুক্তি ফুরাইল না! অন্তরের উন্নত নিষ্ঠায় স্থাপিত প্রেমের সৌধ ভাঙ্গিয়া—সাধনার মন্দির চূর্ণ করিয়া, শেষে মোহে মজিয়া—দয়ার নামে নির্দ্দয়তা করিবার জন্য, সর্ব্বনাশের শোভায় প্রবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য সাধের উপবন সাজাইতে বসিল! এ কি সন্ন্যাস? না একজায়ী আত্মম্ভরিতার স্ফুরিত অগ্নি-উচ্ছ্বাস!

অতর্কিতে একটা হিংস্র বুভুক্ষা দৃপ্ত তড়িতাহত হইয়া নিরঞ্জনের হৃদয়ের অভ্যন্তরে অবসাদ খিন্নতার প্রাণমূলে যেন তীক্ষ্ণ কঠোর কুঠারাঘাত বাজিল। তড়িতাকর্ষিতের ন্যায় নিরঞ্জন সহসা তীব্র সচেতন ভাবে উঠিয়া বসিল! ঠিক্ ঠিক্!—ইহাই ঠিক্! ওগো বিশ্বনিন্দিতা অকল্যাণময়ী হিংসা—তোমার ভিতরও বিশ্ববন্দিতা কল্যাণের শক্তি নিহিত আছে, নিশ্চয়ই আছে! আজ সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছে, অহিংসা পরম ধর্ম্ম হইলেও—এই মুহূর্ত্তে এখানে, জীবনের

জটিল দ্বন্দ্ব সমস্যার স্থলে, নিজের খিন্ন অবসাদ দৌর্ব্বল্যকে হিংসার কঠোর আঘাতে হত্যা করাই পরম ধর্ম্ম।

নিরঞ্জন উঠিয়া দাঁড়াইল। না, পিছনের সমাধি শ্মশানের পানে আর মমতার দৃষ্টিতে চাহিয়া দৌর্ব্বল্য বাড়ানো নয়! হৃদয়ের ভ্রান্ত কুহকময় সৌন্দর্য্য স্বপ্নের জীবন শুষিয়া, যখন নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের পথ উন্মুক্ত করিয়াছে, তখন এই সাধনাই শ্রেয়ঃ! সন্ন্যাসকে ক্ষোভের বিলাস বেশে পরিণত করিবে না! অন্ধ একজ্ঞায়িতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য—জীবনের বাঞ্ছিত সার্থকতা সম্ভাবক, পাষাণ শিল্পের নিকট হইতে—হৃদয়ের বড় সাধের সাধনা হইতে—আপনাকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া, নূতন বৈচিত্র্যের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু এতদূরে আসিয়া ইহার স্রোত প্রতিকূলতার বক্ষে আহত—অবরুদ্ধ করিলে চলিবে না—কিছুতেই না। মুক্তি চাই-ই! আত্ম-গৌরব স্থাপন প্রয়াসে, আর আত্ম-প্রবঞ্চনা করিবে না।

নিরঞ্জনের স্মরণ হইল, আজ তাহার দেব-প্রণাম অসম্পূর্ণ হইয়া আছে! দায়িত্ব জ্ঞান যখন স্মরণ হইয়াছে, তখন জ্ঞানতঃ কোথাও কর্ত্তব্য ত্রুটি রাখা উচিত নয়। অন্ততঃ প্রণামটা সকলের আগে সুসম্পন্ন করা চাই।

নিরঞ্জন তখনই বাহির হইয়া পড়িল। সরাসর আসিয়া দেবালয়ের উঠান পার হইয়া মন্দিরের নিম্নে আসিয়া পৌছিল। সোপান বহিয়া উঠিতে উঠিতে সহসা বহুদিনের বিস্মৃত—সুদূর অতীতের পুরাতন পরিচিত একটি সুমিষ্ট-মধুর আত্ম-নিবেদন স্তোত্র মনে পড়িল। তাহার আদ্যান্তে "নমো নমস্তে" শব্দে পরম প্রণতির মন্ত্র সংযোজিত! অকস্মাৎ

মনে হইল, দীর্ঘ আলস্য বিস্মৃতির পর, এ যেন তাহারই নিজের অতর্কিতে সুপ্তি-ভঙ্গ! ইহাকে উপেক্ষা করা চলিবে না, ইহাকে এই মুহূর্ত্তে নব উদ্যমে উদ্বোধন করিয়া পূর্ণ চেতনায় বরণ করিয়া লইতে হইবে।

মন্দিরের ভিতর ঢুকিয়া, বিগ্রহ সম্মুখে যুক্ত করে দাঁড়াইয়া প্রীতিনম্র আবেগ-উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে—নিরঞ্জন ভক্তিতরল কণ্ঠে আবৃত্তি করিল—

"নমো নমস্তে ভগবন্ দীনানাং শরণং প্রভো!
নমস্তে করুণাসিন্ধো নমস্তে মোক্ষ দায়ক।
পিতা পাতা পরিত্রাতা ত্বমেকং শরণং সুহৃৎ,
গতির্মুক্তিঃ পরাসম্পৎ ত্বমেব জগতাং পতিঃ॥"

সহসা কণ্ঠস্বর উচ্চে চড়িয়া গম্ভীর ভাবাবেগে অধৈর্য্য ব্যাকুল স্বরে মন্দিরের সু-উচ্চ পাষাণপ্রাকারে প্রবল আহত হইয়া প্রচণ্ড নিনাদে ঝঙ্কৃত হইল—

"পাপগ্রহ-সমাকীর্ণে মোহনীহার-সংবৃতে—
ভবাব্ধৌ দুস্তরে নাথ নৌরেকা ভবতঃ কৃপা।
তৎকৃপা তরণীং দেহি—দেহি নাথ—"

নিরঞ্জন ভুলিয়া গেল। অসহিষ্ণু ভাবে মনের সমস্ত স্মৃতি আলোড়িত করিয়া, ছিন্ন সূত্র খুঁড়িয়া লইতে চেষ্টা করিল। ব্রহ্মরন্ধ্রে করাঘাত করিয়া আকর্ণ ভ্রূ, সুদৃঢ় কুঞ্চনে আকর্ষিত করিয়া, সমস্ত স্মৃতি-ধারণা মস্তিষ্কের মধ্যে টানিয়া সংহত করিয়া—মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয়ের উপর ঈষন্নমিত শিরে ললাট স্থাপন করিয়া, প্রাণপণ যত্নে বিস্মৃত পদাংশ

ধারণার আয়ত্তীভূত করিতে চাহিল—কিন্তু কিছুতেই স্মরণ হইল না। নিরঞ্জন পুনশ্চ আবৃত্তি করিল, "তং কৃপা তরণীং দেহি—দেহি নাথ—" তবুও স্মরণ হইল না। আবার, আবার—আবার আবৃত্তি—"তং কৃপা তরণীং দেহি—দেহি নাথ—"

অকস্মাৎ পশ্চাতে ললিত কোমল কণ্ঠে, স্নিগ্ধ ভক্তি-করুণ প্রার্থনার স্বরে উচ্চারিত হইল—

"..................দেহি নাথ বরাভয়ম্—
মৃত্যু-মায়াময়ে ঘোরে সংসারে দেহি মেঽমৃতম্ !
ক্ষিপ্রং ভবতু শান্তাত্মা ভক্তস্তে ভক্তবৎসল—
নির্ব্বাণং যাতু পাপাগ্নিস্ত্বৎ প্রসাদাৎ পরমেশ্বর ॥"

স্তম্ভিত, পুলকাবহ বিস্ময়োচ্ছ্বাসে, নিরঞ্জনের হৃদয়মন যুগপৎ আর্দ্র বিহ্বল হইয়া উঠিল। কে গো সুহৃদ্, এমন ব্যাকুল প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে বিনা আহ্বানে আসিয়া—এমন ভাবে অগাধ-গভীর অন্তরঙ্গ সহায়তায় তৃপ্তির অমৃত আনিয়া দিলে !

দেবোদ্দেশে নমস্কার করিয়া, নিরঞ্জন পিছনে ফিরিয়া চাহিল,—নিরাপদ শয্যায়, নিশ্চিন্ত শয়নে শায়িত, বিশ্বস্তচেতা সুষুপ্ত ব্যক্তি সহসা সুপ্তিজড়িত চক্ষু মেলিয়া—শিয়রে উদ্যতচক্র কালভুজঙ্গ দেখিলে যেমন ভাবে চমকিয়া উঠে, নিরঞ্জন ঠিক তেমনই ভাবে উগ্র চমক খাইয়া, শঙ্কা-বিকল চিত্তে পিছু হটিল। এ কি—মায়া !

মায়ার সদ্যঃস্নাতা, শুচিবেশা, পূজারিণী মূর্ত্তি; হাতে সদ্যঃ সংগৃহীতা প্রস্ফুটিত কুসুম সম্ভারে পরিপূর্ণ ফুলসাজি; তাহার, অবস্থান ভঙ্গির কোনখানে এতটুকু কুণ্ঠা নাই। সে সরল সুগঠিত দেহটি সম্পূর্ণ

ঋজু-সুন্দর ভঙ্গিতে স্থির অচঞ্চল করিয়া, উন্নত শিরে, দ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তাহার নয়নে স্বর্গীয় প্রশান্তি—অধরে হর্ষোজ্জ্বল সুষমা! সে সমস্ত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সারিয়া বেলা তৃতীয় প্রহরে দেবতার পূজায় আসিয়াছে, প্রতিদিন সে এমনই সময়ে আসিয়া থাকে।

নিরঞ্জন পিছু হটিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেই, মায়া মন্দিরাভ্যন্তরে ফুলের সাজি নামাইয়া, দ্বারের বাহির হইতে চৌকাঠের উপর মস্তক লগ্ন করিয়া দেবতাকে প্রণাম করিল। তাহার পর দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল; সন্ত্রস্ত নিরঞ্জন ক্ষিপ্র চরণে বাহির হইয়া আসিল।

মায়া মুখ তুলিয়া স্নিগ্ধ-ধীরকণ্ঠে বলিল, "দাঁড়ান, আপনাকে প্রণাম কর্‌বার জন্যে খুঁজ্‌ছি। অধিকারী মহারাজের কন্যা কিশোরীকে সংস্কৃত পড়াবার জন্যে আজ থেকে নিযুক্ত হয়েছি। তোষাখানার পাশের ঘরে পড়াতে গেছলুম, আপনার রচিত শুদ্ধাদ্বৈতমতবাদ-ভাষ্যের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনেছি, বড় আনন্দিত, বড় গভীর পরিতৃপ্ত হয়েছি—আপনাকে প্রণাম করে ধন্য হতে চাই।"

মায়া গলবস্ত্রে নতজানু হইল। অকস্মাৎ ব্যাকুলভাবে আনত দৃষ্টি তুলিয়া ত্রাস-কম্পিত কণ্ঠে নিরঞ্জন সকাতরে বলিল, "না না প্রণাম কর্‌বেন না, কর্‌বেন না—আমি প্রণামের অযোগ্য, দুর্ভাগা!"

প্রশস্ত আয়ত দৃষ্টিতে চাহিয়া শান্ত সংযত স্বরে মায়া বলিল, "যতক্ষণ দ্বিধা ছিল, ততক্ষণ এ দুঃসাহসে অগ্রসর হই নি। এখন সকল দ্বিধা কাটিয়েছি, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রণতঃ হবার যোগ্যতায় গড়ে তুলেছি, আর ভয় করি না। আমার প্রণাম, এখন—শুধু আপনি কেন, স্বয়ং ভগবানও প্রত্যাখ্যান কর্‌তে পারেন না! আপনার সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের

সংবাদ জান্‌তে চাইনে, শুধু জানি—শুধু নিশ্চয় বুঝিছি, আপনার হৃদয়ের শক্তি-মহত্ব, দৈন্য-দৌর্ব্বল্য সমস্তই আমার পক্ষে সমান শ্রদ্ধায় অবশ্য প্রণম্য!"

নিরঞ্জন স্তম্ভিত, নির্ব্বাক্! মায়া তাহার অবস্থা-দর্শনে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া, নতশিরে প্রণাম করিয়া, ঠিক পূর্ব্বের মতই শান্ত অবিচল ভাবে মন্দিরে প্রবেশ করিল।

নিরঞ্জনের সংজ্ঞা ফিরিল; পরস্পর অঙ্গুলি সংলগ্নে বদ্ধ অবস্থায় শ্লথ বিলম্বিত হস্তদ্বয়ে সুদৃঢ় শক্তি ঢালিয়া, স্থির ধৈর্য্যে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ললাট স্পর্শ করিল, তারপর সাশ্রুনয়নে সাষ্টাঙ্গে নত হইল, বুঝি পূজারিণীর উৎসর্গিত ভক্তি প্রণাম, সশ্রদ্ধ সম্মানে মাথায় তুলিয়া লইয়া—পরম প্রীতিভরে ইষ্টদেবতার চরণে নিবেদন করিয়া দিল। মুক্ত হইল! নিরঞ্জন উদ্যানে নামিল, মাথার উপর মুক্ত, শান্ত, স্ফটিক-স্বচ্ছ নীলাকাশে উজ্জ্বল তপনদেব দৃপ্ত গৌরবে হাসিতেছিলেন। নিরঞ্জন নিঃশব্দে ভিতরমহল বাহিরমহল পার হইয়া দেবালয়ের দ্বারদেশে পৌছিল। সেই সময় কাছারীমহল হইতে একজন ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "মহারাজ পণ্ডিতগণের সঙ্গে আহারে বসেছেন, আপনারও আহার প্রস্তুত, শীঘ্র আসুন।"

শান্ত-কোমল কণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল, "ফিরে যাও বন্ধু, আজ আমি আহার করব না।"

এই ভৃত্যই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে পুষ্করিণীর ঘাটে নিরঞ্জনের নিকট ধমক খাইয়াছিল, সুতরাং পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া সে বিস্ময় চাপিয়া যুক্ত করে সভয়ে বলিল, "মহারাজকে কি উত্তর দেব?"

নিরঞ্জন পরম সৌহৃদ্যে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া প্রসন্ন স্নেহময় কণ্ঠে বলিল, "মহারাজকে বোলো, আজ রবিবার, গ্রহরাজের শান্তিব্রত উদ্‌যাপন করে আজ আমি সংযম উপবাসী।"

আদর পাইয়া কৃতজ্ঞ সন্তোষে ভৃত্যের হৃদয় বিগলিত হইল। এবার সে দ্বিধাহীন হইয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "কিছুই খাবেন না মহারাজ? একেবারে নিরম্বু উপবাস? অন্ততঃ একপাত্র সিদ্ধির সরবং।"

সহসা বহুদিনের পর, বালকের মত সরল আনন্দ উচ্ছ্বাসে উচ্চ হাস্য করিয়া নিরঞ্জন বলিল, "ভাল কথা মনে পড়িয়েছ বন্ধু, সিদ্ধি!—প্রশস্ত ব্যবস্থা। যাও সিদ্ধিই নিয়ে এস, আজ আর কিছু প্রয়োজন নাই—হাঁ মদনের নিকট হতে ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য'খানা নিয়ে এস। আজ পরিপূর্ণ বিশ্রামের অবসর পেয়েছি—শীঘ্র যাও বন্ধু।"

ভৃত্য পুনশ্চ বলিল, "সিদ্ধি কোথায় নিয়ে আস্‌ব? আপনি মঠেই বিশ্রাম কর্‌বেন?"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল, "না বন্ধু, এই কঠিন প্রস্তর-প্রাকার বেষ্টনে শুধু জড় আলস্য জমাট বেঁধে আছে, এখানে বিশ্রামের সুবিধা আমার পক্ষে নাও হতে পারে। আমি মুক্ত আকাশের নীচে নির্জ্জন উদ্যানে গাছের ছায়ায় নিশ্চিন্ত আরামে বিশ্রাম কর্‌ব, সিদ্ধি যেন সেইখানে পাই। সামান্য এতটুকু—সিদ্ধি দিয়ে শুধু সরবং।"

ভৃত্য অভিবাদন করিয়া বলিল, "যে আজ্ঞা।"

নিরঞ্জন মঠের পাশে পুষ্পোদ্যানে চলিয়া গেল, ভৃত্য সরবং ও সিদ্ধির সন্ধানে অন্য পথে চলিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বসন্ত সায়াহ্ন—সেই চিরপরিচিত, অভিনব নবীনত্ব মণ্ডিত, স্নিগ্ধ সুন্দর বসন্ত সায়াহ্ন। সমস্ত দিনের পর বসন্ত প্রকৃতির বুকভরা শোভা সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের বুকে নিষ্ঠুর অগ্নিবৃষ্টির শেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত সূর্য্যদেব এখন অস্তগমনোন্মুখ। সারা আকাশ ব্যাপিয়া—নব বিকশিত কুসুমরাশির গন্ধ বুকে ভরিয়া মৃদু সমীরণ মৃদুলপুলকে ভাসিয়া চলিয়াছে। সায়াহ্নের স্নিগ্ধ শান্ত ছায়া সুষমা, ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর মাধুরী আবেশে তৃপ্ত মনোরম হইয়া উঠিয়াছে।

আহারান্তে মহারাজ মদনকে লইয়া দেওয়ান দেবলচাঁদের সহিত বৈষয়িক আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সমস্ত সময়টা সেই কাজে কাটিয়াছে, ব্যস্ততার জন্যই হউক, অথবা যে কারণেই হউক—মহারাজ নিরঞ্জনের সংবাদ গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, সম্ভবতঃ ইচ্ছা করিয়াই তাহাকে নিশ্চিন্ত আরামের অবসর দিয়াছিলেন।

বৈকালে মদন প্রেমচাঁদকে সঙ্গে লইয়া উদ্যান ভ্রমণে বাহির হইলেন। নিরঞ্জন উদ্যানে বিশ্রাম করিতেছে, তাহা তাঁহারা জানিতেন। সকলে আসিয়া দেখিলেন, নিরঞ্জন পুষ্করিণীর তীরে বসিয়া নিষ্পলক দৃষ্টিতে জলের ধারে চাহিয়া একাগ্র মনোযোগে কি ভাবিতেছে। নিকটস্থ হইয়া প্রেমচাঁদ পণ্ডিত পরিহাসকোমল কণ্ঠে বলিলেন, "কি ব্রহ্মচারি, সিদ্ধির ঝোঁকে বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি ধরেছ যে! ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বন্ধ করে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছ?"

নিরঞ্জন মুখ তুলিয়া চাহিয়া স্বাভাবিক নম্র স্মিত হাস্যে বলিল, "ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের তুলনায় বিশ্বপ্রকৃতি কিছু মাত্র অবহেলার বস্তু নন ; কোন শাস্ত্রে এতদিন যা বুঝে উঠ্‌তে পারিনি, আজ এইখানে খুব সহজেই তা শিক্ষা করে নিলুম—প্রমাণ দেখুন।"

নিরঞ্জন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। তাঁহারা দেখিলেন জলের প্রান্তে বুক নোয়াইয়া একটি ছোট আমগাছের শাখা নবোদ্গত পত্র পল্লবে ভূষিত হইয়া বায়ুভরে মৃদু মন্দ উল্লাসে দুলিতেছে ! তাহার মূল নিকটস্থ মাটীতে মিশাইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, তবুও বুঝা যাইতেছে যে শাখাটা গাছ নহে—সেটা আশ্রয়স্থান বিচ্ছিন্ন একটা হতভাগ্য ভগ্ন শাখা মাত্র !

নিরঞ্জন বলিল, "সন্ধান নিয়ে জান্‌লুম, বাগনের মালী সামনের ঐ গাছের অপকার বোধে এই ডালটা দিনকতক আগে কেটে জলের ধারে ফেলে দিয়েছিল, কিন্তু বসন্তকালটা এমনি আশ্চর্য্য তেজস্বী প্রাণবন্ত সময় যে কাটা ডালটা থেকে ইতিমধ্যে শিকড় বেরিয়ে মাটীর ভিতর আশ্রয় নিয়েছে, আর শাখার গায়েও নূতন পত্র উদ্গত হতে ত্রুটি করে নি। আমি হাঁ-করে এখানে বসে অবাক হয়ে ভাবছি, প্রকৃতির প্রভাব কি ভয়ানক অদ্ভুত !"

মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "অত্যন্ত ভয়ঙ্কর !"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে, তীরের উপর হইতে অকস্মাৎ একলম্ফে নিরঞ্জন জলপ্রান্তে অবতীর্ণ হইয়া চক্ষের নিমিষে ব্যগ্র অসহিষ্ণু ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, ডালটা ধরিয়া একটানে ভূমি হইতে উৎপাটিত করিয়া সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিল। চকিতের জন্য তাহার মুখভাবে

একটা হিংস্র-কঠোরতার চিহ্ন ফুটিয়া, তখনই নীরবে অন্তর্হিত হইল। স্বাভাবিক স্নিগ্ধ-সুন্দর হাস্যে, যেন ঠিক্ কৌতুকের ভঙ্গিতে নিরঞ্জন বলিল, "সৃষ্টির মূলটা-ই স্রষ্টার ভুল মহারাজ! কিন্তু সে রহস্য বুকে নেবার জন্য মানুষও শক্তিলাভ করতে পারে—যদি মূল্যের বেলা কুণ্ঠা কার্পণ্য না করে। প্রকৃতির প্রভাব-মাহাত্ম্যে এই ছিন্ন শাখার স্পর্দ্ধিত-বিক্রম বড়ই অসহ্য বোধ হ'ল, ওকে সরল-কোমল মৃত্তিকার সংসর্গ থেকে ছিঁড়ে, ডাঙ্গায় ঐ কঠিন পাথর কুচার বুকে ইহজন্মের মত নির্ব্বাসন দিলুম। কাল এবং ক্ষেত্রের অনুকূল সহযোগিতায় স্বভাবের যে বৃত্তি, মঙ্গলের বিরুদ্ধে এমন প্রতিকূল ভাবে বেড়ে উঠ্‌তে চায়, তার উপর এই রকম রূঢ়তা প্রকাশই সমুচিত ব্যবস্থা।"

প্রেমচাঁদ পণ্ডিত ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু প্রকৃতির উপর এত কঠোর পৌরুষাধিপত্য স্থাপনও যে বড় বেশী নিষ্ঠুরতা, ব্রহ্মচারি!"

নিরঞ্জন একবার প্রেমচাঁদের মুখপানে চাহিল, তারপর মহারাজের মুখপানে চাহিল। স্থিরকণ্ঠে বলিল, "পাত্রবিশেষে এই ব্যবস্থাই প্রযুজ্য।"

মদন করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে ভূলুণ্ঠিত শাখাটির পানে চাহিয়া বলিল, "আহা, ডালটায় অনেক কচিপাতা ধরেছিল—"

বাধা দিয়া অসহিষ্ণু ভাবে নিরঞ্জন বলিল, "তা ধরুক মদন, ওটুকু ক্ষতিতে পৃথিবীর সামান্যই সৌন্দর্য্য হানি হবে, কিন্তু তার মমতা করলে, পৃথিবীর অনেকটা স্বাস্থ্যহানি যে সুনিশ্চিত ঘটবে, তার কোন ভুল নেই। মঙ্গল-মঠের মঙ্গলালয় দেবতার পুষ্পোদ্যানে এমন অপকারী অমঙ্গল-সম্ভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়ে রাখতে নাই, ওর নিষ্ঠুর ধ্বংসই প্রার্থনীয়।"

নিরঞ্জন লম্ফ দিয়া তীরে উঠিয়া মহারাজের চরণে প্রণত হইয়া

পদধূলি চুম্বন করিয়া বলিল, "মহারাজ আমি আপনাদের কাছে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এখানে অপেক্ষা করছি। আট বৎসর আগে—নিজের বুদ্ধির ভুলে, মূঢ়ের মত হঠাৎ বিশ্বের শোভা-সৌন্দর্য্যের পূজা উপাসনার ভ্রান্তি প্রমাদ ঘটিয়ে—পূজক-হৃদয়কে ধিক্কারে ঘৃণিত করে, বুকভাঙ্গা বেদনার আক্ষেপে ক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে, চোখের জলে মঙ্গল-মঠ ত্যাগ করেছিলুম। সেই ভুল সংশোধনের জন্যেই বোধ হয় আবার কর্ম্মচক্রে বাধ্য হয়ে ফিরে আস্‌তে হোল, এবার সমস্ত অতৃপ্তি এড়িয়ে তৃপ্তি পেলুম। বৃহত্তর শিক্ষা নিয়ে, মহত্তর সাধনার পথে—মুক্তির হাওয়ায় ভেসে পড়্‌তে চাই, সুনিশ্চিত সিদ্ধির আনন্দে স্বচ্ছন্দ শান্তিতে এবার মঙ্গল-মঠ ত্যাগ করে যাই, বিদায় অনুমতি দিন মহারাজ!"

সকলে নির্ব্বাক ভাবে চাহিয়া রহিল। মহারাজ সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি মঙ্গল-মঠ ত্যাগ করে যাবে? কোথায় যাবে? নির্ম্মল-মঠে? কেন?"

নিরঞ্জন অকুণ্ঠিত স্থির স্বরে বলিল, "মঙ্গল-মঠে মহা অমঙ্গলের সংঘাতেই, দৃপ্ত বিদ্যুদ্বিকাশের মধ্যে সত্যের মূর্ত্তি দেখেছি। সাধনার প্রাণ-শক্তিকে খুঁজে, এবার নিভৃত নিরালায়—সেই নিজের হাতে গড়া নির্ম্মল-মঠ, যার ভিত্তিমূলের প্রত্যেক পাথরখানি সতর্ক মনোযোগে নিজের হাতে একটির পর একটি করে সাজিয়ে গেঁথেছিলুম, সেইখানে শান্ত বিশ্রামের আসন পেতে সাধনা করতে চাই। এতদিনের পর আয়োজনের মমতা পীড়ন থেকে পরিত্রাণ পেয়েছি, এবার শুধু প্রয়োজনের যোগ্যতা লাভে সাধনা চাই! এবার নিঃসংশয়ে নিজের

শক্তিকে—শুদ্ধাদ্বৈত-মতবাদ প্রচারের জন্য—মঙ্গল-মঠের সেবার জন্য, আবশ্যকের উপযুক্ত যোগ্যতায় পূর্ণ করে তুলব।"

মদন সবিনয়ে বলিল, "মঙ্গল-মঠের সেবার জন্য?"

শান্ত মুখে নিরঞ্জন বলিল, "হাঁ বন্ধু, মঙ্গল-মঠের মঙ্গলময়ের সেবার জন্যই, আত্মজয়ে সিদ্ধ হয়ে আত্মদানে সার্থকতা লাভের জন্য প্রাণকে পূজার ফুলে পরিণত করাই—মানবের চিরন্তন সাধনা! এই পাথরের সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনে অবস্থিত মঙ্গল-মঠই আমার নিকট সেই প্রেমময়ের লীলানিকেতন। শান্তি-প্রেম রচিত মহিমাময়ের মঙ্গল-মঠের পথ বিশ্বব্যাপী কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে নির্দ্দেশ করছে, এখন সেবায় আত্মোৎসর্গ করাই শুধু সাধনা! মদন, মানুষের ভুল যত বড়ই বৃহৎ হউক—সে সসীম, কিন্তু সত্য অনন্ত অসীম, তার আঘাতে সকল ভুল একদিন নিঃসংশয়ে ভেঙ্গে পড়বেই পড়বে! তুচ্ছ ঘটনা-সংঘাতের মধ্যে কত সুমহান্ সুবৃহৎ পরিবর্ত্তন—কত অনন্ত অসীম সম্ভাবনা গুপ্ত থাকে—তার সংবাদ, কোলাহল-পীড়িত মানব-চিত্তের ধারণা বহির্ভূত। আজ নিঃসন্দেহে বুঝেছি ক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যে যে অনন্তের অংশ বিদ্যমান আছে এ তথ্য একবিন্দু মিথ্যা নয়। পরম অসহায়ের মধ্যেও যে কত বড় সহায়তার—কি অসীম শক্তি থাকতে পারে, তা আমি আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখেছি, আমার মূঢ় চেতনা এতদিনে প্রলুব্ধ হয়েছে?, এতদিন যা বোঝবার জন্য অবিশ্রান্ত ধৈর্য্যে কান পেতে—নিঃশব্দে উপদেশ শুনে আসছি, সহস্র চেষ্টাতেও যে উপদেশের মর্ম্ম, বুঝেও বুঝি নি, আজ সেই উপদেশের শান্ত-উদাত্ত সুর আমার নিজের মধ্যে বেজে উঠেছে। আর আমি ভয় করিনে—তর্ক, দ্বন্দ্ব, সংশয়, সব চলে গেছে,

এবার পূর্ণ নিষ্ঠায় শুধু সাধনা, সঙ্কল্পের মুহূর্ত্তেই সিদ্ধির পথে বেরিয়েছি। মহারাজ, প্রসন্ন আশীর্ব্বাদে বিদায় দিন!"

মহারাজ নিরঞ্জনের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "সর্ব্বান্তঃকরণে, কিন্তু এবার আদেশ নয় নিরঞ্জন, প্রয়োজনের অনুরোধে—তুমি চলে গেলে। মঠের কাজে শৃঙ্খলা ব্যবস্থার জন্য নবীন অধিকারী মহারাজের সহায়তা করতে আমি এখন কিছুদিন মঙ্গল-মঠে থাকতে বাধ্য হব, সুতরাং সুরাটের মঠ দু'টির—অন্ততঃ নির্ম্মল-মঠের জন্য তুমি অধ্যক্ষতা পদ গ্রহণে স্বীকৃত হও।"

হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "আর আত্মশ্লাঘার অভিমান ভয় নাই মহারাজ, এবার যে পদে খুসী নিযুক্ত করুন। আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নির্ভর রেখে এবার সমস্ত 'পদ'ই পথাতিবাহকের যন্ত্র বলে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি।"

প্রীত বদনে নিরঞ্জনের শিরশ্চুম্বন করিয়া মহারাজ বলিলেন, "এই ত তোমার যোগ্য কথা নিরঞ্জন! আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নির্ভর রেখে আত্ম-বিসর্জ্জন করে যাওয়াই শ্রেষ্ঠ সাধন! একদিন পরিহাস করে বলেছিলাম, আজ প্রাণের আনন্দে মুক্তকণ্ঠে বলছি, নিজের পৌরুষ প্রভাবে, জীবনে নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনত্ব লাভে কৃতার্থম্মন্য হও—ধন্য হও—সার্থক হও। মঠে এস, তোমার যাত্রার আয়োজন সমস্ত প্রস্তুত করিয়ে দিচ্ছি, তুমি সন্ধ্যার প্রথম প্রহরেই যাত্রা কর।"

নিরঞ্জন বলিল, "আপনি মঠে চলুন মহারাজ, আমি বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কন্যাকে প্রণাম করে আসি। মদন আমার সঙ্গে যাবে ত চল।"

"চলুন—" মদন ও নিরঞ্জন অগ্রসর হইল। মহারাজ প্রেমচাঁদ পণ্ডিতকে লইয়া মঙ্গল-মঠে চলিলেন।

পথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নিরঞ্জন বলিল, "দাঁড়াও মদন, পাশের এই সরু পথ ধরে অনেকদিন আগে, একদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলুম। বহুদিনের পুরাণ পরিচিত পথ—এস আজ একবার নূতন চোখে একে দেখে নেওয়া যাক।"

উভয়ে মোড় ফিরিয়া পাশের পথে নামিল। এ সেই বাগানের পথ, যে পথে একদিন সান্ধ্য জ্যোৎস্নালোকে চলিতে চলিতে সহসা অজ্ঞাত কণ্ঠের সঙ্গীত সুরাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া—তাহার তরুণ কোমল চিত্ত মুগ্ধ বিহ্বলতায় আত্মহারা হইয়া, জীবনের মধ্যে এক প্রকাণ্ড বিভ্রান্তি ঘটাইয়া বসিয়াছিল—এ সেই—সেই বিচিত্র জীবন নাট্যের অভিনয়-অন্তর্গত—বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের অতি ক্ষুদ্র—অতি তুচ্ছ, এতটুকু নিভৃত অংশ। এইখানে দাঁড়াইয়া একদিন যে নৈরাশ্য-কাতর কিশোর হৃদয়ের আর্ত্ত-ব্যাকুল প্রশ্ন শুনিয়াছিল 'কোন মরু মাঝে অমৃত বিরাজে'—আজ সেই হৃদয়ই—তাহার হৃদয়ের দৈন্য বেদনা দূর করিয়া, তাহার বিস্মৃতি সংশোধন করিয়া আরাধ্যের চরণে শুদ্ধ বুদ্ধ হইয়া আত্মনিবেদন করিতে, শক্তি সংগ্রহের জন্য স্বয়ং শক্তি সংযোজন করিয়া, গুরুতর প্রয়োজনীয় প্রার্থনা শিখাইয়া দিয়াছে—"দেহি নাথ বরাভয়ম্!"

চলিতে চলিতে সহসা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নিরঞ্জন বলিল, "মদন পৃথিবীর হিসাব-নিকাশ না খতিয়ে, পৃথিবীর ভালকে ভালবাসায়, পার্থিব ক্ষতির পরিমাণ যত বৃহৎ-ই হউক, কিন্তু তাতে লাভ যেটুকু আছে,

সেটুকু অপার্থিব আনন্দ! জীবনে ভালকে ভাল করেই ভালবাসো; শুধু কুৎসিত ভোগলালসার চরণে আত্মসমর্পণ কোর না—তা'হলে ভালবাসার সাক্ষাৎ পাবে না, সে অভিমানে আত্মহত্যা করবে। মনে রেখো 'পাওয়া' শুধু দৈনিক সম্পর্কের আয়ত্তে নাই—'পাওয়া'কে মহৎ করে, সুন্দর করে, সত্য করে পেতে হয়—শুধু প্রাণে!"

মদন চুপ করিয়া রহিল। উভয়ে উদ্যান পার হইয়া সমুদ্রের তটভূমিতে আসিয়া পৌছিল। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ গম্ভীর শান্তি মাধুর্য্য পৃথিবীর বুকে নামিয়া আসিতেছিল। সুদূর বিস্তৃত সমুদ্রতটের নীরব নির্জ্জনতার মাঝে, সেই তরঙ্গ আস্ফালনে বীরত্ব গর্ব্বস্ফীত বিশাল বিপুল দিগন্তহারা সমুদ্রের বুকে—সেই অনন্ত অসীম ঔদার্য্যে দিগ্বিদিকহারা সুন্দর আকাশের নীচে সেই মৌন-গম্ভীর সন্ধ্যার আবির্ভাব এক সুমহান্ মাধুর্য্যে অভিব্যক্ত হইতেছে! সেই দৃশ্য অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয়।

শান্ত তন্ময়চিত্তে নীরবে চলিতে চলিতে অনেকক্ষণ পরে নিরঞ্জন আপন মনে মুগ্ধ কোমলকণ্ঠে বলিল, "আট বৎসর আগে, এই সমুদ্র এই আকাশের বিশালতা শুধু শোভার হিসাবে দেখেছি, শুধু সৌন্দর্য্যের হিসাবে দেখেছি—কিন্তু আজ দেখ্‌ছি, সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে কতখানি মঙ্গল, কি বিরাট সত্যে আত্মপ্রকাশ করছে!"

মদন খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "মহারাজ, অনুগ্রহ করে একটি সংশয়-বিরোধ খণ্ডন করুন। সমাজের স্থিতি উন্নতির জন্য বংশরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য—একথা আপনি শুদ্ধাদ্বৈতমতবাদ-ভাষ্যে সুন্দর যুক্তি-তর্কের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু আপনার জীবনের সঙ্গে সে মতের সামঞ্জস্য রইল না কেন?"

ঈষৎ হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "তার কারণ তুমি !"

"আমি !" এত বড় সাংঘাতিক মিথ্যা পরিহাস মদন জীবনে আর কখনো শুনে নাই ! বিস্ময়ে চমকিয়া বলিল, "আমি ! আমি কেমন করে ?"

সস্নেহে মদনকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া নিরঞ্জন বলিল, "তিন বৎসর পূর্ব্বের কথা স্মরণ কর ভাই, নির্ম্মল-মঠে, তোমারই মুখে সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য একজন সর্ব্বত্যাগী, আত্মোৎসর্গী কর্ম্মী সাধকের প্রয়োজন প্রথম শুনি। আমার হৃদয়ের অবস্থা তখন শান্তিহীন সংশয়াচ্ছন্ন, তোমার কথায়—মনে দুর্দ্দম্য আকাঙ্ক্ষা উদ্বোধিত হ'ল, ক্ষুদ্র আকর্ষণ জয় করবার জন্য মহত্তর প্রলোভনকে বরণ করে নিলুম ; হৃদয়াবেগ সংযত করে, মস্তিষ্ক সচেতন করে, মনকে একান্ত সাধনায় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলুম, কিন্তু প্রাণের শেষ সংশয় তবুও গেল না। আজ হঠাৎ এক মস্ত সংঘাতের প্রচণ্ড-তরঙ্গ সজোরে আছাড় খেয়ে বুকের ওপর প'ড়ে, প্রাণের সংশয় ছিঁড়ে নিয়ে গেল, আমি মুক্তি পেলুম। বিরাটত্বের মাঝে নিজেকে পূর্ণ চেতনায় ফিরে পেলুম। আজ কৃতজ্ঞ আনন্দে তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার জয় হউক, সমাজে সন্তানের পিতা হবার সাধ আর নাই, কিন্তু সে ক্ষতি আমি লাভের অঙ্কে জমা করে নেব, তোমাদের ভাবী সন্তানকে জীবনের অভিজ্ঞতায় শিক্ষা দেবার শক্তি সংগ্রহ করেছি, সেটা ভুলব না।"

নমস্কার করিয়া মদন বলিল, "পিতা হওয়া সহজ, কিন্তু শিক্ষক হওয়া সহজ নয়। ভাবী পিতা আজ আপনার কাছে—জীবনের জন্য শিক্ষাগ্রহণে প্রস্তুত।"

হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "কিন্তু এই মুহূর্ত্তে তোমাকে দেওয়ার মত

কোন দান ত প্রস্তুত করে রাখিনি ভাই। তবে অসীম আকাশের নীচে, বিশাল সমুদ্রের শিয়রে দাঁড়িয়ে জীবনের জন্য একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই। যৌবনের ফেনিল উচ্ছ্বাস মত্ত হৃদয়-সমুদ্রে, প্রকৃতির অপ্রতিহত প্রভাবে, কত ভুলভ্রান্তির কুয়াশা—কত কামনার কলতান—কত উদ্দাম আবেগের উন্মত্ত তুফান উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌বে, তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সাবধান বন্ধু—সম্মুখের এই সুদৃঢ় তটবন্ধনের মত কঠিন সংযম শৃঙ্খলে, তার উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনা—বিশাল গভীর বীরত্ব-সম্ভ্রমে সুরক্ষিত রাখ্‌তে ভুলো না। মনে রেখো এ সমুদ্রের সুমহান্‌ বীরত্ব-মর্য্যাদা তখনই নিষ্ঠুর হিংস্র রাক্ষসীর মত্ততায় পরিণত হবে—যখনই সে সংযমের বন্ধন লঙ্ঘন করে, ক্ষুধিত লালসায় হুঙ্কার করে মাটীর বুকে লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করবে। সেই মুহূর্ত্তে বিশ্বের সৌন্দর্য্য মঙ্গল গ্রাস করে, এ সমুদ্র আত্মগৌরব হারাবে! এই সমুদ্রের মাথার উপর ঐ প্রশান্ত, প্রাণনন্দ পরমপুরুষকারের জাগ্রত মূর্ত্তি, ওই অনন্ত আকাশ স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে, ওরই পানে লক্ষ্য রেখে—একটানা স্রোতে ঐ দিগন্তের কোলে মহামিলনের পথে একে বয়ে যেতে দিও। আর সকল কোলাহল—সকল সংশয়ের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, আত্মানুশীলন করো, দেখ্‌বে সকল অমঙ্গলের মূলেই মহামঙ্গল বিদ্যমান! রাশিকৃত ব্যর্থতা-স্তূপের উপর সার্থকতার স্বর্ণসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত! ঐ শোন, দেবালয়ে আরতির শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠেছে! এস আমরা প্রণাম করিগে।"

সমাপ্ত